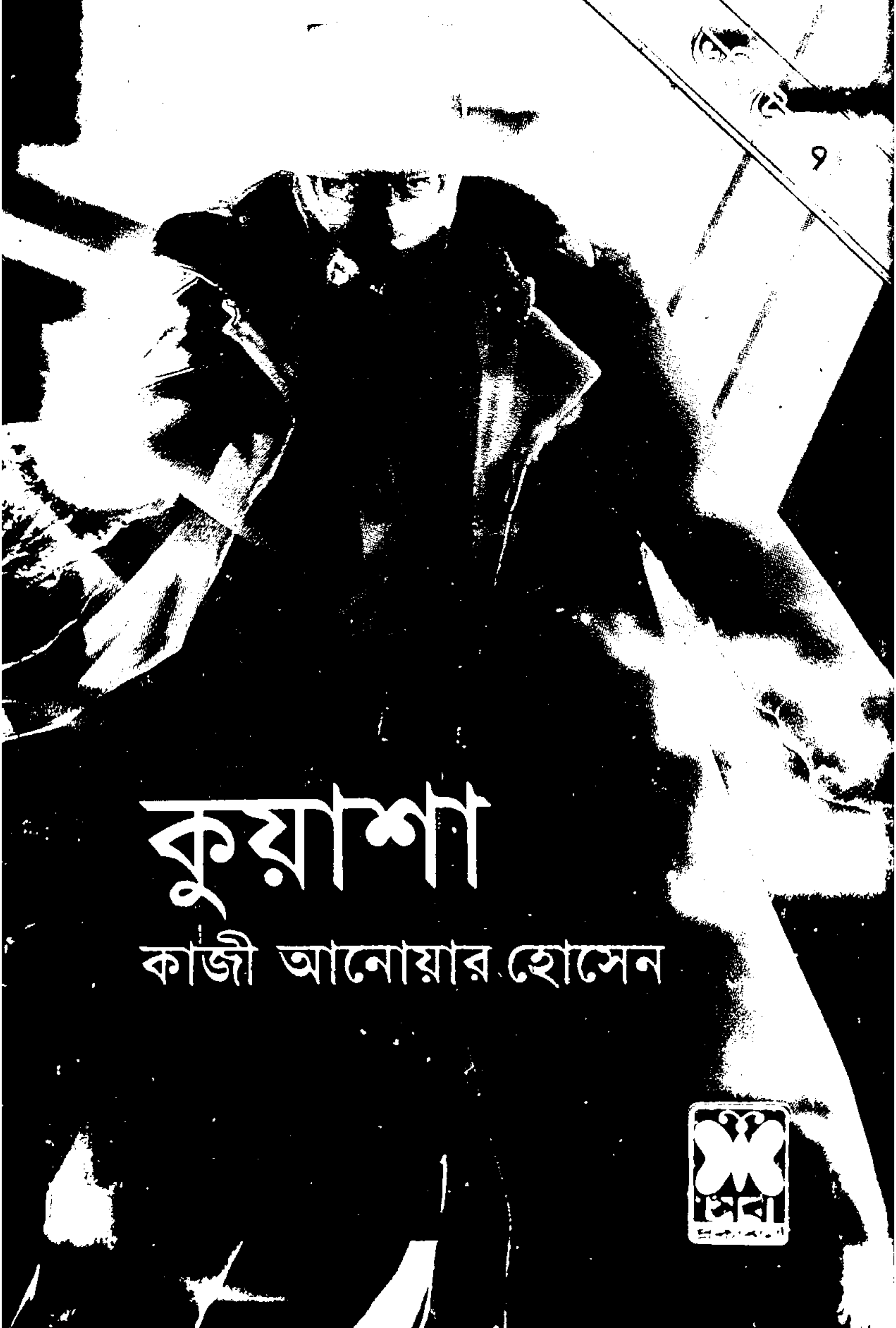
৭
কুয়াশা
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা

এই পিডিএফটি তৈরি করা হয়েছে -

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan ও Banglapdf.net এর সৌজন্যে।

এটি তৈরি করেছেন - মাহমুদুল হাসান শামীম

Facebook :www.facebook.com/mahmudul.h.shamim

Group:www.facebook.com/groups/boiloverspolapan

Website : Banglapdf.net

ভলিউম ৭

কুয়াশা

১৯. ২০. ২১

কাজী আনোয়ার হোসেন

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

সেবা প্রকাশনী

সূচী

কুয়াশা ১৯ —— ৫

কুয়াশা ২০ —— ৫৪

কুয়াশা ২১ —— ১০৯

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

কুয়াশা ১৯

প্রথম প্রকাশঃ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

এক

চারদিকে অতলান্ত নীল সমুদ্র। সূর্যের আলোয় চিকচিক করছে সাগরের বুক। ইংলিশ চ্যানেল ছাড়িয়ে অনেকদূর এসে পড়েছে রোজমেরী। উপকূলের তটরেখা দৃষ্টি সীমানা ছাড়িয়ে গেছে।

ডেকের উপর পায়চারি করছিল কুয়াশা। তার চেহারায় গভীর চিন্তার ছাপ। সে ভাবছিল তার আমন্ত্রণকর্তা জো স্টিফেন আক্রমণ করবে কোন পথে। বিপদ আসবেই। কিন্তু কখন, কোন পথে, কিভাবে? জো স্টিফেনের একটা নাটকীয়তা সৃষ্টির ঝোঁক আছে। সে নাটকীয়ভাবে পূর্ণ আনুষ্ঠানিকতার সাথে হামলা চালাবে। কিন্তু প্রথম দৃশ্য শুরু হবে কখন? না কি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে?

এই ইয়টের বাসিন্দারা ছাড়া বাইরের দুনিয়ায় একমাত্র কামালই তার হদিস জানে। বিপদ যদি আসেই তাহলে তার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়।

রোজমেরী নামক এই শয়তানপুরীতে মিত্র একমাত্র এডিথ। কিন্তু সে তো কুয়াশার চাইতেও অসহায়। তার উপর ভরসা করার প্রশ্নই ওঠে না, বরং বিপদ থেকে তাকেই রক্ষা করতে হবে কুয়াশার। আর একজনের কাছে সাহায্য পাওয়া যেতে পারত। সে সেই হিপ্পি প্রবর আতোয়ান। কিন্তু ইয়টে ওঠার পর চব্বিশঘন্টা পার হয়ে গেলেও তার সাথে সাক্ষাৎ ঘটেনি। হয়ত সে আসেনি। হয়ত জো তার কীর্তি জেনে ফেলেছে। তাকে হয়ত ইতিমধ্যেই দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েছে।

তাছাড়া আতোয়ানের আসল উদ্দেশ্য কুয়াশার জানা নেই। এমনও হতে পারে, সে জো'র গোপন ধনভাণ্ডার করায়ত্ত করতে চায়। সেক্ষেত্রে তার সাথে কুয়াশার সংঘর্ষ ঘটা বিচিত্র নয়। অন্য সম্ভাবনাও আছে। হয়ত সে পুলিসের লোক। অথবা এডিথ ও এথেলের মত সে-ও প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছে। শেষেরটাই সত্যি হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। কারণ, কুয়াশা জানতে পেরেছে, মাঝে মাঝে লম্বা চুলওয়ালা বিদঘুটে পোশাক পরা একটা লোক অতিগোপনে এথেলের সাথে দেখা করতে যেত। আতোয়ানই হয়ত সেই লোক। এথেলের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেবার জন্যেই হয়ত আতোয়ান জো স্টিফেনের ডসন নামের সেই অনুচরকে খুন করেছিল। কিন্তু আতোয়ান এখন কোথায়? সে কি এই ইয়টেই আছে? না কি ধূর্ত জো তার পরিচয় পেয়ে হত্যা করেছে?

সিগারেট ধরিয়ে একটা ডেক চেয়ারে বসল কুয়াশা। পাশের চেয়ারটায় প্রফেসর রোজেনবার্গ বসেছিলেন। তাঁর হাতে চুরুট। দৃষ্টি সমুদ্রের দিকে প্রসারিত। তার আগমন ও উপবেশন বোধহয় প্রফেসরের ইন্দ্রিয়মূলে আঘাত করেনি। কুয়াশা বুঝল, প্রফেসর এখন অন্য এক জগতে বিরাজ করছেন। এই পৃথিবীর শব্দ-গন্ধ-বর্ণ তাঁর ইন্দ্রিয়ে এখন পৌছুবে না।

সিগারেটে ধীরে ধীরে টান দিতে লাগল কুয়াশা। হঠাৎ এঞ্জিনের গর্জনটা থেমে গেল। একঘেয়ে পরিচিত গর্জনটা থেমে যেতেই প্রফেসর বোধহয় সচকিত হলেন। যেন তাঁর স্বপ্ন ভেঙে গেল। মুখ ফেরাতেই কুয়াশার চোখে চোখ পড়ল। মৃদু হাসলেন প্রফেসর। সলজ্জ হাসি।

কুয়াশা বলল, 'এখানেই বোধহয় আপনার বাথিস্টলের এক্সপেরিমেন্ট হবে?'

প্রফেসর চারদিকে চেয়ে বললেন, 'ঠিক বুঝতে পারছিনে। এঞ্জিন থেমে যাওয়াতে অবশ্য মনে হচ্ছে আমরা এসে গেছি। পানি এখানে বেশি নয়। মাত্র পঁচানব্বই ফ্যাদম। তবে প্রাথমিক পরীক্ষা চলতে পারে।'

চারদিকে একবার তাকাল কুয়াশা। কাছে পিঠে কেউ নেই। জো ও এডিথ হুইল হাউজে। হাত বিশেক দূরে রোদে পিঠ দিয়ে একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে জো'র এক স্যাঙ্গাৎ। লোকটা ওখানে বসে আছে প্রফেসর ও বিশেষ করে কুয়াশার দিকে দৃষ্টি রাখার জন্যেই। লোকটার নাম কার্ল বার্নহাম। ইয়টে উঠবার আগে কুয়াশা ওকে কখনও দেখেনি। অথচ এখন দেখা যাচ্ছে ঐ কার্ল বার্নহামই জো'র ডান হাত। লম্বা-চওড়ায় লোকটা দৈত্যের মত। চোখে-মুখে নিষ্ঠুরতার ছাপ স্পষ্ট।

সিগারেটটা ছুঁড়ে সমুদ্রে ফেলে দিল কুয়াশা। প্রফেসরের দিকে মুখ ফেরাল আবার। তার হঠাৎ মনে হল, শুধু সে তার এডিথই নয়, তৃতীয় একজনও তাদের মত একই বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। অথচ তাঁর কথা এর আগে কুয়াশার মনে হয়নি। পার্থক্য শুধু এই যে, তারা তাদের বিপদটাকে খুব ভাল করে জানে। অথচ এই বয়স্ক-শিশু কল্পনাও করতে পারছে না যে, জো স্টিফেনের ছদ্মবেশে মৃত্যু তার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে।

কুয়াশা নিচু গলায় প্রফেসর রোজেনবার্গকে প্রশ্ন করল, 'জো'র সাথে আপনার পরিচয় নিশ্চয়ই দীর্ঘদিনের?'

প্রফেসর মাথা নেড়ে বললেন, 'না তো। মাত্র মাস ছয়েক আগে ওঁর সাথে আলাপ হয়েছে। সে ধরুন আমার প্রথমবার সাগরের নিচে নামবার কিছুদিন পর। উনি নিজে যেচে আমাকে সাহায্যের প্রস্তাব করলেন। বলতে গেলে, উনি এসেছিলেন দেবতার আশীর্বাদের মত। আমি ঠিক করেছি এবার গভীর সমুদ্রে নতুন যে মাছ দেখব, মি. স্টিফেনের নামে তার নামকরণ করব।' শেষের দিকটায় গদগদ শোনাল প্রফেসরের কণ্ঠ।

'আপনি বোধহয় এখন পর্যন্ত আপনার আবিষ্কারের ব্যবসায়িক সম্ভাবনার কথা ভেবে দেখেননি?' কুয়াশা মৃদুস্বরে প্রশ্ন করল।

'ব্যবসায়িক সম্ভাবনা!' প্রফেসরের দুচোখে গভীর বিস্ময়। 'এর কোন ব্যবসায়িক দিক আছে নাকি? কই একথা তো আমার একবারও মনে হয়নি।'

কুয়াশা ইতস্তত করে বলল, 'আমার মনে হয়, অর্থাৎ...।' পিছন দিকে পদশব্দ হতেই কুয়াশা মুখ ফিরিয়ে দেখল জো ও এডিথ তাদের দিকেই আসছে। প্রফেসরের কথাগুলো নিশ্চয়ই জো'র কানে গেছে। না গেলেও প্রফেসর এখুনি যে তা তার কানে তুলবেন তাতে সন্দেহ নেই। তাতে প্রফেসরের বিপদের মাত্রা বাড়বে বই কমবে না। তার চাইতে নিজের মুখ দিয়েই কথাগুলো বের করা ভাল। বাক্যটা তাই শেষ করল কুয়াশা, 'আমিও ঠিক নিশ্চিত নই। তবে এই যেমন ধরুন, আপনার বাথিস্টলের সাহায্যে গভীর সমুদ্রে মুভী ক্যামেরা নিয়ে যাওয়া যেতে পারে।'

জো ও এডিথ এসে দাঁড়িয়েছে।

প্রফেসর বললেন, 'আমি ঠিক বলতে পারছিনে। মি. স্টিফেন, আপনার কি মনে হয় আমার এই এক্সপেরিমেন্টের ব্যবসায়িক সম্ভাবনা আছে?'

জো তার স্বভাবসিদ্ধ নিরুত্তাপ কর্কশকণ্ঠে বলল, 'এ সম্পর্কে আমি নিজেও কিছু বলতে পারব না। যাদের এসব সম্পর্কে জ্ঞান আছে তাদের জিজ্ঞেস করে দেখা যেতে পারে।' ঠাণ্ডা দৃষ্টি নিক্ষেপ করল জো কুয়াশার দিকে। তারপর প্রফেসরের দিকে ফিরে প্রশ্ন করল, 'লাঞ্চের আগেই কি গিয়ারটা দেখে নিতে চান?'

'প্রফেসর বললেন, 'নিশ্চয়ই।'

ওরা সবাই চলে গেল পিছনের ডেকে। তিনজন নাবিক ধরাধরি করে বিদঘুটে আকারের একটা বিরাট মূর্তি এনে ডেকের উপর নামাল। দেখতে অনেকটা মহাশূন্যযাত্রীদের পোশাকের মতই অথবা প্রাচীন রোমান যোদ্ধাদের বর্মের উন্নততর সংস্করণ। মাথাটা চতুষ্কোণ। চারদিকে কাঁচ। সমগ্র পোশাকটাই ধাতুতে গড়া বলে মনে হল কুয়াশার। এখানে সেখানে ছোট-বড় বাক্স। মাথার ডগায় সারি সারি বাল্‌ব দেখা যাচ্ছে কাঁচের ভেতর দিয়ে। তার একটু নিচেই পাশাপাশি ও উপরে-নিচে দুটো গোলাকার ও কয়েকটা চতুষ্কোণ ফোঁকড়। নিচ দিক দিয়ে একটা কেব্‌ল্ বেরিয়ে এসেছে।

কুয়াশা অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। তারপর বলল, 'তাহলে এটাই আপনার সাঁতারের নতুন পোশাক। কিন্তু বড্ড ভারি বলে মনে হচ্ছে। আর এর ভিতরে ঢুকলে চলাফেরাই বা করবেন কেমন করে?'

প্রফেসর হেসে বললেন, 'যতটা ভারি মনে করছেন ঠিক ততটা ভারি নয়। ধাতু দিয়ে সমস্তটা তৈরি করলেও এটা আসলে খুবই হালকা। আর ভেতরে যেটুকু হাওয়া থাকবে তাতে ওজন আরও কমে যাবে পানির তলে। এখন আমি যেমন

স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারছি, আশা করি, ওর ভেতরে ঢুকলেও ঠিক ততটুকুই স্বচ্ছন্দে চলতে ফিরতে পারব।'

গলার কাছে মাথার চতুষ্কোণ বাক্সটার নিচ দিকে একটা বোতাম টিপতেই খুলে গেল সামনের দিকটা।

প্রফেসর বুঝিয়ে দিলেন, 'এই যে গোল দুটো ফোকড় দেখতে পাচ্ছেন এই দুটো হল চোখ। এটাই সামনের দিক। এর নিচে এই দেখুন কাগজ পেন্সিল রেখেছি, ওটা একটা ছোট্ট ক্যামেরা। পাশেরটাতে আছে ফিল্মরোল। ওই যে, ওটা সুইচ বোর্ড। বাইরের আর ভিতরের আলোর সুইচ ওখানেই আছে। আর এই যে দেখুন, এখানে আছে চিউয়িংগাম।' হাসলেন প্রফেসর। 'জানেন তো, আমি একটু ভোজনবিলাসী মানুষ।'

হাসল কুয়াশাও।

ঢাকনাটা বন্ধ করে দিয়ে প্রফেসর বললেন, 'চলুন, ঠিকই আছে সব।'

দুই

দুটো অক্সিজেন সিলিণ্ডার বের করা হল কেস থেকে। প্রফেসর সিলিণ্ডার দুটোর অটোমেটিক ভাল্‌ভ্ পরীক্ষা করতে করতে বললেন, 'বাথিস্টল আর সিলিণ্ডার একই ধাতুতে তৈরি।' পরীক্ষা শেষ করে বললেন, 'এবার তাহলে যাত্রা করা যেতে পারে।'

উপস্থিত সকলের সাথে করমর্দন করলেন প্রফেসর। সবাই তাঁর অভিযানের সাফল্য কামনা করল। বাথিস্টলের মধ্যে প্রবেশ করার জন্য তিনি ডেকহাউজের ছাদে চড়লেন। ঢুকতে হবে উপরের দিক দিয়ে। মাথার ঢাকনাটা খুললেন। ধীরে ধীরে নামলেন পোশাকের মধ্যে। কাঁচের গোল দুটো ফোকরের মধ্যে দিয়ে তাঁর হাসিভরা মুখটা দেখা গেল। একজন নাবিক ডেকহাউজের ছাদে চড়ে অক্সিজেন সিলিণ্ডার দুটো তাঁর হাতে তুলে দিল। তিনি সেগুলো এডজাস্ট করলেন। সুইচ টিপে বাইরে থেকে ঢাকনাটা বন্ধ করে দিল জো নিজে। স্ক্রু লাগানো হল। একজন নাবিক একটা টিউব থেকে আঠার মত কিছু একটা বের করে ঢাকনাটার চারদিকে প্রলেপের মত করে লাগিয়ে দিল। দেখা গেল প্রফেসর নিজেও টিউব হাতে ব্যস্তভাবে ভিতরে প্রলেপ লাগাচ্ছেন।

একটু পরে প্রফেসর মাথার উপর দিয়ে কানে ইয়ারফোন লাগালেন। শিং-এর আকৃতির ট্রান্সমিটার লাগালেন বুকের উপর। রেলিং-এর পাশে টেবিলের উপর রাখা ক্ষুদ্র একটা লাউডস্পীকারের মধ্যে দিয়ে কণ্ঠস্বর ভেসে এল। ধাতব আর কর্কশ সেই কণ্ঠস্বর।

'হ্যালো, আমার কথা আপনারা শুনতে পাচ্ছেন?'

'অবশ্যই। আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাদের কথা?' জবাব দিল জো। তার গলায় ছিল কেবলে জড়ানো আর একটা ট্রান্সমিটার। সে নিজে টেলিফোন চেক করছিল।

'চমৎকার শুনতে পাচ্ছি,' লাউডস্পীকার থেকে ভেসে এল আবার ধাতব কণ্ঠ।

আর কোন কথা হল না। সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে আছে প্রফেসরের বাথিস্টলের দিকে। তিনি বোধহয় একটা সুইচ স্পর্শ করলেন। বাথিস্টলের ভিতরটা আলোকিত হয়ে গেল। পর মুহূর্তে মাথার উপরে সারিবদ্ধ বাল্‌বগুলো জ্বলে উঠল।

প্রফেসর পোশাকটার হাতার মধ্যে হাত দুটো ঢুকিয়ে দিলেন। গ্লাভসে আঙুল ঢুকিয়ে দিলেন। তার কণ্ঠ শোনা গেল, 'অলরাইট। এবার নামিয়ে দিন। থ্যাংকস এভরিবডি।'

বাথিস্টলের ঘাড়ের কাছে যে কেব্‌লটা যুক্ত ছিল সেটাতেই টান পড়ল এঞ্জিনিয়ার কপিকলের কন্ট্রোল লিভারের সুইচ টিপতেই। বাথিস্টলটা কয়েকহাত শূন্যে উঠে গেল। তারপর ডেকের সীমানা ছাড়িয়ে সমুদ্রের দিকে ঘুরল। ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল প্রফেসরের বর্ম। একটু পরে চারদিকে ঢেউ ছড়িয়ে সমুদ্রের নীল পানিতে মিলিয়ে গেল বাথিস্টলটা।

এতক্ষণ কুয়াশা নীরবে তার চোখের সামনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো দেখছিল। বিজ্ঞানের এক আশ্চর্য আবিষ্কার দেখতে দেখতে সে তার পরিবেশ বিস্মৃত হয়েছিল। সে ভুলে গিয়েছিল এই এক্সপেরিমেন্টের পরিণাম, ভুলে গিয়েছিল আসন্ন বিপদের কথা। শুধু একজন বৈজ্ঞানিক হিসেবে অথবা একজন মানুষ হিসেবে বিজ্ঞানের আশ্চর্য অবদান আর বিজ্ঞানীর সাধনার কথা তার মনটাকে নাড়া দিচ্ছিল। মনে মনে সে প্রফেসরের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী জানাল। প্রণতি জানাল বিজ্ঞানকে, পৃথিবীর সকল মহান বিজ্ঞান সাধককে।

মিনিট পনের পরে কপিকলের ঘড়ঘড় শব্দটা থেমে যেতেই কুয়াশার সংবিৎ ফিরল। দেখতে পেল টেলিফোন আর কপিকলের কেবল দুটোতেই ঢিল পড়েছে। চমকে উঠল কুয়াশা।

কিন্তু না, ভয়ের কিছু ঘটেনি। লাউডস্পীকার থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ ভেসে এল। যে নাবিকটা কেবলের দৈর্ঘ্য পরীক্ষা করছিল জো তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কত?'

নাবিকটা বলল, 'পাঁচশ পঁচাত্তর।'

জো টেলিফোনের মাউথপীসটায় মুখ লাগিয়ে বলল, 'পাঁচশ পঁচাত্তর ফুট।'

'চমৎকার। আমি একেবারে নিচে পৌঁছে গেছি। সবকিছু ঠিক আছে। একেবারে সবকিছু। কোন গোলমাল নেই। ঠাণ্ডাও লাগছে না। চমৎকার উত্তাপ আছে।' লাউডস্পীকারে শোনা গেল প্রফেসরের কণ্ঠ।

'চলাফেরা করতে পারা যাবে?' জো প্রশ্ন করল।

'মনে হচ্ছে পারব। এই বাথিস্টলটা সত্যিই আগেরটার চাইতে অনেক হাল্কা।'

'মাথা নোয়ানো যায় তো, মানে নিচে থেকে কোন কিছু তোলা যায় কি?'

'দেখি চেষ্টা করে।'

অনেকক্ষণ আর কোন কথা শোনা গেল না। ডেকের উপরও সবাই নীরবে বসে আছে। কুয়াশার দৃষ্টি জো'র দিকে ন্যস্ত। তার মনে হল জো'র নির্লিপ্ত চেহারায় একটা খুনির আবছা আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এডিথের দিকে তাকাল একবার। দেখল এডিথও তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার দৃষ্টি ভাবলেশহীন।

প্রফেসরের কণ্ঠ ভেসে এল, 'মি. স্টিফেন, নির্বিঘ্নে উঁচু হতে পারছি। একটা নুড়িও কুড়িয়েছি। আছে আমার পকেটে। একটা নতুন জাতের সামুদ্রিক মাকড়সা ধরেছি। ভারি সুন্দর দেখতে। নাকের কাছে একটা মাছ বড্ড ঘুরঘুর করছিল। ধরতে চেষ্টা করেছিলাম। বেজায় চালাক। পালিয়ে গেল। এবার আমি কিছুক্ষণ হেঁটে বেড়াবার চেষ্টা করব। আরও বিশফুট কেব্‌ল্ ছেড়ে দিন।'

যে লোকটা টেলিফোনের কেবল পরীক্ষা করছিল তাকে জো নির্দেশ দিল, আরও বিশফুট ওটা নামিয়ে দিতে। এঞ্জিনিয়ার আবার কপিকল চালু করল। কয়েক সেকেণ্ড পরে কপিকল বন্ধ হয়ে গেল।

আবার নেমে এল নীরবতা। কুয়াশা সিগারেট ধরাল। জো হাই তুলল। এডিথ আকাশের দিকে তাকাল। কার্ল বার্নহাম প্রচণ্ড শব্দ করে কেশে উঠল। এঞ্জিনিয়ার শিস দিল।

প্রফেসরের উল্লাসভরা কণ্ঠ শোনা গেল মিনিট পাঁচেক পর। তিনি বললেন, 'চমৎকার হাঁটা যায়। এদিকে ওদিকে প্রায় ত্রিশ ফুট হেঁটে এলাম নির্বিঘ্নে। অবশ্য খুব দ্রুত চলাফেরা করা যায় না। কিন্তু অসুবিধা হয় না। আর একটুও ক্লান্তি লাগছে না। আবার পরীক্ষা করে দেখেছি। কোথাও কোন ফুটো নেই। হিউমিডিটি রেকর্ডও স্বাভাবিক। যন্ত্রপাতি সবই ঠিকমত চলছে।'

জো বলল, 'সকলের আগে আমিই আপনাকে কনগ্রাচুলেশন জানাচ্ছি।'

প্রফেসর বললেন, 'থ্যাংকস।'

জো'র দৃষ্টিটা সকলের মুখের ওপর দিয়ে একবার ঘুরে গেল। কুয়াশা দেখল জোর চোখে-মুখে চাপা উল্লাস।

লাউডস্পীকার থেকে আবার কথা ভেসে এল, 'মি. স্টিফেন, অক্সিজেন সাপ্লাই-এ একটা গোলযোগ দেখা দিয়েছে। একটা সিলিণ্ডার ফুটো হয়ে গেছে। অথচ এখনও তার ভিতরে চার-ভাগের তিন ভাগ অক্সিজেন আছে। মনে হয়, প্যাকিং-এর সময় ভাল্‌ভ্ ফেটে গিয়েছিল। আপনারা এবারে তুলে ফেলুন। আমি অন্য সিলিণ্ডারটা দেখছি।'

'আপ।' নির্দেশ দিল জো এঞ্জিনিয়ারকে।

এঞ্জিনিয়ার কন্ট্রোল লিভারের সুইচ টিপল। কিন্তু কপিকলটা নড়ল না।

ঘড়ঘড় শব্দটাও হল না। চমকে উঠল কুয়াশা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে তাকাল জো'র দিকে। জো নির্লিপ্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'কি হল?'

এঞ্জিনিয়ার লিভার ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল, 'ঠিক বুঝতে পারছিনে। বৈদ্যুতিক কোন গোলমাল হবে থাকবে। বোধহয় কোন তার ছিঁড়ে গেছে। দেখছি আমি।' সিঁড়ির দিকে এগোল সে। বার্নহাম চেয়ার ছেড়ে উঠে গেল লিভারের কাছে। ধীরে সুস্থে বসল সেখানে।

জো টেলিফোনের মাউথপীসে মুখ লাগিয়ে বলল, 'প্রফেসর, কপিকলের কোথায় কি যেন একটা গোলমাল হয়েছে। সেটা ঠিক করা হচ্ছে। দেরি হবে না।' তক্ষুণি কোন জবাব এল না লাউডস্পীকার থেকে। এল কিছুক্ষণ পরে। প্রফেসর জানালেন, 'কপিকলে নিশ্চয়ই কোন মারাত্মক গোলমাল ঘটেনি? কিন্তু এদিকে অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন। রিজার্ভ সিলিণ্ডারটার অবস্থা আরও খারাপ। প্রেশার ক্রমেই বাড়ছে। দেরি করবেন না যেন।' শান্ত নিঃশঙ্ক কণ্ঠস্বর প্রফেসরের।

অথচ কুয়াশার ধমনীর মধ্য দিয়ে তীব্র রক্তস্রোত বয়ে যাচ্ছে। কঠিন দৃষ্টিতে সে তাকাল জো'র দিকে। জো'র দৃষ্টি তখন কন্ট্রোল লিভারে বসা বার্নহামের দিকে। তাকে কি যেন একটা ইঙ্গিত করল জো। বার্নহাম ঘাড় নাড়ল।

কুয়াশা নড়ল না। চুপ করে বসে রইল চাঞ্চল্য দমন করে। জো স্টিফেনের শয়তানি বুঝতে আর তার বাকি নেই। প্রফেসরকে তার বাথিস্টলের মধ্যেই মরতে হবে। ধীর স্থির ঠাণ্ডা মাথায় জো প্রফেসরের মৃত্যুর ব্যবস্থা করে রেখেছে। এ যেন গিলোটিন আবিষ্কারের সেই কাহিনীর মত। আবিষ্কারককেই গিলোটিনের প্রথম শিকার হতে হয়েছিল।

কুয়াশা দ্রুত চিন্তা করতে লাগল। এই নাটকীয় হত্যাকাণ্ডে সে অক্ষম নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করবে না। নিজের জীবন দিয়েও সে চেষ্টা করবে প্রফেসরকে রক্ষা করতে। কিন্তু কোনদিক দিয়ে অগ্রসর হতে হবে তা আগে ঠিক করতে হবে। অথচ সময় নেই। প্রতিটি মুহূর্তে প্রফেসর মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন।

এডিথের দিকে তাকাল কুয়াশা। দেখল, সে কাঁপছে। তার চেহারাটা ছাই-এর মত বিবর্ণ। সে বলছিল, 'জো, আমরা···আমরা কিছু করতে পারি না?' তার কম্পিত কণ্ঠে আকুল আবেদন।

জো শ্রাগ করল। 'আমি এসব যন্ত্রপাতি কিছুই বুঝি না।

এঞ্জিনিয়ার ফিরে এল সিঁড়ি বেয়ে। কুয়াশা ও এডিথ নিঃশ্বাস বন্ধ করে তার দিকে তাকাল। তার চেহারাটা ভাবলেশহীন। ওদের নীরব প্রশ্নের জবাবে সে বলল, 'মনে হয়, একটা আর্মেচার পুড়ে গেছে। ওরা দেখছে সেটা।'

আবার প্রফেসরের কণ্ঠ শোনা গেল, 'রিজার্ভ সিলিণ্ডারটা আরও খারাপ ছিল। ওটা বোধহয় এখুনি ফেটে যাবে।' 'আপনারা এত দেরি করছেন কেন?' তাঁর কণ্ঠে

এবারে একটু ব্যগ্রতা।

'কপিকলটা মেরামত করা হচ্ছে। এক্ষুণি হয়ে যাবে।'

'সিলিণ্ডারটা এই মাত্র ফেটে গেল,' প্রফেসর জানালেন।

এতক্ষণে কথা বলল কুয়াশা। প্রশ্ন করল, 'আর একটা কপিকলে কেবলটা জুড়ে দিলে হয় না?'

'অতটা ভার বইবার মত কপিকল আর নেই।' আগের চাইতেও নিস্পৃহ শোনাল জো'র কণ্ঠস্বর।

'তাহলে, তাহলে, আমরা সবাই মিলে যদি বাথিস্টলটা টেনে তুলি—?' কুয়াশা প্রস্তাব করল।

'তাতেও অন্তত বিশ মিনিট সময় লাগবে।'

কুয়াশা জানে জো যা বলছে তা সত্যি। ইয়টের সবাই মিলেও যদি কপিকলটা টেনে তোলা যায় তবুও প্রফেসর রোজেনবার্গকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া যাবে না।

'আমি অত্যন্ত দুর্বল আর অসুস্থ বোধ করছি। এখুনি আমাকে তুলতে না পারলে আর কোন লাভ হবে না।' দুর্বল শোনাল প্রফেসরের কণ্ঠ। তাতে এই প্রথম আতঙ্কের আভাস।

আর সময় নেই। কুয়াশা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। বার্নহাম কেন কন্ট্রোল লিভারটা আড়াল করে বসে আছে কুয়াশা তা জানে। তড়াক করে লাফ দিয়ে সে এসে দাঁড়াল কন্ট্রোল লিভারের কাছে। সে বলল, 'মি. বার্নহাম, আমি একবার চেষ্টা করে দেখি। সরুন আপনি।'

বার্নহাম সরল না। মাথা নেড়ে হিংস্রকণ্ঠে বলল, 'চেষ্টা তো করা হচ্ছেই। আর একটু অপেক্ষা করে দেখা যাক না। তাছাড়া আপনি এসবের···।'

'আপনি সরে দাঁড়ান।' কঠিন কণ্ঠে কুয়াশা নির্দেশ জারি করল। তার হাতে ঝলসে উঠল একটা অটোমেটিক।

কুকুরের মত খেঁকিয়ে উঠল বার্নহাম। কিন্তু স্থান ত্যাগ করল না।

জো নিস্পৃহ ভঙ্গিতে তাকাল কুয়াশার দিকে। বলল, 'আপনি কি পাগল হলেন মি. ফগ?'

'এখনও হইনি। কিন্তু বার্নহাম যদি তিন সেকেণ্ডের মধ্যে সরে না যায় তাহলে তার মৃত্যুর জন্যে আমি দায়ী হব না।'

জো বিচলিত হল না। সে আগের মতই আবেগহীন, নিরুত্তাপ গলায় বলল, 'এরকম হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হলে কোন লাভ হবে না। সব করম চেষ্টাই তো হচ্ছে।'

কুয়াশা জো'র দিকে কঠিন দৃষ্টি মেলে বলল, 'কিন্তু আসল কাজটা হচ্ছে না। আর সেটা আমি করতে যাচ্ছি। কপিকলের কোথাও কোন গলদ নেই। আমি তা জানি। প্রফেসরকে তোমরা খুন করছ।' তপ্তদৃষ্টি বার্নহামের দিকে ফিরিয়ে বলল, 'সর এখুনি। আর আমি যা করি দেখ।'

'মাই ডিয়ার মি. ফগ…'

'আপনার পিছনে!'

এডিথের আর্তনাদ কানে পৌঁছুতেই বিদ্যুৎগতিতে পিছনের দিকে ফিরে তাকাল কুয়াশা। একটা লোক মোটা একটা ডাণ্ডা হাতে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কুয়াশা সরে দাঁড়াতেই লোকটা ডাণ্ডাসমেত কন্ট্রোল লিভারের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কিন্তু পরমুহূর্তেই কুয়াশা পিঠের উপর সূঁচ-এর খোঁচা অনুভব করল। চোখে অন্ধকার দেখল কুয়াশা। এই অভিজ্ঞতা তার জীবনে প্রথম।

তিন

দুনিয়ার সবচেয়ে বড় বিস্ময় অপেক্ষা করছিল মি. সিম্পসনের জন্যে। প্যারিসে ইন্টারপোলের (আন্তর্জাতিক পুলিস) সেমিনারে পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। এবারে সেমিনারের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল আন্তর্জাতিক মুদ্রা ও মাদক দ্রব্য চোরাচালানী।

পেপারে পড়েছিলেন মি. সিম্পসন আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে। তাতে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ সাজেশনও ছিল। প্যারিস পুলিসের প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন। সংবাদপত্রে ছবি উঠেছিল। সোজা কথা, বেশ একটু আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল।

সেমিনার শেষে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের আগে একটা টেলিগ্রাম পেলেন। বার্তা প্রেরক শার্লস মরিয়া। তিনি লিখেছেন, 'বন্ধু, আমায় নিশ্চয়ই চিনতে পারবে। আপাতত একটা কেসের ব্যাপারে দিনার্দ বীচে আছি। জায়গাটা সত্যিই মনোরম। চলে এস। পুরানো বন্ধুর সান্নিধ্য আর বীচের সুন্দরীদের ভিড় নিশ্চয়ই মন্দ লাগবে না। শার্লস মরিয়া।'

চিঠি পড়েই মনে পড়েছে শার্লসকে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে দুজন একসঙ্গে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। বেশ হৃদ্যতা জন্মে গিয়েছিল দুজনের মধ্যে। বুদ্ধিমান চৌকশ পুলিস অফিসার শার্লস। বিশেষ করে তদন্তের কাজে মাথাটা খোলে ভাল। চিঠির আহ্বান উপেক্ষা করেননি। কয়েকদিনের জন্য ঢাকায় ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দিনার্দ চলে এসেছেন।

ইন্সপেক্টর শার্লস খুশি হয়েছেন পুরানো বন্ধুকে পেয়ে। নানা কথার ফাঁকে বীচের হত্যাকাণ্ড আর গভীর সমুদ্রের তলায় ডুবে যাওয়া জাহাজ লুণ্ঠনের কথাও এসে পড়েছিল। সামুদ্রিক ঘটনাগুলো বর্ণনা করেছিলেন শার্লস কথা প্রসঙ্গে।

'তুমি তাহলে বলতে চাইছ যে বীচের সেই হত্যাকাণ্ড আর সাগরের তলায় জাহাজ লুণ্ঠনের ঘটনা একসূত্রে গাঁথা?' সবটা শুনে প্রশ্ন করলেন মি. সিম্পসন।

'দুয়ে দুয়ে চার হয়। বুঝতেই পারছ।'

'তুমি ঠিক পথ ধরেই এগোচ্ছ। আর তোমার ধারণা হোটেল ডি লা মেয়ারে

আর্থার ল্যাম্প বলে যে লোকটা থাকত সেই লোকটাই এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক আর ঐ ডীপসী র‍্যাকেট দলের দলপতি।'

'আমি ঠিক তা মনে করি না। ও ধারণা পোষণ করেন আমাদের ইন্সপেক্টর দুবোঁয়া। শুধু ধারণা নয়। এ তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস।'

'সেই লোকটার কোন হদিস মিলেছে?'

মাথা নাড়লেন ইন্সপেক্টর, 'হোটেলে সে নেই। হোটেলের ম্যানেজার অবশ্য তাকে এক ইয়টে দেখেছে পরশু। তাকে নিয়ে আজ রাতে ইন্সপেক্টর দুবোঁয়ার সেই ইয়টে হানা দেবার কথা। এতক্ষণ হয়ত দিয়েছেও।'

'আচ্ছা। নিহত যুবতীকে যে ক্যানোতে পাওয়া গিয়েছিল তাতে কোন অস্ত্র ছিল? আর ক্যানোর মালিকই বা কে, তার কোন খোঁজ করেছ?'

'ক্যানোতে পাটাতনের নিচে একটা রিভলভার পাওয়া গিয়েছিল। তাতে দুজনের হাতের ছাপ ছিল। মেয়েটার হাতের ছাপ আর অন্য একজনের। সে ছাপটা পুরুষের। কিন্তু গুলি একটাও খরচ হয়নি। মেয়েটার কোমরে একটা পাউচও পাওয়া গেছে। কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করে দেখা গেছে তাতে রিভলভার ছিল। আমার মনে হয়, রিভলভারে আর যে হাতের ছাপটা ছিল ওটা সেই ল্যাম্পের। সে-ই পাউচের ভিতর থেকে রিভলভারটা বের করে পাটাতনের তলায় রেখেছিল। ক্যানোর স্টীয়ারিং-এ তারই হাতের ছাপ আছে। ভদ্রলোক হয়ত সরল বিশ্বাসেই পুলিস স্টেশনে এসেছিলেন খবরটা দিতে। কিন্তু আমার বন্ধু মসিয়ে দুবোঁয়া তাকেই হত্যাকারী সাব্যস্ত করে বসলেন একটা বেনামী টেলিফোন কল পেয়ে।'

'তাহলে তুমি বোধহয় বলতে চাও বেনামী টেলিফোন কল যে করেছিল সেই হত্যাকারী বা হত্যাকারীর পক্ষের অর্থাৎ সেই র‍্যাকেটের লোক?'

'তোমারও তাই মনে হয় না?'

'তোমার ধারণাই ঠিক। কিন্তু আমি ভাবছি, সেই ল্যাম্প লোকটা গা ঢাকা দিল কেন?'

'সোজা জবাব,' দাড়িতে আঙুল বুলাতে বুলাতে বললেন ইন্সপেক্টর শার্লস 'পাছে দুবোঁয়া তাকেই ফাঁসীতে লটকাতে চায় সেই ভয়ে।'

'সম্ভবত তোমার ধারণাই ঠিক। যাক, এখন তুমি কোন পথে এগুবে ভাবছ?'

'ভাবছি তো অনেক পথের কথাই। কিন্তু দিশেহারা হয়ে পড়ছি। কোন কূল কিনারা পাচ্ছি না। বরং আরও জটিল হয়ে উঠছে।'

মি. সিম্পসন কিছু বললেন না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ইন্সপেক্টর শার্লসের মুখের দিকে। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর ইন্সপেক্টর বললেন, 'হারবারে পরের দিন আরও একটা লাশ পাওয়া গিয়েছিল। তোমাকে বলেছি বোধহয়?'

মাথা নাড়লেন মি. সিম্পসন।

ইন্সপেক্টর বললেন, 'লোকটার পরিচয় জানা যায়নি। কিন্তু অনেকেই বলেছে,

ঐ রকম চেহারার একটা লোককে নাকি রোজমেরী নামে একটা ইয়টে দেখা যেত প্রায়ই।'

'সেখানে খোঁজ-খবর করে দেখেছ?'

'তা আর পারলাম কোথায়। খবরটা জানবার পরেই শোনা গেল রোজমেরী হারবার ছেড়ে চলে গেছে।'

'ইয়টটা নিশ্চয়ই রেজিস্টার্ড?'

'রেজিস্টার্ড তো বটেই। লিভারপুলে রেজিস্ট্রি করা হয়েছে। জো স্টিফেন নামে এক ব্যবসায়ী জাহাজটার মালিক। খোঁজ নিয়ে দেখেছি অতীতে কোন খারাপ রেকর্ড নেই তার নামে।'

তাহলে ব্যাপারটা সত্যি বড্ড জটিল। কোন দিকেই কোন সূত্র পাওয়া যাচ্ছে না। তবুও আমার মনে হয় এই জো স্টিফেন সম্পর্কে ভাল করে খোঁজ খবর করা দরকার। আমার মনে হয় কোন পথের সন্ধান পেয়েও যেতে পার। আর তার ইয়টটা কি যেন নাম বললে...'

'রোজমেরী।'

'হ্যাঁ, রোজমেরী কোনদিকে গেছে জানতে পেরেছ কিছু?'

'তা কি করে জানা যাবে?'

'খোঁজ করে,' হাসলেন মি. সিম্পসন। 'কাছে পিঠে আর যে সব জাহাজ-টাহাজ ছিল তাদের কাছে খোঁজ নাও। পোর্ট অফিসেও তো অনেক জাহাজ তাদের গন্তব্যস্থল জানিয়ে যায়, বিপদের সময় সাহায্য পাবার আশায়।'

'সব জায়গায় খোঁজ নিয়েছি।' কেউ কিছু বলতে পারল না। তাছাড়া এখন ওয়্যারলেস ট্রান্সমিশন এত উন্নত হয়েছে যে, পোর্ট অফিসে কোন খবর দেবার প্রয়োজন কেউ অনুভব করে না। তবুও সেখানে খোঁজ করেছি। হারবারের প্রায় প্রত্যেকটা জাহাজে খোঁজ নিয়েছি। নাবিকদের জিজ্ঞেস করেছি। কেউ বলতে পারল না।'

'তাতে তো সন্দেহ আরও জোরদার হয়,' মি. সিম্পসন বললেন।

'কিন্তু...'

'আর কিন্তু নয়। ভুল হলে পরে তো শোধরাবার সুযোগ রইলই।'

ইন্সপেক্টর শার্লস কোন জবাব দিলেন না। নীরবে চিন্তা করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পর ঘড়ি দেখে বললেন, 'চল, ওঠা যাক। একটু ঘুরে আসি। ইন্সপেক্টর দুবোঁয়া কি শিকার করে নিয়ে এলেন দেখে আসি। অবশ্য তুমি যদি ক্লান্ত বোধ না কর।'

'না না, ক্লান্ত হবার কি আছে—চল।'

মিনিট পাঁচেক পরে দিনার্দ পুলিস স্টেশনে পৌঁছে গেলেন দুজনে একটা ট্যাক্সি করে। একজন কনস্টেবল ওদের দেখে এগিয়ে এল। ইন্সপেক্টর দুবোঁয়ার খোঁজ

করতেই সে বলল, 'উনি তো একটা ইনকোয়্যারীতে গেছেন। এই এলেন বলে। ঐ তো এসে গেছেন বোধহয় উনি।'

পিছনে ফিরে তাকালেন মি. সিম্পসন ও ইন্সপেক্টর শার্লস। দুটো পুলিস ভ্যান আর একটা লরী একের পর এক পুলিস স্টেশন প্রাঙ্গণে ঢুকল চারদিকে আলো ছড়িয়ে।

সামনের ভ্যান থেকে নামলেন ইন্সপেক্টর দুবোঁয়া। তাঁর চোখে-মুখে খুশি উপচে পড়ছে।

'আরে কি ব্যাপার, মসিয়ে ইন্সপেক্টর। মনে হচ্ছে দিগ্বিজয় করে ফিরলে?'

'দিগ্বিজয়। হ্যাঁ তা বলতেই পার। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। শুধু দলের চাঁইটাকে ধরতে পারিনি। কিন্তু সবকটা স্যাঙ্গাৎকে বেঁধে নিয়ে এসেছি। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন ইন্সপেক্টর দুবোঁয়া। 'ল্যাম্প না কি ল্যাম্ব, মানে র‍্যাকেটের, নেতা, সে অবশ্য পালিয়ে গেছে আগেই। কিন্তু বাদবাকি সবকটাকে ঝেঁটিয়ে নিয়ে এসেছি।'

মি. সিম্পসনের দিকে তার দৃষ্টি পড়ল. 'আরে আপনি! মি. সিম্পসন যে. কি খবর?'

মি. সিম্পসন উত্তরে হাসলেন, বললেন, 'খবর তো দেখছি সব আপনার কাছে।'

'ঠিক বলেছেন। একদম তাজা খবর। কয়েকটা দুনিয়া জ্বালানো ডাকাতকে ধরে এনেছি। কত মহা মহা পুলিস অফিসার যা পারেনি আমি সামান্য নিম্নপদস্থ পুলিস অফিসার হয়ে অনায়াসে সেই কাজটা করে ফেললাম।' আত্মগর্বে দীপ্ত হলেন তিনি।

হাতের ইশারায় একজন কনস্টেবলকে ডেকে আসামীদের তাঁর রুমে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন ইন্সপেক্টর। বললেন. 'খুব সাবধান। ভয়ঙ্কর লোক ওরা। পালাতে যেন না পারে।'

মি. সিম্পসন আর ইন্সপেক্টর শার্লসের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আসুন আপনারা।

ওরা দুজন ইন্সপেক্টরের পিছন পিছন চললেন। রুমে ঢুকে তিনি ওদের বসতে ইশারা করলেন। ইন্সপেক্টর শার্লস বসতে বসতে বললেন. 'কই হে দেখি তোমার এক্সপ্লয়েট।'

'তিষ্ঠ, বৎস। এখুনি এসে যাবে,' সিগারেট এগিয়ে দিতে দিতে জবাব দিলেন ইন্সপেক্টর।

করিডরে অনেকগুলো পদশব্দ শোনা গেল। আসামীদের নিয়ে কয়েকজন পুলিস ঢুকল। আর আসামীদের দিকে চেয়ে বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেলেন মি. সিম্পসন। আরে এযে তারই ঘনিষ্ঠ বন্ধু শহীদ খান, কামাল, শহীদ খানের স্ত্রী মিসেস মহুয়া খান, চাকর গফুর।

অবাক হয়ে তিনি চেয়ে রইলেন ওদের দিকে। তাঁর বাকস্ফূর্তি হল না

অনেকক্ষণ। তিনি ভাবছিলেন, 'আমি স্বপ্ন দেখছি না তো! কিন্তু এ তো স্বপ্ন নয়। জেগেই তো আছি।'

আসামীরাও অবাক হয়ে চেয়ে রইল মি. সিম্পসনের দিকে। সংবিৎ ফিরে পেল শহীদই প্রথম। কিন্তু কোন কথা না বলে মুচকি হাসল। কথা বলল প্রথমে কামাল, 'মি. সিম্পসন, আপনি এখানে?'

তার প্রশ্নে মি. সিম্পসনও সংবিৎ ফিরে পেলেন। তিনিও বললেন, 'তাইত হে, তোমরা কোত্থেকে এলে?' ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বিব্রত মহুয়ার উদ্দেশ্যে বললেন, 'মিসেস খান, আপনি বসুন।' মহুয়া বসল না। দাঁড়িয়ে রইল।

ইন্সপেক্টর শার্লস ও ইন্সপেক্টর দুবোঁয়া নির্বোধের মত একবার আসামীদের আর একবার মি. সিম্পসনের দিকে তাকাতে লাগলেন। সঙ্গী কনস্টেবলগুলোও কিছু বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে গেল। কামাল ভেতরে ভেতরে গজরাচ্ছিল। এতক্ষণে সে ফেটে পড়ল, 'ঐ অতি বুদ্ধিমান লোকটা আমাদের গ্রেফতার করে এনেছে। আমরা নাকি গভীর সমুদ্রের তলে ডোবা জাহাজ ডাকাতি করি। শুনলেন, মি. সিম্পসন?'

তাকে হাত তুলে থামবার নির্দেশ দিয়ে মি. সিম্পসন ফিরে তাকালেন ইন্সপেক্টর দুবোঁয়ার দিকে। ভীষণ বিরক্ত হলেও তিনি তা চেপে স্বভাবসুলভ মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'মশিয়ে ইন্সপেক্টর, আপনার বোধহয় কোথাও ভুল হয়ে থাকবে।'

ইন্সপেক্টর দুবোঁয়া ইতিমধ্যেই ঐ ধরনের কিছু একটা আন্দাজ করেছিলেন। তিনি আমতা আমতা করে বললেন, 'না না, ভুল হবে কেন? হোটেলের ম্যানেজার যে ইয়টটা দেখিয়ে দিল।'

'ম্যানেজার কি ওদের মধ্যে কাউকে দেখিয়েছিলেন?' প্রশ্নটা এবারে করলেন ইন্সপেক্টর শার্লস। তাঁর কণ্ঠে বিরক্তির আভাস।

'তা অবশ্য নয়,' স্বীকার করলেন ইন্সপেক্টর দুবোঁয়া। 'তবে...' থেমে গেলেন তিনি।

একজন কনস্টেবল খুক খুক করে হাসছিল। ইন্সপেক্টর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন।

তিক্তকণ্ঠে ইন্সপেক্টর শার্লস বললেন, 'ব্যস। বুঝেছি, তোমার আর কিছু বলতে হবে না। ইশারায় কনস্টেবলদের চলে যেতে নির্দেশ দিলেন। ওরা চলে গেল। তিনি শহীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বসুন আপনারা।'

ওরা বসতেই মি. সিম্পসন বললেন, 'মশিয়ে ইন্সপেক্টর, আপনি যাদের অপরাধী সন্দেহে ধরে এনেছেন এরা কেউই কোনদিন কোন অপরাধ করেননি। ওরা সবাই আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমার দেশের লোক। ইনি মি. শহীদ খান, বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ। উনি মিসেস খান, মি. কামাল আহমদ, ওটি ওদের চাকর গফুর, অবশ্য ওটাকে চিনতে পারছিনে আমি।'

কামাল বলল, 'মি. চার্লি হ্যারিস, আমাদের নতুন বাটলার।'

ইন্সপেক্টর দুবোঁয়া ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন ওদের দিকে

শহীদ এতক্ষণ কোন কথা বলেনি। সে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'আমি একটা টেলিফোন করতে চাই। এখান থেকে সম্ভব হবে কি?'

মি. সিম্পসন শহীদের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন বুঝে নিয়ে বললেন, 'কোথায় টেলিফোন করবে?'

'প্যারিসে। বাংলাদেশ এমব্যাসীতে। আমাদেরকে যে অপমান করা হয়েছে সেটা এমব্যাসীকে জানানো দরকার।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'সেটা করা অন্যায় হবে না। কিন্তু আমার অনুরোধ, ব্যাপারটা ভুলে যাও। মশিয়ে ইন্সপেক্টর…।'

'আমি। আমি সত্যি দুঃখিত, মশিয়ে খান। প্লীজ। আমি সত্যি দুঃখিত।'

চার

'এখন নিশ্চয়ই অনেকটা ভাল লাগছে?' প্রশ্ন করল জো স্টিফেন। সেই নিরুত্তাপ আবেগহীন কণ্ঠস্বর। যেন জবাব না পেলেও কিছু এসে যায় না।

মাথা নাড়ল কুয়াশা।

হুইল হাউজে একটা আর্মচেয়ারে সে শুয়ে আছে। একহাতে সিগারেট অন্য হাতে ব্র্যাণ্ডির গ্লাস। তাকে বাঁধা পর্যন্ত হয়নি। কিন্তু এখানেই ত্রুটিহীন অতিথি আপ্যায়নের সমাপ্তি হল। জো জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢোকাল। বার্নহামের ডান হাতটাও ঢুকে আছে তার জ্যাকেটের পকেটে।

কুয়াশা সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ওদের লক্ষ্য করছিল। মৃদুকণ্ঠে সে প্রশ্ন করল, 'প্রফেসরের খবর কি?'

'দুঃখের বিষয় গলদটা ধরা পড়েছিল অনেক দেরিতে, মি. কুয়াশা।'

জো'র মুখে তার নাম শুনে চমকাল না কুয়াশা। তব প্রশ্ন করল. 'তুমি জানতে আমাকে তাহলে?'

'নিশ্চয়ই। তবে আগে নয়। জেনেছি গতকাল মাত্র। তোমার হয়ত মনে আছে ক্যাসিনোতে ছবি তোলার কথা। এখন তোমাকে নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না যে, প্রফেসরের নয়, তখন তোমারই ছবি তোলা হয়েছিল। সে ছবি কয়েক জায়গায় পাঠিয়েছিলাম তোমার পরিচয় সংগ্রহের জন্য।'

কুয়াশার মনে পড়ল, বুঝতে পারল বোকামি হয়েছিল। আরও বুঝল, তাকে আপ্যায়নের জন্যে উপযুক্ত বন্দোবস্ত করতে ত্রুটি করবে না জো। তার দিকে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। হয়ত তার চিন্তা প্রবাহ অনুধাবনের চেষ্টা করছে।

মৃদু হাসল কুয়াশা। বলল, 'তারপর? এখন কি হবে?'

'সেটা তোমার উপর নির্ভর করছে।' সিগারেট ধরাল জো। ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'তুমি আমাকে একটা অসুবিধায় ফেলে দিয়েছ। আমার মারাত্মক ক্ষতি করেছ।'

'মানে প্রফেসরের ব্যাপারে?' অকৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করল কুয়াশা।

সবেগে মাথা নাড়ল জো। 'উঁহুঁ, তাকে মরতেই হত। মাঝখানটায় তুমি এসে পড়াতে একটু আগেই শেষ করতে হল এই যা।'

কুয়াশা তবুও অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

'আমি বলছি একটা দুর্ঘটনার কথা। যেটা তোমার ইয়টে ঘটেছিল। তুমি আমার সবচেয়ে সেরা সেফ-ব্রেকারকে মেরে ফেলেছ। যে লোকটা পরশু রাতে তোমার ইয়টে হানা দিয়েছিল, তার কথা বলছি।'

'অসম্ভব,' প্রবলভাবে মাথা নাড়ল কুয়াশা। 'তাকে আমি খুন করিনি। ছেড়ে দিয়েছি। অবশ্য পারতাম খুন করতে।'

অবিশ্বাসের হাসি হাসল জো। বলল, 'ওসব মিথ্যা কথায় ভবি ভোলবার নয়। তাহলে সে গেল কোথায়? ফিরে এল না কেন?'

'তা আমি জানি না। তবে জেনে রেখ, আমি কখনও মিথ্যা কথা বলি না।'

জো'র ভাবান্তর হল না। সে বলল, 'ওরকম দম্ভ আমিও করে থাকি। জান না বোধহয়, ইউরোপের সেরা সেফ-ব্রেকার ছিল ও। আমার একজন মূল্যবান সহকারী...সুতরাং আমি তাকে ফিরে চাই।'

কুয়াশা কোন জবাব না দিয়ে ব্র্যাণ্ডিতে চুমুক দিল। জো'র সেই অমূল্য সম্পদ কোথায় গেছে তা কুয়াশার জানার কথা নয়। হয়ত সে জো'র কাছে ব্যর্থতার কৈফিয়ত দেবার বা শাস্তি লাভের ভয়ে পালিয়েছে অথবা নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেয়ে অতীত কৃতকার্যের অনুশোচনায় সে অসৎ জীবন আর অসৎ সঙ্গীদের বর্জন করেছে। অথবা মহত্ত্বের স্পর্শে ঘৃণ্য জীবনের প্রতি বিকর্ষণ জন্মেছে। কিন্তু জো'র মত চরিত্রের লোক তা বুঝবে না।

জো উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, তার দৃষ্টি বাইরের দিকে। বার্নহাম হাত দশেক দূরে। হুইল চালক হুইল নিয়ে ব্যস্ত। বার্নহামকে এই ফাঁকে কাবু করা যায় কিনা ভাবল কুয়াশা।

কিন্তু না। তা যায় না। শায়িত অবস্থা থেকে উঠে বসবার চেষ্টা করল সে ছাইদানি খোঁজার ভান করে। মাথাটা সামান্য তুলতেই রিভলভার বের করল বার্নহাম। কার্পেটের উপরই সিগারেটের ছাই ফেলল কুয়াশা।

মিনিটখানেক পরে ঘুরে দাঁড়াল জো। কিন্তু এগিয়ে এল না। সেখানে দাঁড়িয়ে থেকেই বলল, 'তোমার জন্যেই আমি একটা সেরা কাজের লোক হারিয়েছি। তার মত লোক পাওয়া কঠিন। তাছাড়া পেতে সময়ও লাগবে অনেক। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমি দেরি করতে পারছি না মোটেও। আর সৌভাগ্যের বিষয়, তার বদলে আমি তোমাকে পেয়েছি।'

'সেটা দুর্ভাগ্য না সৌভাগ্য এখুনি তা বুঝলে কি করে?'

সে কথার জবাব দিল না জো। বলল, 'আমরা এখন যাচ্ছি কাসওয়েট লাইট হাউজের দক্ষিণ পশ্চিমে। সেখানে আছে নরউইচ নামে একটি জাহাজ। তার স্ট্রংরূমে আছে তিন কোটি পাউণ্ডের আকাটা হীরে। জাহাজটা ডুবেছিল ১৯২৯ সালে। সেগুলো আমার চাই। কিন্তু আমার দলের যে লোকটা স্ট্রংরূম খুলবার এক্সপার্ট, তোমার জন্যে তাকে হারিয়েছি। আর সেই জন্যে তোমাকেই এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তোমার সম্পর্কে যতটা জেনেছি একাজটা তোমার পক্ষে অসম্ভব হবে না।'

'আর সেটা যে সম্ভব আমাকে তা প্রমাণ করতে হবে।'

'স্বভাবতই আমি তাই চাই।'

'ঐ বাথিস্টলে?'

'তার দরকার নেই। নরউইচ ডুবেছে মাত্র বিশ ফ্যাদম পানির তলে। সাধারণ ডাইভিং স্যুটই তার জন্যে যথেষ্ট।'

'তুমি আমাকে পার্টনারশিপের প্রস্তাব দিচ্ছ?'

'নিশ্চয়ই না। আমার ক্ষতিপূরণের দাবি জানাচ্ছি।'

মনে মনে হাসল কুয়াশা। সে কখনও আত্মসমর্পণ করেনি, করবেও না। জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন তার কাছে বড় নয়। ন্যায়ের প্রশ্নটাই বড়।

শান্তভাবে প্রশ্ন করল। 'রাজি না হলে কি হবে?' শ্রাগ করল জো। 'আমি মেলোড্রামাটিক ভয় দেখানো পছন্দ করি না। সেটা বুঝতে তোমার কষ্ট হবার কথা নয়। আমি ধরেই নিচ্ছি তুমি রাজি হবে। তোমার নিজের জন্যে নাহলেও অন্তত এডিথের জন্যে। আর আমিও কথা দিচ্ছি তুমি রাজি হলে আমি এডিথকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিরাপদে সমুদ্রের তীরে নামিয়ে দেব।'

'এইটুকুই মাত্র?'

'এর বেশি আমার দেবার কিছু নেই।' স্বভাবসুলভ নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল জো। 'তোমাকে পনের মিনিট সময় দেয়া হল। এর পর তোমাকে তোমার সিদ্ধান্ত জানাতে হবে। রাজি হলে ভালই। না হলে—' একটু থামল জো। খুব ধীরে ধীরে আর চিবিয়ে বলল, 'আরও পনের মিনিটের মধ্যে তোমার প্রাণপাখি দেহপিঞ্জর ছেড়ে যাবে। অবশ্য যতক্ষণ তুমি জীবিত থাকবে ততক্ষণ আমি জানি তুমি নানারকম অবাস্তব আশায় দুলবে, হাজারটা পরিকল্পনা করবে, পিঞ্জরাবদ্ধ বাঘের মত গর্জন করবে, আর অলৌকিক একটা কিছু প্রত্যাশা করবে।'

পনের মিনিট পরে কুয়াশা জানাল সে রাজি আছে।

জো বলল, 'দ্যাটস লাইক এ গুড বয়।' বার্নহামের দিকে ফিরে জো বলল, 'ওকে নয় নম্বরে নিয়ে যাও।'

বার্নহাম কুয়াশাকে উঠবার জন্যে ইশারা করল।

নয় নম্বর কেবিনে বসে ছিল কুয়াশা ও এডিথ।

কুয়াশা বলল, 'শোন, এডিথ। আমেরিকার এক ম্যাগাজিনে একটা চুটকি পড়েছিলাম। এক ভদ্রলোকের ধারণা হয়েছে তিনি মারা গেছেন। অনেক রকম চেষ্টা করা হয়েছিল তাকে তার এই ভ্রান্ত ধারণা সাইকলজির ভাষায়, যাকে বলে ডিলিউশন—তা থেকে মুক্ত করার জন্যে। কোন চেষ্টাই ফলপ্রসূ হয়নি। শেষটায় তার গিন্নী তাকে নিয়ে গেলেন এক ডাকসাইটে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে। তিনিও অনেক ভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে ভদ্রলোক মরেনি। কিন্তু ভদ্রলোকের এক কথা। অবশেষে ডাক্তার বললেন, আচ্ছা, মরা মানুষের গা দিয়ে রক্ত ঝরে না তা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন? ভদ্রলোক জানালেন যে, তিনি তা স্বীকার করেন। ডাক্তার হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই, ভদ্রলোকের আঙুলে ছুরি বসিয়ে দিয়ে ঘ্যাঁচ করে কেটে দিলেন। রক্ত বেরোল বিস্তর। ভদ্রলোক তো রেগে কাঁই। কিন্তু ডাক্তার হাসতে হাসতে বললেন, ঐ দেখুন আপনার হাত দিয়ে রক্ত ঝরছে, তার মানে আপনি মরেননি, বেঁচে আছেন। ভদ্রলোক জবাব দিলেন, 'এখন দেখতে পাচ্ছি মরা মানুষের গা থেকেও রক্ত ঝরে। গল্পটা কেমন লাগল?'

এডিথ শান্ত স্বরে প্রশ্ন করল, 'আপনার বোধহয় কোন কিছুতেই এসে যায় না। তাই না?' তার চোখ-মুখ বিবর্ণ। তাতে হতাশার ছাপ স্পষ্ট।

কুয়াশা হাসল। বলল, 'আমাদের দেশের এক কবি বলেছেনঃ জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে। তাছাড়া মরবার একটা চান্স যখন পাওয়াই যাচ্ছে…।'

'কতক্ষণ আর বেঁচে থাকব বলে আপনার মনে হয়?' ক্ষীণকণ্ঠে বলল এডিথ।

'অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। আমি বাঁচব দন্তহীন থুত্থুরে বুড়ো যদ্দিন না হই, আর তোমার চুলগুলো শনের নুড়ি যতদিন না হয় ততদিন। জো আমাকে জানিয়েছে, আমি যদি ওর কাজটা করে দিই তাহলে আমার পৌত্রীর বিয়ের সমস্ত খরচ সেই চালাবে।' তরল কণ্ঠে বলল কুয়াশা।

এডিথ অসহায়ের মত কুয়াশার দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে বলল, 'আমাদের বাঁচবার কোন সম্ভাবনা আছে এ কথা এখনও বিশ্বাস করেন আপনি?'

'তুমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস কর না।'

'আপনি করেন?'

'করি বৈ কি? মনে তো হয় জো তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে।'

'কিন্তু সে প্রফেসরকে হত্যা করেছে!' স্মরণ করিয়ে দিল এডিথ।

'সে তো বাথিস্টলের জন্যে। আমাদের হত্যা করে তো জো'র কোন লাভ হবে না।'

'তুমি কি সত্যি একথা বিশ্বাস কর, কুয়াশা?'

'নিশ্চয়ই বিশ্বাস করি। আর সেই বিশ্বাসের জোরেই তো আমি জো'র জন্য

নরউইচ জাহাজের স্ট্রংরুম খুলতে যাচ্ছি।'

'শেষ পর্যন্ত ঐ শয়তানেরই জয় হবে। কিন্তু কেন?'

'ঐ যে বললাম জো আমাদের হত্যা করবে না এই আশায়। জো'র কাজটা না করলে মরতেই হবে। অবশ্য করলেও বেঁচে থাকার ভরসা তেমন নেই। তাছাড়া মৃত্যুর আগে একটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে। ডাইভিং স্যুট পরে এর আগে কখনও স্ট্রংরুম খুলতে নামিনি। বেশ একটা অ্যাডভেঞ্চার হবে।'

'তাহলে তুমিও পুরোপুরি বিশ্বাস কর না জো'র প্রতিশ্রুতিতে।'

প্রসঙ্গটা কুয়াশার প্রিয় নয়। সে যে জো'র প্রস্তাবে রাজি হচ্ছে তা না বোঝার মত বোকা এডিথ নয়। কিন্তু এডিথ, কুয়াশা জানে, অন্যর জীবনের বিনিময়ে নিজের জীবন বাঁচাতে রাজি নয়। আসল সত্যটা সে তাই কুয়াশার মুখ থেকেই শুনতে চায়।'

'তুমি ভাল উকিল হতে পারতে, এডিথ,' কুয়াশা বলল।

'এটা আমার প্রশ্নের জবাব নয়।'

'তোমার প্রশ্নের সত্যিকারের জবাব কি আমারই ঠিক জানা আছে? কিন্তু কি জান, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। আমি এরকম না হলেও অনেক কঠিন অবস্থায় এর আগেও বহুবার পড়েছি। কিন্তু কই কিছুই তো হয়নি। আমি ঠিকই বেঁচে আছি।'

'তাতে প্রমাণিত হয় না যে·

'তা অবশ্যই হয় না। কিন্তু আশা করতে আপত্তি কি?'

'আমি জানি তুমি আমাকে প্রবোধ দিচ্ছ।'

'হয়ত নিজেকেই প্রবোধ দিচ্ছি। কিন্তু এসব কথা বাদ দাও এবার। মিছিমিছি মন খারাপ করে লাভ নেই। যা হবার তা হবেই।'

বাইরে দরজার তালায় চাবি ঢোকানোর শব্দ হল। পরমুহূর্তে খুলে গেল দরজাটা। রিভলভার উঁচিয়ে ঢুকল বার্নহাম, তার পিছনে আর একজন। তারও হাতে উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র। বার্নহাম দাঁত বের করে বলল, 'মি. ফগের সময়টা নিশ্চয়ই ভাল কেটেছে।' একটা অশ্লীল ভঙ্গি করল লোকটা।

কুয়াশা কঠিন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

রিভলভার হাতে থাকা সত্ত্বেও সেই দৃষ্টির সামনে ভড়কে গেল বার্নহাম। কিন্তু মুহূর্তেই দুর্বলতা দূর করে রিভলভার দিয়ে ইশারা করল কুয়াশা ও এডিথকে। মুখে বলল, 'চল, চীফ ডাকছে তোমাদের।'

পাঁচ

চল্লিশ পাউণ্ড ওজনের দুটো বোঝা কুয়াশার বুকে আর পিঠে সংযোজন করছিল

কয়েকজন নাবিক। রাবারের লাইন দেওয়া ভারি টুইলের ওভার-অলে ইতিমধ্যেই তার সর্বাঙ্গ পরিবৃত করেছে। ভালকানাইজড রাবার কাফ বাঁধা হচ্ছে কব্জিতে। ষোল পাউণ্ড ওজনের বুট তার পায়ে। তার মতই পোশাক পরিহিত এক নাবিক হেলমেট পরলে বাতাস বেরোবার ঢাকনাটা কিভাবে কাজ করে তা বুঝিয়ে দিচ্ছিল। লোকটার নাম আলফানস।

সে বলল, 'ঢাকনাটার স্ক্রুটা বন্ধ করে দিলে পোশাকটার মধ্যে বাতাস আটকে থাকবে। তাতে আপনি ভেসে থাকতে পারবেন। খুলে রাখলে বাতাস বেরিয়ে যাবে আর আপনি ডুবে যাবেন। নিচে নামবার পর ঢাকনাটা এমনভাবে অ্যাডজাস্ট করবেন, যাতে আপনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারেন। ওজন ব্যালেন্স করার জন্যে বাতাসের পরিমাণ এমনভাবে অ্যাডজাস্ট করতে হবে, যাতে বাতাস আপনাকে ঠেলে উপরের দিকে না তোলে।'

কুয়াশা মাথা নাড়ল।

জো বলল, 'আলফানসকে পাঠাচ্ছি শুধুমাত্র তোমার কাজ তদারক করার জন্যে। যাতে আসল কাজটা তুমি ভুলে না যাও। সে তোমাকে স্ট্রংরুমের পথও চিনিয়ে দেবে। জাহাজের প্ল্যানে তাকে আমি দেখিয়ে দিয়েছি স্ট্রংরুমের অবস্থান। ওর কাছে আণ্ডার ওয়াটার হাইড্রো-অক্সিজেন টর্চও থাকবে।'

কুয়াশা মাথা নাড়ল। কিট খুলে যন্ত্রপাতিগুলো নেড়ে চেড়ে দেখল একবার।

জো বলল, 'যে লোকটাকে তুমি মেরে ফেলেছ, এগুলো তারই হাতিয়ার। ওর জন্যে এইগুলোই যথেষ্ট ছিল। তবে তোমার দরকার হলে আরও যন্ত্রপাতি পাঠিয়ে দেব।'

'এতেই চলবে। তবে আমার কাছে এর চাইতেও ভাল যন্ত্র ছিল।'

'এর চাইতেও ভাল যন্ত্র আছে নাকি?' ব্যঙ্গ করল জো।

'আছে। আল্ট্রাসোনিক্স পদ্ধতিতে তৈরি। আর তুমি জান কিনা জানি না ঐ ধরনের যন্ত্রপাতি পৃথিবীতে শুধু একা আমিই তৈরি করতে জানি।' অব্যর্থ বান নিক্ষেপ করল কুয়াশা।

এই আইডিয়াটা জো'র মাথায় ঢুকিয়ে দেবারই সুযোগ খুঁজছিল সে। জো হয়ত চট করে বিশ্বাস করতে চাইবে না। কিন্তু একটা আশা নিরাশায় সে দুলবেই, প্রলুব্ধ সে হবেই। ইতিমধ্যে সে তার এজেন্টদের মাধ্যমে খোঁজ খবর করবে। ততক্ষণ কুয়াশা নিরুপদ্রবে থাকবে।

এতবড় একটা সুযোগ নিশ্চয়ই জো হারাতে চাইবে না। আর খোঁজ করে যখন জানবে, সে মিথ্যে কথা বলেনি তখন জো'কে বাগে আনা কুয়াশার পক্ষে অত্যন্ত সহজ হবে। অবশ্য জো প্রলোভন জয় করতে যদি পারে তাহলে অন্য কথা।

জো কুয়াশার কথাটা শুনতে পায়নি এমন একটা ভঙ্গি করল।

'আমি টেলিফোনে তোমাদের দুজনের সাথে যোগাযোগ রাখব প্রথম থেকে

শেষ পর্যন্ত। তোমরা কতটা এগোলে তা আমাকে জানাবে। স্ট্রংরুম খোলা হলেই তুমি আলফানসকে হীরাগুলো বের করে আনতে আর বাক্সে ভরতে সাহায্য করবে।' একঘেয়ে নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলে গেল জো। 'বুঝলে নিশ্চয়ই?'

কুয়াশা মাথা নাড়ল।

জো একজন নাবিককে বলল, 'হেলমেট পরিয়ে দাও।'

ভারি হেলমেটটা পরানো হল কুয়াশার মাথায়। তারপর পোশাকটার রিং-এর সাথে এঁটে বসিয়ে অ্যাডজাস্ট করে দেয়া হল। পিছনে অতিরিক্ত স্ক্রু লাগিয়ে দেওয়া হল আকস্মিকভাবে যাতে হেলমেট খুলে না যায় তার জন্যে। প্লেট গ্লাস উইণ্ডো দিয়ে সে দেখল তার সামনে আলফানসের মাথায়ও হেলমেট পরানো হচ্ছে। তার ও আলফানসের পোশাকের সাথে এয়ার পাম্পের টিউব অ্যাডজাস্ট করা হল। তেল ও রবারের গন্ধ ভরা বাতাস তার নাকে ঢুকল এয়ার পাম্প থেকে।

'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

টেলিফোনে জো'র কণ্ঠ শুনতে পেল কুয়াশা। চাল কলের বাঁশির মত শোনাচ্ছে এখন জো'র কণ্ঠস্বর।

'অনায়াসে,' জবাব দিল কুয়াশা।

'এবার রওনা দাও তাহলে।'

কতক্ষণ চলে গেছে কুয়াশা তা বলতে পারে না।

আবছা সবুজ অন্ধকারের মধ্যে সবুজতর কি একটা তার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হল। একটু পরে বুঝতে পারল সেটা জাহাজের মাস্তুল। আস্তে আস্তে পুরো একটা জাহাজের উপরিভাগ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। উপরের ডেকের সাদা রং দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট।

রেলিং টপকে দুজন ডেকের উপরে গিয়ে দাঁড়াল। গিয়ার ভারি হওয়া সত্ত্বেও তার খুব হালকা বলে মনে হচ্ছিল। একটু অস্বাচ্ছন্দ্যও লাগছিল। মনে হচ্ছিল কে যেন তাকে ঠেলে উপরের দিকে তুলে দিচ্ছে।

'ঢাকনার স্ক্রুটা ঢিলে করে দিন।' আলফানসের কণ্ঠ ভেসে এল টেলিফোনে।

কুয়াশা নির্দেশ পালন করল। উর্ধ্বগামী আকর্ষণ একটু কমল বলে মনে হল। তবে বাতাসের চাপটা কমে যাওয়ায় বুকের উপর পানির চাপ বাড়ল। আলফানস তার হেলমেট নেড়ে ঢাকনাটা আর বেশি ঢিলে না করতে ইশারা করল।

পরবর্তী নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল কুয়াশা। সে জানে এখন সে মুক্ত। টেলিফোন আর লাইফ-লাইনের তার কেটে দেবার মত যন্ত্র বার্গলার্স কিটের মধ্যে রয়েছে। তারগুলো কেটে দিয়ে সে এখন দূরে কোথাও গিয়ে ভেসে উঠতে পারে। উপকূল মাত্র দু'মাইল দূরে। কিন্তু তাতে এডিথের জীবন বিপন্ন হবে। তাছাড়া এখন আর জো'র কবল থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টার কোন মানেই হয় না। কুয়াশা জানে, সে অমোঘ অস্ত্র নিক্ষেপ করে এসেছে। আল্ট্রাসোনিক্সের তৈরি

বার্গলার্স কিটের প্রলোভন জো'র মত লোক এড়াতে পারবে না। কুয়াশাকে প্রাণে মারার কথাও তাই এখন তার কল্পনাতীত। সে এখন ছলে বলে কৌশলে কুয়াশার কাছ থেকে তা সংগ্রহ করার চেষ্টা করবে। এবারে জো মেলোড্রামাটিক হুমকি না দেখিয়ে ছাড়বে না। মেলোড্রামাটিক হুমকি—জো'র শব্দচয়ন চমৎকার।

আলফানস বলল, 'আমার পিছনে পিছনে আসুন।'

কুয়াশা আলফানসকে অনুসরণ করল। এখন আর চলতে তার অসুবিধে হচ্ছে না। পিচ্ছিল কর্দমাক্ত প্যাসেজের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে এগোল দুজন।

এ এক অদ্ভুত অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। ছোট ছোট মাছ, কাঁকড়া মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওদের দেখেও যেন ওরা দেখল না। পরমানন্দে ঘুরে বেড়াতে লাগল। একটা মাছ এসে ঠোকর দিল কুয়াশার গ্লাস উইণ্ডোতে। একটা অদ্ভুত দর্শন জীব সড়াৎ করে সরে গেল।

স্ট্রংরূমের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল দুজন। কুয়াশার মনে হচ্ছিল, ওরা যেন আলাদিনের প্রদীপের সেই দৈত্যের মত। জো'র নির্দেশে ওরা তার জন্যে ঐশ্বর্য সংগ্রহ করতে এসেছে সমুদ্রের অতলে।

কুয়াশা উঁচু হয়ে বসে যন্ত্রপাতির ব্যাগটা খুলল। টেলিফোনে জানাল, 'আমি কাজ শুরু করছি।'

জো একটা ডেকচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে সিগারেট টানছিল। তার পাশেই টেবিলের উপর লাউড-স্পীকার। সে কোন জবাব দিল না। পাশের চেয়ারটায় শুকনো মুখে এডিথ বসেছিল। কুয়াশার কণ্ঠ শুনে আশ্বস্ত হল সে। না কুয়াশা মরেনি এখনও।

অনেকগুলো মিনিট কেটে গেল নিঃশব্দে। এডিথ ঘড়ি দেখল, প্রায় বিশ মিনিট কেটে গেছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। দিন শেষের অস্তরাগ সমুদ্রের বুকে আশ্চর্য মনোরম আলো ছড়িয়েছে। অদূরে লাইট হাউজটার দিকে দৃষ্টি পড়ল এডিথের। এখনও আলো জ্বলে ওঠেনি।

এডিথ জানে আজ রাতে আর আলো জ্বলবে না। জো'র দুজন স্যাঙ্গাৎ লাইট হাউজ-ম্যানদের খুন করে এসেছে দুপরে। জো'কে নির্দেশ দিতে শুনেছে সে নিজের কানে। দুজন নাবিককে যেতেও দেখেছে লাইট হাউজের দিকে। মানুষের জীবনের কোন দাম নেই জো'র লোভের কাছে। 'শয়তান' মনে মনে বলল সে।

'স্ট্রংরূম খোলা হয়েছে।' লাউড স্পীকারে কণ্ঠ ভেসে এল।

একটু দূরে একটা চেয়ারে বসেছিল বার্নহাম। সে কথাটা শোনা মাত্র লাফিয়ে উঠল। চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এল জো'র কাছে। জো মুখ ঘুরিয়ে তাকে দেখল। কিছু বলল না।

তার চেহারায় কোন ভাবান্তর নেই। টেলিফোন কানেকশন বক্সের একটা বোতাম ঘুরিয়ে দিল সে। প্রশ্ন করল, 'ঠিক আছে তো, আলফানস?'

'হ্যাঁ। দরজা খোলা হয়েছে। হীরা পাওয়া গেছে। সোনাও আছে। স্ট্রংরুমটা সিঁড়ির পাশেই। সিঁড়ির ঠিক উপরে ছিল একটা কাঁচের গোলাকার গম্বুজের মত। ওটা ভেঙে ফেলা হয়েছে। ওখান দিয়ে থলে নামাতে হবে। তাতেও অনেক সময় লাগবে। কিন্তু আমরা আর কয়েক মিনিটের বেশি এখানে থাকতে পারব না। প্রায় পৌনে একঘন্টা হয়ে গেছে। সমুদ্রের এত নিচে আর বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব নয়। আমি কি একা উঠে আসব?'

চমকে উঠল এডিথ আলফানসোর প্রশ্নে। তার বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা যেন মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেল। একটা হিম-প্রবাহ বয়ে গেল মেরুদণ্ড দিয়ে। জিভ শুকিয়ে গেল। ঠোঁট কাঁপতে লাগল। করুণ মিনতি ভরা দৃষ্টিতে সে জো'র মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে কি এখনই কুয়াশার মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ পাঠ করবে?

জো এডিথের দিকে ফিরে তাকাল না।

কয়েকটা মুহূর্ত পার হয়ে গেল। যেন হাজারটা বছর পার হয়ে গেছে মনে হল এডিথের। হাজার বছরের আতঙ্ক যেন ভয়ঙ্কর মুখ ব্যাদান করে তাকে ঘিরে ধরতে আসছে। বক্ষস্পন্দন ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে এডিথের। তবে কি? তবে কি?

মনে হল যেন বহু দূরে কে যেন বলল, 'বেশ তোমরা উঠে এস।' কপিকলের পাশে তিনজন নাবিক দাঁড়িয়েছিল। জো তাদের উদ্দেশ্যে বলল, "উক, তুমি আর কার্ট তৈরি হয়ে নাও। ওরা উঠে এলেই তোমরা নেমে যাবে। শার্ক, তুমি থলে ওঠাবে নামাবে।'

আরও কিছুক্ষণ ধরে সে নাবিকদের নানারকম নির্দেশ দান করল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে হাই তুলল একবার। তারপর ধীরে সুস্থে গিয়ে দাঁড়াল এয়ার পাম্পের কাছে। নত হয়ে স্পর্শ করল একটা রাবার টিউব।

আর্তনাদ করে উঠল এডিথ। মাথা তুলে তার দিকে তাকাল জো। এডিথ চেয়ার ছেড়ে দুই লাফে এসে দাঁড়াল জো'র পাশে। তার হাতটা চেপে ধরে চিৎকার করে উঠল, 'না! না! এ আমি তোমাকে করতে দেব না।'

'আঃ, এডিথ, কি জ্বালাতন করছ!' নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল জো।

'কুয়াশাকে মেরে ফেলতে কিছুতেই আমি দেব না তোমাকে।'

'কেন। সে তোমার কে?'

'সে আমার—না আমার কেউ নয়। সে কারও কিছু নয়। অথচ সে সকলেরই পরমাত্মীয়। কিন্তু সে তুমি বুঝবে না।'

'আমার বোঝবার প্রয়োজন নেই। হাত ছাড়।'

"না, না। অসম্ভব। আমি জানি কেন সে তোমার ইচ্ছামত সমুদ্রে নেমেছে। শুধু আমাকে বাঁচানোর জন্যে। কিন্তু তার জীবনের বিনিময়ে নিজের জীবন আমি ফিরে চাই না।'

'ওসব ছিচ কাঁদুনে বন্ধ কর।' এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিল জো। পরমুহূর্তে

এডিথ আবার তার হাতটা চেপে ধরল। জো তার স্বভাবসুলভ নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল, 'যদি এমন জ্বালাতন কর তাহলে এখুনি তোমাকে শেষ করে দেব।'

'আমি জানি তা তুমি পারবে না। তুমি আমার কাছে যা চাও তা তুমি পাওনি। যদি ওকে হত্যা কর কোন দিনই তা পাবে না।'

'নিশ্চয়ই পাব আমি। আমি জানি কি করে পেতে হয়।'

'সে তো জবরদস্তি। তা সবাই পারে।'

'তাই যথেষ্ট।'

'কিন্তু আমি স্বেচ্ছায় তোমাকে দিতে পারি।' জো'র চোখে চোখ রাখল এডিথ 'যদি, যদি তুমি ওকে খুন না কর।'

'শুধু এইটুকুই?'

'আর-আর কি দান করতে পারি তোমাকে, বল। যা চাইবে সবই তোমাকে দেব। উজাড় করে দেব।'

'কথা দিচ্ছ?'

মাথা নাড়ল এডিথ।

'কথা দিচ্ছ?' আবার প্রশ্ন করল জো।

'হাজার বার কথা দিচ্ছি।'

'কুয়াশাকে দিয়ে আল্ট্রাসোনিক্সের যন্ত্রপাতি তৈরি করিয়ে দিতে হবে। বল, রাজি আছ?'

স্তম্ভিত হয়ে গেল এডিথ। এতক্ষণ ধরে কি জো শুধু এই কাজটুকু করিয়ে নেবার জন্যে তাকে ভয় দেখাচ্ছে? না সে সত্যি কুয়াশাকে সমুদ্রের তলে শ্বাস রোধ করে হত্যা করতে চায়?' জো'র দিকে ফ্যালফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল এডিথ।

জো বলল, 'শুধু এই একটি মাত্র শর্তে রাজি হতে পারি আমি। না হলে কুয়াশাকে এখুনি মরতে হবে।' নিষ্ঠুর শোনাল জো'র গলা। 'মিথ্যা ভয় আমি দেখাই না। কুয়াশা আমার কথা শুনবে না। মরে গেলেও না। কিন্তু তুমি অনুরোধ করলে সে রাজি হবেই। বুঝতেই পারছ তোমাকে দিয়েই কাজটা আমাকে করাতে হবে। অন্যথায়…।'

জো'র শেষের কথাগুলো এডিথের কানে পৌঁছুল না। সে জানে না, কাজটা সে ন্যায় করছে না অন্যায় করছে। কিন্তু সে জানে সব কিছুর বিনিময়েও যদি সে কুয়াশার জীবন রক্ষা করতে পারে তাহলে তার চেয়ে বড় পুণ্য আর পৃথিবীতে কিছু নেই।

সে মাথা নেড়ে অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'আমি রাজি।'

ছয়

সন্ধ্যা নেমেছে। সমুদ্রের বুক নিকষ কালো।

রেলিং-এর উপর ভর দিয়ে আত্মসমাহিতের মত অন্ধকার সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়েছিল এডিথ।

কিছুক্ষণ আগে কুয়াশা উঠে এসেছে সমুদ্র থেকে। সাতারের পোশাক বদলাবার পর তাকে সশস্ত্র পাহারাধীনে পাঠানো হয়েছে নয় নম্বর রুমে। নরউইচের ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করতে পাঠানো হয়েছে অন্য দুই নাবিককে। ঘন্টাখানেক আগেই নেমে গেছে তারা।

নিজের ভুল বুঝতে দেরি হয়নি এডিথের। জো তার নিজের গরজেই আল্ট্রাসোনিস্মের লোভে কুয়াশাকে রক্ষা করত। চেষ্টা করত কুয়াশার কাছ থেকে আল্ট্রাসোনিক্স সংগ্রহের জন্যে। কুয়াশাকে প্রলোভন দেখাত, হুমকি দিত, হয়ত নিষ্ঠুর অত্যাচারও করত, কিন্তু চট করে তাকে হত্যা করত না। দিনের পর দিন চেষ্টা চালিয়ে যেত। কিন্তু এসব হাঙ্গামার চাইতে সহজ পথ ধরেছে জো। কুয়াশাকে ভয় দেখায়নি, তার বদলে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে এডিথের মনে। তাকে দিয়ে কাজটা করিয়ে নিতে চায় জো কৌশলে।

কুয়াশা এডিথের প্রস্তাবে রাজি হবে এই আশাতেই এই চাল চেলেছে জো। আবার জয় হয়েছে জো'র। হেরে গেছে এডিথ তার শয়তানির কাছে।

অন্ধকারের দিকে দৃষ্টি মেলে এইসব ভাবছিল এডিথ। একটু দূরেই বসে আছে জো ও বার্নহাম। কপিকলের শব্দ আসছে মাঝে মাঝে। লুণ্ঠিত সম্ভার উঠে আসছে নরউইচের স্ট্রংরুম থেকে। কয়েকজন নাবিক বাক্সগুলো নামিয়ে রাখছে ডেকের উপর।

অনেক···অনেকক্ষণ পার হয়ে গেল। লাউডস্পীকার থেকে কণ্ঠ শোনা গেল, 'সব কাজ শেষ। এবার আমরা উঠতে পারি।'

'ভাল করে দেখেছ?' জো প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ।' জবাব এল লাউডস্পীকারে।

'বেশ।' উঠে দাঁড়াল জো। হাত দিয়ে ইশারা করল কপিকলের এঞ্জিনিয়ারকে।

একটু পরে ঘরঘর শব্দ করে আবার চালু হয়ে গেল কপিকল।

জো'র কণ্ঠ শোনা গেল এবার। 'ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে নিশ্চয়ই আমরা সেন্ট মার্টিনে পৌঁছুতে পারব?'

'পৌঁছানো দরকার,' বার্নহাম বলল, 'আতোয়ান হয়ত চলে গেছে সেখানে ইতিমধ্যেই।'

'ঠিক বুঝতে পারছিনে। আতোয়ান তো এখন পর্যন্ত কোন খবর পাঠাল না। আমি একবার খোঁজ নেব এখন। তুমি এদিকটা দেখ।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জো। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল এডিথের পাশে।

'তুমি নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত?' জো প্রশ্ন করল।

মাথা নাড়ল এডিথ, 'তেমন কিছু না। তবে এইভাবে একজায়গায় বেশিক্ষণ থাকতে ভাল লাগছে না, কখন শেষ হবে তোমাদের কাজ?'

'হয়ে গেছে। একটু পরেই ওরা দুজন উঠে আসবে। তারপর আমরা রওনা দেব।'

এডিথ আর কিছু বলল না। আবার মুখ ফেরাল সমুদ্রের দিকে।

'একটু ড্রিংক হলে ভাল হয়, তাই না?'

মাথা নাড়ল এডিথ।

তার হাত ধরল জো, 'এস।'

হুইল হাউজে নিয়ে এল জো এডিথকে। ঘন্টা টিপতেই নিঃশব্দে স্টুয়ার্ড এসে দাঁড়াল। জো নির্দেশ দিল, 'দুটো ম্যানহাটান।' এডিথের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'না কি অন্য কিছু?'

'ওতেই হবে।' জবাব দিল এডিথ।

সিগারেটের প্যাকেট বের করে এডিথের দিকে এগিয়ে দিল জো। এডিথ সিগারেট নিয়ে ধরাল। একটা টান দিয়ে তাকাল জো'র দিকে। দেখল, জো'র চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে অন্য এক দৃষ্টি। সেও চেয়ে আছে এডিথের দিকে। এডিথের বুকের ভিতরটা ধ্বক্ করে উঠল। চূড়ান্ত পরীক্ষার সময় হয়ত এসে গেছে। জো তাকে নিয়ে চরম খেলায় মেতে উঠবে এখুনি। কলঙ্কিত করবে তার বাইশ বছরের পবিত্র যৌবন। দলিত মথিত করবে তার জীবনের অনাঘ্রাত পুষ্প। কেঁপে উঠল সে বারবার।

জো তার হাতে হাত রাখল। সেই সাপের মত ঠাণ্ডা হাতটা। শিরশির করে উঠল এডিথের সর্বাঙ্গ। অসুস্থ বোধ করতে লাগল সে। এখুনি বোধহয় তার বমি হয়ে যাবে। গলা পর্যন্ত কি যেন ঠেলে আসছে।

জো বোধহয় খেয়াল করল না। সে বলল, 'ডার্লিং, তুমি বিশ্রাম নাও। আমি একটু কাজ সেরে নিই। তারপর···কিন্তু···প্রতিশ্রুতি নিশ্চয় মনে আছে?'

বুককেস দুটোর দিকে এগিয়ে গেল জো।

অর্থহীন দৃষ্টি মেলে তার দিকে চেয়ে রইল এডিথ। স্টুয়ার্ড ফিরে এল। এডিথের পাশের টেবিলের উপর ট্রে রাখল। গ্লাস ভরল একটা। তারপর বেরিয়ে গেল। এডিথ গ্লাসটা তুলে নিয়ে চুমুক দিল একবার। তারপর হঠাৎ তার মনে হল এতে হয়ত ওষুধ মেশানো থাকতে পারে। রেখে দিতে যাচ্ছিল সে। কিন্তু হাসি পেল তার। কি আসে যায়?

জো'র দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল এডিথ। সে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বুককেসের সামনে বসেছে। এডিথ দেখল, বুককেসের উপরের তাকগুলো বই পুস্তক সমেত দরজার মত খুলে গেছে। ফোকরের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ রেডিও ট্রান্সমিশন সেট। জো মাথার উপর দিয়ে ইয়ারফোন লাগিয়েছে। তার দীর্ঘ আঙুলগুলো অভ্যস্ত দ্রুততায় ডায়ালের উপর দিয়ে নড়াচড়া করছে। নীরবতা ভেদ করে এডিথের কানে এসে পৌঁছুল জেনারেটরের সোঁ সোঁ শব্দ। একটু পরেই মাঝে মাঝে তার কানে আসতে লাগল স্পষ্ট তীক্ষ্ণ ট্যাপিং-এর আওয়াজ। জো তার বার্তাবাহককে খুঁজে পেয়েছে। বার্তা পাঠাতে শুরু করেছে সে।

এডিথের ইন্দ্রিয়গুলো মুহূর্তের মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠল। একসময় সে মোর্স কোডের ট্রেনিং নিয়েছিল। সঙ্কেতগুলো তার জানা আছে। ডট আর ড্যাশের অর্থ কি সে জানে। জো যে বার্তা পাঠাচ্ছে এডিথ একটু চেষ্টা করলেই তা ডিসাইফার করতে পারে। কান খাড়া করল এডিথ।

ডট-ডট-ড্যাশ-ডট...ডট-ডট ড্যাশ...ড্যাশ-ডট-ড্যাশ-ডট। স্মৃতির পাতা হাতড়ে দেখল এডিথ। মনে হচ্ছে এ সঙ্কেত তো আসছে চেরবুগের রেডিও স্টেশন থেকে। জো নিজের স্টেশনের সিগন্যাল দিচ্ছে এবার এবং পেশাদার অপারেটরের মত অভ্যস্ত ভঙ্গিতে বার্তা পাঠাচ্ছে। একটা তারবার্তাঃ 'মার্কুইস জোনস ও হার্কভিল, রাত দশটায় পৌঁছুচ্ছি।'

এ নামের কোন অর্থ নেই এডিথের কাছে। বার্তাটাও তার কাছে গুরুত্বহীন। হার্কভিলে সম্ভবত জো'র কোন আড্ডা আছে। রাত দশটায় সেখানে পৌঁছুতে হবে। এখন বাজে সাড়ে সাতটা। কিন্তু এডিথের মাথায় তখন অন্য একটা সম্ভাবনা উঁকি দিয়েছে। যদি...যদি...যদি সে মাত্র একবার সুযোগ পায় তাহলে সে যে কোন ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফ রিসিভিং স্টেশনের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। হ্যাঁ, যদি সে সত্যি একবার সুযোগ পায় তাহলে উইট দ্বীপে নিল্টস স্টেশনে মেসেজ পাঠাতে পারবে। সেটা নিশ্চয়ই এই স্টেশনের রেঞ্জের মধ্যে পড়বে। সেখান থেকে দিনার্দ বন্দরে টেলিগ্রাম পৌঁছুবে সহজেই। মেসেজ গ্রহণ না করারও কোন কারণ নেই। অন্যান্য আটলান্টিক লাইনারের মত রোজমেরীও রেজিস্টার্ড ট্রান্সমিটারের তালিকাভুক্ত। জো যে সিগন্যাল দিয়ে নিজের পরিচয় দিয়েছে তা মনে আছে এডিথের। অনন্তকাল ধরে মনে থাকবে। মনে মনে সিগন্যালটা আওড়াল। মাত্র পাঁচ মিনিট সময় পেলেই...। যে চেয়ারে জো বসে আছে, মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য সেখানে সে বসতে পারলেই...। কিন্তু সে সুযোগ কি আসবে? চঞ্চলতা বেড়ে গেল এডিথের।

জো'র বার্তা প্রেরণ সমাপ্ত হয়েছে। সে হেড-ফোন খুলে রেখে মেইন সুইচ অফ করে দিল। যে বাতিটায় ডায়াল আলোকিত ছিল সেটা নিভিয়ে দিল। বুকশেলফের দরজাটা বন্ধ করে দিল। ক্লিক করে শব্দ হল একটা। চেয়ার ছেড়ে

দাঁড়াল জো। এগিয়ে এল এডিথের দিকে।

'তোমার এখানে যে এতসুন্দর বন্দোবস্ত আছে তা কখনই ভাবিনি আমি।' জো যাতে তার চাঞ্চল্য বুঝতে না পারে তার জন্যে আবেগহীন কণ্ঠে বলবার চেষ্টা করল এডিথ। জো তার চাঞ্চল্য অনুধাবন করল কিনা বুঝতে পারল না হয়ত বুঝতে পেরেছে। কিন্তু কোন কিছুতে পরোয়া করে না সে।

জো শ্রাগ করল, বলল, 'এটা অনেক কাজে লাগে। এই তো এখুনি জানিয়ে দিলাম যে আমরা এখন রওনা হচ্ছি।'

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলবার চেষ্টা করল এডিথ।

'হার্কভিল—জায়গাটা হচ্ছে কাপ ডিলা হেগের দক্ষিণে ও আনস ডি ডভাইলের উত্তর প্রান্তে। জায়গাটা প্রমোদ নিবাস নয় মোটেও। আর সেটাই আমার পক্ষে সুবিধাজনক। সেখানে আমার একটা বাসভবন আছে। ইচ্ছে করলে তুমি আগামীকালের পর সেখানে গিয়ে থাকতে পার। জায়গাটা আমার মনে হয় পছন্দ হবে তোমার।'

'সেখানেই কি কুয়াশাকে নামিয়ে দেবে?'

দাঁত দিয়ে উপরের ঠোঁট কামড়াল জো। বলল, 'কোন আপত্তি নেই, যদি সে আমাকে আল্ট্রাসোনিক্স ইন্সট্রুমেন্ট দেয়।'

'ওটা ছাড়া তুমি তাকে ছাড়বে না?'

'সে প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া তুমি কথা দিয়েছ। অন্যথায় ইতিমধ্যেই তার কি দশা ঘটত তা তুমি জান।'

'ভুল হয়েছিল আমার।'

'কিসের ভুল?'

'তখন বুঝতে পারিনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আমি কথা না দিলেও তুমি নিজের গরজেই কুয়াশাকে বাঁচাতে।'

'তুমি যে বুদ্ধিমতী, আতে সন্দেহ নেই।' জো ব্যঙ্গ করল, 'কিন্তু কথা যখন দিয়েছ…। তাছাড়া এটা তো ভাল করেই জান যে কুয়াশার মত শত্রুকে বাঁচিয়ে রাখাটাও আত্মহত্যা করার সামিল। আমি যে কত বড় ঝুঁকি নিচ্ছি তা নিশ্চয় বুঝতে পারছ। কিন্তু কিসের জন্যে। শুধু কি তোমার জন্যে? আল্ট্রাসোনিক্স এক আশ্চর্য ম্যাজিক। ওটা অনেকটা আলাদিনের প্রদীপের মত। ইউরোপের অনেক ইঞ্জিনিয়ার চেষ্টা করেও শব্দভেদী যে শক্তিকে বশে আনতে পারেনি, কুয়াশা তা পেরেছে। আর সেটা আমার চাই।' উত্তেজনাহীন একঘেয়ে সুরে বলে গেল জো।

এডিথের গ্লাস শূন্য হয়েছিল। গ্লাসটা সে রেখে দিল। মাথাটা একটু ঘুরিয়ে জানালার দিকে তাকাল। জো'র ভাবলেশহীন মুখটা সে আর সহ্য করতে পারছিল না। তার মনের মধ্যে সব কিছু ছাড়িয়ে শুধু একটা ইচ্ছেই ঘুরপাক খাচ্ছে। মাত্র একবার সুযোগ চায় সে। মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্যে বসতে চায় ট্রান্সমিশন সেটটার

সামনে। দিনার্দ বন্দরে কামাল আছে, আছেন ইন্সপেক্টর শার্লস। তার কাছে গোপনে খবর পাঠিয়ে দিয়ে এসেছে সে একটা চিঠিতে। চিঠি নিশ্চয় পেয়েছেন ইন্সপেক্টর। হয়ত তৈরি হয়েই আছেন। কিন্তু রোজমেরীর হদিস তিনি জানবেন কি করে? একবার তাঁকে মেসেজ পাঠাতে পারলেই···। মনের মধ্যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে এডিথের। সুযোগ কি আসবে?

জো তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। হয়ত তার মনের খবর জানবার চেষ্টা করছে। সে কি বুঝল এডিথ জানে না।

একটু পরে জো'র কণ্ঠ কানে এল এডিথের। 'আরও একটা অসুবিধা আছে কুয়াশার ব্যাপারটা ফয়সালা করার। বুঝতেই পারছ এইসব মাল জাহাজে বেশিক্ষণ রাখা সমীচীন নয়। ব্যাংক আমার প্রিয় হতে পারে না। তাও নিশ্চয়ই বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না তোমার। তাছাড়া ওরা মাল তুলতে সময় নেয় অনেক। সুতরাং আমি নিজেই আমার নিজস্ব ব্যাংক গড়ে তুলেছি। হার্কভিলের কাছে সমুদ্রের নিচে তিরিশ ফুট পানির তলে গড়ে তুলেছি আমার রত্নভাণ্ডার।

'নির্দিষ্ট স্থানটা জানা না থাকলে কারও সাধ্য নেই সেই ভাণ্ডারের সন্ধান পাবার। উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ছাড়াও কেউ তা তুলতেও পারবে। সাধারণ চোরের তো প্রশ্নই ওঠে না। সে এক বিশাল ভাণ্ডার। কোটি কোটি টাকার ধনরত্ন আছে তাতে।'

একটু থামল জো। সিগারেট ধরাল। তারপর আবার শুরু হল সেই একঘেয়ে কর্কশ কণ্ঠের বক্তৃতা। 'আমি নিজেও ঠিক জানি না কত টাকার ধনরত্ন আছে। অবশ্য ওখান থেকে ওগুলো কিছুদিন পরে সরিয়ে ফেলব এমন এক জায়গায়, যেখানে আমি নির্বিঘ্নে ভোগ করতে পারব সেই বিপুল ঐশ্বর্য। আর তার অংশীদার হবে তুমি। আজ রাতে আমরা যাচ্ছি সেই ভাণ্ডারের কাছে। নরউইচ জাহাজ থেকে তোলা হীরা আর সোনা ওখানে নামিয়ে রাখতে হবে আজ রাতেই। কিন্তু কুয়াশা যাতে আমার এই ঐশ্বর্যের সন্ধান না পায় তার ব্যবস্থা আমাকে অবশ্যই করতে হবে।' আবার থামল জো। 'তুমি নিশ্চয়ই রাজি আছ আমার প্রস্তাবে?' সিগারেটে আর একটা টান দিয়ে বলল জো।

'আমি···আমি। আমার কথা নতুন আর কি শুনবে বল?' হাসবার চেষ্টা করল এডিথ।

জো এগিয়ে গেল এডিথের দিকে। তার হাত স্পর্শ করল এডিথের কাঁধ। জড়িয়ে ধরল জো এডিথের গলা। আর এডিথের মনে হল যেন একটা সাপ তার দেহের উপর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। দুহাত দিয়ে জো এডিথকে টেনে তুলল। চোখ বন্ধ করল এডিথ। সে যেন ভয়ঙ্কর এক দুঃস্বপ্ন দেখছে। জো'র গালে চড় কষার প্রবল একটা ইচ্ছা দমন করল এডিথ।

জো'র মুখটা এডিথের মুখের কাছে এসে গেছে। তার পাথরের মত কালো দুটো চোখে আগুন জ্বলছে। জো'র মুখটা আরও এগিয়ে এল। প্রচণ্ড ঘৃণায় মুখটা বেঁকে গেল এডিথের।

একটু পরেই জো তাকে ছেড়ে দিয়ে চেয়ারে বসিয়ে দিল। একবার তার অচেতন-প্রায় বিবর্ণ মুখের দিকে তাকাল। তারপর ঘন্টা পিটল।

স্টুয়ার্ড এসে দাঁড়াতেই জো বলল, 'আধঘন্টার মধ্যে ডিনার খাব আমরা। আজকের মেনু কি?'

'স্মোকড স্যামন, ল্যাংগুস্টাইন গ্র্যাণ্ড ডক, সুপ্রীম ডি ভলেইল বার্গরেট ফ্রিসেজ মিমোসা।' আউড়ে গেল স্টুয়ার্ড।

'বাহ্! চমৎকার হবে।'

স্টুয়ার্ড মাথাটা সামান্য নুইয়ে চলে যাচ্ছিল। জো বলল, 'আমাদের জন্যে এক বোতল সেঁটু ল্যাফে ১৯০৬-এর ব্যবস্থা করবে।'

'জ্বি, স্যার।' বেরিয়ে গেল লোকটা।

জো'ও বেরিয়ে গেল একটু পরে। যাবার সময় এডিথের গালটা টিপে দিল।

সাত

বাংকের উপর শুয়ে কাটাল কুয়াশা সারাটা সন্ধ্যা। কপিকলের শব্দটা মন্দ লাগছিল না। মাঝখানে একবার ঘুমিয়ে নিল কিছুক্ষণের জন্যে। শরীরটা এখন বেশ তাজা লাগছে। বেশ খুশিও লাগছে তার। জো তাহলে তার ফাঁদে পা দিয়েছে।

কপিকলের আর্তনাদ একসময় শেষ হয়ে গেল। ইয়ট এখন চলতে শুরু করেছে কোন্ দিকে কে জানে। পোর্টহোলের ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। আদিগন্ত অন্ধকার। কোথাও আলোর রেশ নেই। কোথায় যাচ্ছে রোজমেরী কুয়াশা জানে না। কিন্তু তার ইনটুইনশন বলছিল এখন জাহাজ যাচ্ছে উপকূলের দিকে। দিনার্দ বন্দরের দিকে অবশ্য নয়।

রাত আটটার দিকে তিনজন নাবিক এল। একজনের হাতে ট্রে। তাতে খাবার আর এক গ্লাস মদ। অন্য দুজনের হাতে রিভলভার। আধঘন্টা পরে তারা আবার ফিরে এল। ট্রেটা নিয়ে গেল। কুয়াশা সিগারেট ধরাতে ধরাতে শুনল দরজার তালায় চাবি দেবার শব্দ। আরও এক ঘন্টা সে বাংকের উপর শুয়ে রইল। সিগারেট টানল একের পর এক। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল সারাটা কক্ষ।

তারপর উঠে দাঁড়াল কুয়াশা। হাই তুলল একবার। আড়মোড়া ভাঙল। পকেটে হাত দিয়ে বের করল ছোট একটা হাতিয়ার। ভাগ্য তার হাতে তুলে দিয়েছে সামান্য এই হাতিয়ারটা। অথচ কুয়াশা জানে এখন এটা অসামান্য অস্ত্র। নরউইচের স্ট্রংরূম খোলার জন্যে জো যে বার্গলার্স কিট তাকে দিয়েছিল তার ভিতর

থেকে যন্ত্রটা সে সরিয়েছে।

কুয়াশার নিঃশব্দ বৈজ্ঞানিক আক্রমণে দরজার তালাটা মাত্র দু'মিনিটের মধ্যেই আত্মসমর্পণ করল। তালাটা মজবুত সন্দেহ নেই। বিশ্বস্তও বটে। মেকানিজম সত্যি ভাল। কিন্তু কুয়াশার হাতে যে যন্ত্রটা ছিল তার কাছে ঐ তালা কিছুই নয়।

যন্ত্রটা আবার পকেটে ভরল কুয়াশা। জো'র প্রথম এবং একমাত্র নির্বুদ্ধিতার পরিচয় তার পকেটেই থাক। জয়-পরাজয়ের নিয়ামক হিসেবেও অস্ত্রটার একটা ঐতিহাসিক মূল্য অবশ্যই থাকবে। স্ট্রংরুম খোলবার জন্য তাকে সমুদ্রের তলে পাঠিয়ে জো'ই তাকে বার্গলার্স কিট থেকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রটা বেছে নেবার সুযোগ দিয়েছে। জীবন্ত অবস্থায় উপরে উঠতে দিয়ে তাকে যন্ত্রটা ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছে। বাকি কাজটুকু কুয়াশা নিজেই সম্পন্ন করতে পারবে।

দরজার হাতলটা আস্তে আস্তে ঘোরাল কুয়াশা। নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা। মুখ বের করল খোলা দরজা দিয়ে। সামনে আরও একটা দরজা। এপাশে ওপাশে আরও কয়েকটা দরজা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সবগুলোই বন্ধ। ডাইনে-বাঁয়ে দেখল কুয়াশা। না কেউ নেই। সবাই হয়ত খেতে গেছে অথবা সারাদিনের খাটুনির পর ডেকে আড্ডা দিচ্ছে।

বেরিয়ে এল কুয়াশা। দরজাটা ভেজিয়ে দিল। নিঃশব্দে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই একটা অন্ধকার কোণ পাওয়া গেল। সেখানে দাঁড়াল কুয়াশা।

এতক্ষণ কেবিনে গুমোট অবস্থায় থাকবার পর ঠাণ্ডা হাওয়া যেন প্রীতির পরশ বুলিয়ে দিল তার চোখে-মুখে। উপরে আকাশটা কালো। মেঘ জমেছে। মাত্র একটা তারা চোখে পড়ল তার।

রোজমেরী বোধহয় দিক পরিবর্তন করল। কুয়াশা দেখল, দূরে—অনেক দূরে আলোর রেখা। একটু পরে একটা আলো স্পষ্টতর হল। ছোট একটা জাহাজের সার্চ লাইট। তাহলে কোন বন্দরের দিকে, অন্তত উপকূলের দিকেই এগোচ্ছে রোজমেরী।

যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল কুয়াশা সেখান থেকে উপরের পোর্ট ডক দেখা যায়। জায়গাটা এখন জনশূন্য। তবে এয়ার পাম্প ও টেলিফোনের যন্ত্রপাতি পড়ে আছে এখনও। চারটে ডাইভিং স্যুটও চোখে পড়ল তার। হেলমেটগুলোও আছে। আর আছে অনেকগুলো কাঠের বাক্স। ওতেই বোধহয় নরউইচের লুণ্ঠিত ধনসম্পদ ভরা হয়। আর একটু দূরে হুইল হাউজের জানালা দিয়ে আলো বেরিয়ে এসে ডেকটাকে আলো ও আঁধারে বিভক্ত করে ফেলেছে। ওখানে এখন যাওয়া উচিত হবে না। বিশ্রামরত কোন নাবিকের চোখে পড়া বিচিত্র নয়।

সবচেয়ে ভাল হয় যদি সে কোনভাবে একবার ডেক হাউজের ছাদে উঠতে পারে। সিঁড়ির দিকে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল কুয়াশা। মিনিটখানেক পরে সে হুইল হাউজের ছাদের উপর গিয়ে শুয়ে পড়ল। আকাশটা কি নিকষ কালো। এডিথ

এখন কি ক ছে কে জানে? একটা সিগারেট ধরালে কেমন হয়? অতটা ঝুঁকি নেওয়া কি উচিত হবে?

সম্মুখের দিকে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত আলো দেখা যাচ্ছে। জাহাজটা ফুল-স্পীডে এগিয়ে চলেছে। আলোর সংখ্যা একটা দুটো করে বাড়ছে। গতিশীল আলো দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো। ওগুলো জাহাজের আলো। অন্ধকারের মধ্যে অস্পষ্ট পাহাড়ী উপকূল চোখে পড়ল কুয়াশার। জায়গাটা সে ঠিক চিনতে পারল না। কিন্তু জাহাজের গতিবেগ সম্পর্কে যেটুকু সে শুনেছিল তাতে মনে হল ওটা ফ্রান্সের উপকূল। সম্ভবত কাপ ডি লা হেগের দক্ষিণের কোন পাহাড়ী উপকূলের দিকে এগোচ্ছে রোজমেরী।

'আরও একটু কফি, এডিথ।' হঠাৎ কানে এল জো'র ধাতব কণ্ঠস্বর। নিঃশ্বাস বন্ধ করে নিঃশব্দে ছাদের প্রান্তে চলে গেল কুয়াশা। একটা জানালা খোলা রয়েছে। মাথাটা একটু নিচু করে উঁকি দিল সে। যদি কিছু দেখা যায়। হ্যাঁ, ভিতরটা দেখা যাচ্ছে। কয়েক সেকেণ্ড দেখল সে। তিনজন খেতে বসেছে—জো, বার্নহাম, এডিথ। মুহূর্তের জন্যে এডিথের মুখটা চোখে পড়েছিল কুয়াশার। ভাবলেশহীন মুখ। চতুর্থ লোকটা রয়েছে হুইলে। তার দৃষ্টি সম্মুখের দিকে নিবদ্ধ। মাঝেমাঝে তার হাতটা চলছে। কিন্তু দেহটা স্থির।

কান পেতে ওদের কথাবার্তা শোনবার চেষ্টা করল কুয়াশা। টুকরো টুকরো কথা কানে এল তার। তাতে মনে হল, রোজমেরী এখন চলছে জো'র নিকটবর্তী কোন আড্ডায়। সেটাই স্বাভাবিক। ডেকের উপর যে বিপুল ঐশ্বর্য রয়েছে সেগুলো নিশ্চয়ই আজ রাতেই সরিয়ে ফেলা হবে। কোন গোপন স্থানে। আর তার জন্য জো নিশ্চয়ই সাধারণ কোন বন্দরে যাবে না। সমুদ্রের তীরে কোথাও সম্ভবত তার কোন গোপন ধনাগার আছে, সেখানেই রাখা হবে হীরা আর সোনা ভর্তি বাক্সগুলো। আর কাজটা হবে রাতে—দিনের আলোয় নয়। হয়ত আজ রাতেই। কিন্তু জো'র পরিকল্পনা জানতে না পারলে তার নিজের পক্ষে কোন পরিকল্পনা করা সম্ভব হচ্ছে না। এই শত্রুপুরীতে হঠাৎ করে কিছু করে বসাটাও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তাকে সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

'স্যার, আলো।'

নতুন একটা কণ্ঠ শোনা গেল। কুয়াশার চিন্তার গ্রন্থিটা ছিঁড়ে গেল সেই কণ্ঠস্বরে। সম্ভবত হেলমস্-ম্যান কথা বলছে। আবার উঁকি দিল কুয়াশা হুইল হাউজের মধ্যে। জো চেয়ার ছেড়ে উঠে গেছে হুইলের দিকে। বার্নহাম তখনও খাচ্ছে। এডিথের হাতে সিগারেট। তার দৃষ্টিও সামনের দিকে।

কুয়াশাও মুখ তুলে সামনের দিকে তাকাল। একদম উপকূলের কাছে এসে পড়েছে রোজমেরী। দুটো আলো দেখা যাচ্ছে। অতি উজ্জ্বল দুটো আলো। একটা লাল আর একটা হলুদ।

সম্ভবত স্থান নির্ণয় ও পথের নির্দেশ দানের জন্য জো'র স্যাঙাৎরা সিগনাল দিচ্ছে।

হুইল হাউজ থেকে আবার জো'র নিরুত্তাপ গলার আওয়াজ শোনা গেল, 'মাই ডিয়ার, তোমাকে একবার নিচে যেতে হবে। মাটি দেখে উৎসাহিত হয়ে তুমি যদি পালিয়ে যাবার জন্য সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড় তাহলে আমাকে অসুবিধায় পড়তে হবে।'

হাসবার চেষ্টা করল বোধহয় এডিথ। কিন্তু হাসি ফুটল না। বলল, 'বেশ তো, কোথায় যেতে হবে বল। নিশ্চয়ই নয় নম্বর কেবিনে?'

'না। সেখানে বসে কুয়াশা আর তুমি ক্ষতিকর পরামর্শ করতে পার। আপাতত নিজের কেবিনে যেতে হবে তোমার। যতক্ষণ দরকার হবে তার বেশি আটকে রাখা হবে না।'

এডিথ বেরিয়ে গেল। দরজার কাছেই স্টুয়ার্ড দাঁড়িয়েছিল। সে চলল এডিথের পেছনে পেছনে।

উঠতে যাচ্ছিল কুয়াশা। তার নিজের যাই হোক, এডিথের বন্দীত্ব যেমন করেই হোক মোচন করতে হবে। কিন্তু পরমুহূর্তেই বুঝল সেটা সম্ভব নয়। এডিথের কেবিনই তো সে চেনে না। খুঁজতে গিয়ে যদি অন্য কোন কেবিনে ঢুকে পড়ে আর তার বাসিন্দা যদি তাকে দেখে ফেলে অথবা খোঁজ করার সময়ই যদি সে কোন নাবিকের চোখে পড়ে যায় তাহলে যে সুযোগ এসেছে সেটাও বরবাদ হয়ে যাবে। সুতরাং তাকে অপেক্ষা করতে হবে উপযুক্ত মুহূর্তটার জন্য।

'আজ রাতেই কি সোনা নামাবে?' প্রশ্ন করল বার্নহাম।

কুয়াশা নিঃশ্বাস বন্ধ করে জবাবটার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

'হ্যাঁ, আজ রাতেই।' শোনা গেল জো'র জবাব। 'এই কুয়াশা লোকটা যে কতটা ভয়ঙ্কর তা বোধহয় জান না। সে তার বন্ধুদের কি জানিয়ে দিয়ে এসেছে কে জানে? দুনিয়ার তাবৎ গোয়েন্দাদের চাইতেও মারাত্মক সে। ওকে উপেক্ষা করলে ক্ষতি বই লাভ হবার সম্ভাবনা নেই। সুখের বিষয়, আগামীতে অনেকদিন আমাদের কোন প্রোগ্রাম নেই। রোজমেরী ডুবিয়ে দিতে হয়ত খারাপ লাগবে কিন্তু সেটা নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে না। আমরা ট্রলারে করে সোনা তুলতে পারব। আর বিক্রির ব্যবস্থা, কার্ল, তোমাকেই করতে হবে।'

'সে ব্যবস্থা তো হয়েই আছে। আতোয়ান হয়ত খদ্দের নিয়ে ইতিমধ্যেই এসে গেছে।'

'তাহলে অবশ্য দুশ্চিন্তার কারণ নেই।'

'কিন্তু এই লোকটাকে বাঁচিয়ে রাখছ কেন?'

'প্রয়োজনের চেয়ে এক মুহূর্ত বেশি তাকে বাঁচিয়ে রাখব না।'

জো'র কণ্ঠ আসছিল হুইল হাউজের সামনের দিক থেকে। কুয়াশা আবার উঁকি দিল কেবিনের মধ্যে। জো নিজে হুইল চালনা করছে। পাশে দাঁড়িয়ে আছে

হেলমস-ম্যান। জো থ্রটল লিভারটাকে ধাক্কা দিল, আর এঞ্জিনের শব্দটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। সার্চ-লাইটটাও নিভে গেল।

সামনের দিকে মুখ তুলে কুয়াশা দেখল রোজমেরী উপকূলের একেবারে কাছে এসে গেছে। পাহাড়ী খাদগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। খাদের উপর ঢেউ ভেঙে পড়ার শব্দ আসছে কানে। সাদা ফেনা দেখা যাচ্ছে তীরে। আরও কাছে একটা আলো দেখা দিল পানির উপর। আলোটা ক্রমেই এগিয়ে আসছে। কুয়াশা দেখল একটা স্পীড বোট এগিয়ে আসছে। রোজমেরীর দিকে। আরও এগিয়ে আসতেই দেখা গেল বোটে দুজন লোক।

হেলমস-ম্যান হুইল হাউজের দরজা খুলে রেলিং-এর দিকে এগিয়ে গেল। বোটটা এসে থামল ইয়টের পাশে। দড়ি ছুঁড়ে দিল একজন হেলমস-ম্যানের দিকে। দড়িটা শূন্যের উপরেই ধরে বাঁধল সে একটা হুকে।

বোটের আরোহী দুজন উঠে এল। একজনকে দেখে চমকে উঠল কুয়াশা। লোকটা আর কেউ নয় আতোয়ান।

হুইল হাউজের দরজায় দাঁড়িয়েছিল জো। সে আগন্তুকদের অভ্যর্থনা জানাল, 'এস, এস। খবর ভালতো?'

'হ্যাঁ, সব কিছু ঠিক আছে।'

হেলমস-ম্যানের দিকে ফিরল জো, 'তুমি এবার যেতে পার বিশ্রাম করতে।'

হেলমস-ম্যান চলে গেল।

আতোয়ানের সঙ্গী ঢুকল হুইল হাউজে। আতোয়ান বলল, 'আমাকে একটু মাফ করতে হবে কয়েক মিনিটের জন্যে।'

'অল-রাইট।' জো বলল।

আতোয়ান চলে যাচ্ছিল। জো আবার তাকে ডাকল। আতোয়ান ফিরে দাঁড়াতেই জো তাকে বলল, 'তুমি আলফানসকে বলে দিয়ে যাও, আমি আর সে এখুনি নিচে নামব। সে যেন সাঁতারের পোশাক পরে নেয়। আর আমারটাও তৈরি রাখতে বলবে। আমি কয়েক মিনিটের মধ্যেই আসছি। মিনিট পনের মধ্যেই নামব আমরা।'

'তথাস্তু।' চলে গেল আতোয়ান।

কুয়াশা পায়ের বুড়ো আঙুলের উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। নিঃশব্দে অথচ অতি দ্রুত সে নেমে এল হুইল হাউজের ছাদ থেকে। সিঁড়ির কাছে অন্ধকারে দাঁড়াল কুয়াশা। আতোয়ান কোন্ দিকে গেছে সে জানে না। তবে ইয়টের অধিকাংশ লোকই এই সিঁড়িটা ব্যবহার করে। ভাগ্য ভাল থাকলে এখানেই দেখা মিলবে তার সাথে। মিললও। ক্লান্ত পদক্ষেপে আতোয়ান এগোচ্ছিল সিঁড়ির দিকে। চেহারাটা বিষণ্ণ। তাতে দুর্ভাবনার ছাপটা স্পষ্ট।

চারদিকে একবার জরিপ করল কুয়াশা। কেউ নেই আতোয়ান ছাড়া।

অন্ধকার কোণ থেকে বেরিয়ে এল কুয়াশা। ছায়াটা পড়ল আতোয়ানের চোখে। ছায়ার মালিকের দিকে তাকাতেই কুয়াশার বিশাল দেহটা চোখে পড়ল। চমকে উঠল আতোয়ান। সে বোধহয় বিস্ময়সূচক শব্দ উচ্চারণ করতে যাচ্ছিল। অতিকষ্টে চেপে গেল। বিস্ময় মিলিয়ে যেতেই চারদিকে একবার চেয়ে দেখল। আশ্বস্ত হল। না, কেউ নেই। কিন্তু সে জানে যে-কোন মুহূর্তে লোক এসে যেতে পারে। সুতরাং সাবধান হতে হবে।

অন্ধকার কোণে ফিরে এল কুয়াশা। আতোয়ানকে হাত তুলে তার দিকে এগিয়ে যাবার জন্য ইশারা করল। সাবধানী পদক্ষেপে এগিয়ে গেল আতোয়ান কুয়াশার দিকে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আতোয়ানের বিষণ্ণতা দূর হয়ে গেছে। তাকে একটু যেন উত্তেজিত বলে মনে হল কুয়াশার। যেন কি একটা আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সে।

'খবর কি?' আতোয়ান জিজ্ঞেস করল। 'এখনও বেঁচে আছেন তাহলে?'

'আরও অনেকদিন বাঁচব বলে মনে হচ্ছে,' কুয়াশা ফিস ফিস করে জবাব দিল।

'ওরা এসেছেন। মানে মি. আহমদ আর মি. শহীদ খান এসেছেন। কাছাকাছি অন্ধকারে এক পাহাড়ী খাঁদে লুকিয়ে আছেন। আলো দেখিয়ে সিগন্যাল দিলেই চলে আসবেন।'

ওসব শোনবার ধৈর্য কুয়াশার ছিল না। সে বলল, সে যা হয় পরে সময় বুঝে করবেন। আপাতত একটা পিস্তল চাই। এই মুহূর্তে...।'

আতোয়ান তার হিপ-পকেট থেকে একটা অটোমেটিক বের করে দিল।

কুয়াশা বলল, 'শুনুন, এখন যা বলব তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেভাবেই হোক কাজটা করতে হবে। আমাকে নিয়ে যেতে হবে আপনার সাথে আলফানসের কাছে। তাকে বলতে হবে জো'র সাথে আমি নিচে নামব।'

কুয়াশার প্রস্তাবটা বোধহয় মনঃপূত হল না আতোয়ানের। সে আমতা আমতা করে বলল, 'সেটা কি ঠিক হবে? জো টের পেলে...।'

'সে ঝুঁকি তো নিতেই হবে।' গম্ভীর গলায় বলল কুয়াশা। 'আপনি চলুন। এর চাইতে ভাল আইডিয়া আমার জানা নেই।'

কুয়াশার কণ্ঠের দৃঢ়তায় আতোয়ান আপত্তি করার পথ পেল না। সে বলল, 'চলুন।'

কুয়াশা যেতে যেতে তার প্ল্যানটা ভাল করে বুঝিয়ে দিল আতোয়ানকে। শেষে যোগ করল, 'কিছুটা ঝুঁকি আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটুকু তো নিতেই হবে। ইয়ট এখন সমুদ্রের উপকূলে আছে। এখান থেকে নির্বিঘ্নে পালিয়ে যাওয়া সহজ। একটু চেষ্টা করলে এডিথকে নিয়েও পালিয়ে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু পালিয়ে আমি যেতে পারি না। জীবনে কখনও হার মানিনি। পরাজয় শব্দটা আমার

অভিধানে নেই। বরং মৃত্যুকে বরণ করব সে-ও ভাল।'

কুয়াশার কণ্ঠস্বরে এমন একটা সহজ ঋজুতা ও আন্তরিকতা ছিল যা আতোয়ানকে মুগ্ধ করল। কিন্তু কিছু বলল না। নীরবে এগোতে লাগল।

কুয়াশা বলল, 'দেখবেন কাজটা যেন পুরোটাই প্ল্যানমত হয়। শুধু এঞ্জিনিয়ার, তার সহকারী আর ড্রেসার ছাড়া আর কেউ যেন পোর্ট ডেকে না যেতে পারে। আলফানসকে যেভাবে হোক লোয়ার ডেকে রাখতে হবে। আসলে এর উপরই নির্ভর করছে আমার পরিকল্পনার সাফল্য।'

আট

পরিকল্পনাটা স্থির করতে কুয়াশার ব্যয় হয়েছে কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। জো'র লুণ্ঠিত ঐশ্বর্য ডেকের উপর পড়ে থাকায় কুয়াশা ধরেই নিয়েছিল আজ রাতেই সেগুলো সরিয়ে ফেলা হবে এবং খুব সম্ভব কোন গোপন ধনাগারেই তা রেখে দেবে। একরাতে এই বিপুল ঐশ্বর্য বিক্রি করা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি ঘটতে যাচ্ছে কুয়াশা বুঝতে পারেনি। হঠাৎ জো তার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করায় কুয়াশা তার পরিকল্পনা স্থির করার সুযোগ পেয়েছে।

'সমুদ্রের নিচে আছে জো'র গোপন ভাণ্ডার। জো'র কাজের মধ্যে মৌলিকতা আছে সন্দেহ নেই। জো আজ রাতে সেখানে নামবে। নরউইচ থেকে লুটে আনা ঐশ্বর্য সে রেখে আসবে সমুদ্র তলের সেই ধনাগারে।

কুয়াশাও যাবে সেখানে আলফানসের বদলে। যেমন করে হোক যেতেই হবে। দেখে আসবে জো'র গোপন ভাণ্ডার। আর সেই সমুদ্র গর্ভে, তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা যেখানে নেই, সেখানেই নির্ধারণ হবে জয়-পরাজয়।

নয় নম্বর কেবিন অতিক্রম করে বন্ধ একটা কেবিনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল দুজন। টোকা দিতেই দরজা খুলে দিল কে একজন ভিতর থেকে। তিনজন বসে বসে সিগারেট টানছিল। আলফানস আর ড্রেসার দুজন। ওদের দেখে আলফানস ও তার সঙ্গীরা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

কুয়াশা নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল আতোয়ানের পিছনে। তার ডান হাতটা ট্রাউজারের পকেটে। আঙুলটা ট্রিগারের উপর।

আতোয়ান কথা বলবার আগে তার মনে হল যেন অনেক অনেক বছর পার হয়ে গেছে। যেন অনন্তকাল ধরে সে অপেক্ষা করছে আতোয়ানের কথা শোনার জন্যে।

'চীফ বলেছেন মি. ফগকে আবার নিচে নামতে হবে।'

আতোয়ানের গলা শুনতে পেল কুয়াশা। শান্ত স্বাভাবিক কণ্ঠেই আতোয়ান কথাগুলো উচ্চারণ করেছে। কোনরকম সন্দেহের অবকাশ রাখেনি। ধীরে ধীরে

নিঃশ্বাস ছাড়ল কুয়াশা।

ড্রেসার দুজন উঠে দরজার দিকে এগোল। আতোয়ান তাদের উদ্দেশ্যে বলল, 'কার্ট, চীফ তার পোশাক তৈরি রাখতে বলেছেন। উনি নিজেও নামবেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই যাচ্ছেন উনি- তাড়াতাড়ি হাত চালাবে।'

'আচ্ছা।' বেরিয়ে গেল ড্রেসার দুজন।

আলফানসও তাদের পিছনে পিছনে বেরিয়ে যাচ্ছিল। তাকে ঠেকাল আতোয়ান, 'তুমি এখানেই থাকবে। আর তীরে যাবার পোশাক পরে নেবে। তবে ইতিমধ্যে কেউ যেন ওপরে না যায়—একজন নাবিকও না। শুধু এঞ্জিনিয়ার আর তার সহকারী ছাড়া। এটাই চীফের নির্দেশ। অবশ্য যতক্ষণ পর্যন্ত কাজ শেষ না হয় শুধুমাত্র ততক্ষণের জন্যে। তারপর তুমি তার সাথে তীরে যাবে।'

'এসবের মানে কি?' ক্ষোভের সাথে জানাল আলফানস, 'অ্যা—এসবের মানে কি?'

আতোয়ান শ্রাগ করল, 'আমি কি করে বলব? কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।'

বেরিয়ে এল আতোয়ান। তাকে অনুসরণ করার জন্য ইশারা করল কুয়াশাকে। কুয়াশা বেরিয়ে এল আতোয়ানের পিছনে।

যাক প্রথম পর্ব সম্পন্ন হয়েছে নির্বিঘ্নে।

নাটকের শেষ অঙ্ক এবার অভিনীত হবে। মঞ্চ তৈরি। অদৃশ্য পরিচালকের নির্দেশে এবার যবনিকা উঠবে। ডেকে এখন আর কোন নাবিক যাচ্ছে না। আলফানসকে নিয়েই সমস্যা ছিল। তারও ডেকে আসার পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এ নিয়ে হয়ত জো'র নাবিক-কুলের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হবে, নিজেদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হবে কিন্তু জো'র নাম করে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা অমান্য করার সাহস রোজমেরীর কারও নেই।

কার্ট ও তার সহকারীর প্রায় পিছনে পিছনে, কুয়াশা ও আতোয়ান উঠল ডেকে। পরমুহূর্তেই সেখান থেকে সরে গেল আতোয়ান। এতক্ষণ স্বাভাবিক ভাবে অভিনয় করলেও ভয় পেয়েছে আতোয়ান। ঠিক এই মুহূর্তে সে এখানে জো'র সামনাসামনি পড়তে চায় না। বরং জো যদি এদিকে আসতে থাকে তাহলে পথে তাকে দেরি করিয়ে দেবার চেষ্টা করবে।

কুয়াশা ধীরে সুস্থে টুলের ওপর বসল। জুতোর ফিতে খুলল। এ ধরনের ডুবুরি পোশাক কি করে পরতে হয় সন্ধ্যাতেই সে অভিজ্ঞতা তার হয়েছে। আর সে জানে, প্রত্যেকটা কাজ খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। প্রত্যেকটা মুহূর্ত এখন মূল্যবান। অথচ অতিব্যস্ততাও দেখানো চলবে না। তাতে সন্দেহ হতে পারে ড্রেসারদের। মোজার মধ্যে প্যান্টের নিচের দিকটা ঢুকিয়ে দিল। ভারি উলের প্যান্টটা চাপাল তার উপর। উলের সোয়েটার পরে নিল। ড্রেসাররা তাকে সাহায্য করল। উরু পর্যন্ত উলের ওভার-স্টকিং পরিয়ে দিল ওরাই। ডাইভিং স্যুটের মধ্যে পা দুটো

ঢুকিয়ে দিতে সাহায্য করল। কুয়াশার কব্জিতে নরম সাবান দিয়ে ঘষে দিয়ে ভালকানইজড রাবার কাফের মধ্যে হাত দুটো ঢুকিয়ে দিল। তার উপর সেঁটে দিল রাবারের মজবুত বন্ধনী। ঠিক যখন কার্ট কুয়াশার ভারি বুট দুটোর ফিতে বাঁধছিল আর তার সহকারী তার মাথার উপর কুশন কলার সেঁটে দিয়ে বুকের প্লেট আটকাচ্ছিল তখন একটু দূরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। জো আর বার্নহাম এসে গেছে। যাক প্রায় সবটাই শেষ হয়েছে। শুধু হেলমেট পরানো বাকি। অথচ সেটাই দরকার সবচেয়ে বেশি।

চট করে একটা সিগারেট বের করল কুয়াশা। সেটা জ্বালিয়ে ঐ অবস্থাতেই সে উঠে দাঁড়িয়ে টাফরেলের দিকে এগিয়ে গেল। রেলিং-এর উপর ভর দিয়ে সে সামনের দিকে মাথাটা ঝুঁকিয়ে দাঁড়াল। সে জানে কার্ট যদি বিরক্তও হয় তার আচরণে তবুও সে চুপ করে থাকবে। একটা কথাও বলবে না। জো'কে পোশাক পরানো হচ্ছে। কেউ কোন কথা বলছে না। তার সামনে তার নাবিকরা টুঁশব্দটাও উচ্চারণ করে না অপ্রয়োজনে। জো তা একদম পছন্দ করে না, তারা তা জানে। কুয়াশাও জানে সে কথা। এটাই এখন তার সবচেয়ে বড় ভরসা।

তবুও কুয়াশা জানে বিপদ কাটেনি। জো যেকোন মুহূর্তে তাকে অর্থাৎ আলফানসকে কিছু একটা জিজ্ঞাসা করে বসতে পারে। তারজন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে সে। অটোমেটিকটা এখন আর প্যান্টের পকেটে নেই। সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় সেটা বুকের উপর টাইয়ের ঠিক নিচে রেখে দিয়েছে সে। বের করতে এক সেকেণ্ডের বেশি সময় লাগবে না।

কান খাড়া করে রইল কুয়াশা। অনেকক্ষণ পার হয়ে গেল। কেউ কোন কথা বলল না। বার্নহামও চুপচাপ। নবাগত লোকটাও কথা বলছে না।

অবশেষে কুয়াশার দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হল। এয়ার-পাম্পের চাফ চাফ শব্দ কানে এল তার। কানে এল ভারি বুটের শব্দ। জো তার দিকে এগিয়ে আসছে। মেরুদণ্ডের মধ্যে শিরশির করে উঠল। সিগারেটটা বাঁ হাতে নিল কুয়াশা। ডান হাতটা চলে গেল গলার কাছে। কিন্তু কিছু হল না। থেমে গেল বুটের শব্দটা। তার বদলে এগিয়ে এল কার্ট। তার হাতে হেলমেট। কুয়াশা ঘুরল না সমুদ্রের দিকে মুখ করেই দাঁড়িয়ে রইল। অবশেষে কার্ট যখন হেলমেট বসিয়ে সামনের উইণ্ডোর স্ক্রুটা লাগিয়ে দিল তখন মুখ ফেরাল কুয়াশা। উজ্জ্বল আলো প্রতিফলিত হল উইণ্ডোর কাঁচে। এখন আর বিপদের আশঙ্কা নেই। কাছাকাছি এসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য না করলে এখন আর তাকে কেউ চিনতে পারবে না। আর এখন পর্যন্ত সে সন্দেহজনক কোন আচরণ করেনি। জো নিরুদ্বিগ্ন। সে এখনও জানে কুয়াশা আছে নয় নম্বর কেবিনে বন্দী হয়েই। অথচ ১৮০ পাউণ্ড ওজনের ডাইভিং-স্যুটে বন্দী হয়ে সে জো'র সাথেই চলেছে সমুদ্রের নিচে শয়তানটার গোপন ধনাগারে।

'লাউড-স্পীকারে জো'র কণ্ঠ শোনা গেল, 'সব কিছু ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে।'

কে বলল বুঝতে পারল না কুয়াশা।

'বেশ, এগোও এবার।' জো নির্দেশ দিল।

কুয়াশা মইয়েব দিকে এগিয়ে চলল। পিছন ফিরে দেখল জো আসছে তার পিছনে। পর মুহূর্তে দীর্ঘ বারের তলায় ঝুলন্ত তিনশ ওয়াটের সাব-মেরিন ল্যাম্প জ্বলে উঠল। আলোর বন্যায় প্লাবিত হল আফটার ডেক আর সমুদ্রের চঞ্চল ফেনিল বক্ষ।

সমুদ্র আলিঙ্গন করল কুয়াশাকে। ক্ষুদ্র ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। একটু পরে সে সমুদ্রের মধ্যে হারিয়ে গেল। মাথা তুলে দেখল জো নেমে পড়েছে পানিতে।

দুজন ধীরে ধীরে নামতে লাগল সমুদ্রের নিচে। বায়ুর চাপের আকাস্মক পরিবর্তনের ফলে কুয়াশার কানের পর্দায় ঝিম ঝিম শব্দ করতে লাগল। তারপর ধীরে ধীরে নেমে এল অন্তহীন নিস্তব্ধতা নীরবতার ভাষায় যেন মুখর হয়ে উঠল সমুদ্র। সমুদ্র এখানে বোধহয় বেশি গভীর নয়। তবে ঠিক কতটা নিচে ওরা নেমে এসেছে কুয়াশা জানে না। মিনিট দশেকের মধ্যে ওরা ভূমি স্পর্শ করল। অত্যুজ্জ্বল সাব-মেরিন ল্যাম্পটাও ক্রমশ নেমে এল। ওরা ভূমি স্পর্শ করতেই ল্যাম্পটাও থেমে গেল। কয়েক হাত উপরে স্থির রইল বাতিটা।

উজ্জ্বল বাতিটা অনেকটা জায়গা আলোকিত করেছে। পানি এত পরিষ্কার এত স্বচ্ছ যে মনে হয় ওরা যেন একটা ছোট পুকুরে নেমেছে।

নিচের দিকে তাকাল কুয়াশা। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। উঁচু-নিচু শিলাময় মাটির বুক। তার ফাঁকে ফাঁকে শেওলা। অদৃশ্য স্রোতে শেওলাগুলো কাঁপছে। ছোট ছোট রং বেরং-এর মাছ চারদিকে খেলা করছে। ওদের অভিযানে বিরক্ত একটা কাঁকড়া দ্রুত স্থান ত্যাগ করল। একটা মাছ লেজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে আসছিল সেটা থেমে গেল। একটু পরেই দিক পরিবর্তন করল।

জো তার কাছ থেকে বেশ কয়েক হাত দূরে সরে গেছে। কুয়াশা দেখল সে একটা গোলাকার পাথরের কাছে গিয়ে দাঁড়াল, ভাল্‌ভ্ অ্যাডজাস্ট করল। কুয়াশার অস্বস্তি লাগছিল। আগের বারের মত এবারেও তার মনে হচ্ছিল কে যেন তাকে উপরে ঠেলে দিচ্ছে। সেও বাতাস বেরিয়ে যাবার ভাল্‌ভটা সামান্য খুলে দিল। বাতাস বেরিয়ে যেতেই স্ক্রুটা আবার বন্ধ করে দিল। তারপর এগিয়ে গেল জো'র দিকে। এগোতে তার বেশ পরিশ্রম হচ্ছিল। মনে হল যেন সে পেরিয়ে যাচ্ছে অন্তবিহীন পথ। কিন্তু জোর কাছাকাছি যেতেই তার খেয়াল হল জো তাকে হাত নেড়ে এগোতে নিষেধ করছে। আবার সে আগের মতই কষ্টকর পরিশ্রম করতে করতে সরে গেল। দাঁড়াল শিলাখণ্ডটার উল্টো দিকে। সেটাকে জো ইতিমধ্যেই স্থানচ্যুত করছে।

হঠাৎ কুয়াশার মনে হল, পানিটা এত স্বচ্ছ আর আলোটা এত তীব্র যে নিচে ওরা কি করছে না করছে উপরের ডেক থেকে তা হয়ত দেখা যাবে। কথাটা মনে হওয়াতে একটু চমকে গেল সে। উপরের দিকে মুখ তুলল। কিন্তু না, কুয়াশা পরক্ষণেই বুঝতে পারল ভয়ের কোন কারণ নেই। উপর থেকে ওদের দেখা যাচ্ছে ঠিক কিন্তু ঢেউ-এর আন্দোলনে ওদের চলাফেরা কাজকর্ম ভাল করে বোঝা যাবে না, আবছা একটা ছবি দেখতে পাওয়া যাবে শুধু। স্পষ্ট করে কিছু দেখা যাবে না। অতএব এ নিয়ে চিন্তার কোন কারণ নেই।

জো'র দিকে মুখ ফেরাল কুয়াশা। সে উপরের দিকে চেয়ে আছে। তাকে দেখাচ্ছে একটা দৈত্যের মত। কুয়াশা মনে মনে হাসল। তাকেও নিশ্চয়ই ঐরকমই একটা দৈত্যের মত দেখাচ্ছে।

হেডফোনের ভিতর দিয়ে জো'র ধাতব কণ্ঠ শোনা গেল। জো নির্দেশ দিচ্ছে। 'শুরু কর। আলফানস, গেট রেডি।'

কুয়াশা উপরের দিকে তাকাল। মিনিটখানেক পরে নেমে এল একটা বাক্স। ধীরে ধীরে বাক্সটা নেমে আসছে। জো যেখানটায় দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে কয়েক গজ দূরে নেমে এল বাক্সটা। কেবলটা ঢিলে হয়ে গেল।

জো আবার নির্দেশ দিল, 'আবার তোল।'

কেবলটা সোজা হল আবার। বাক্সটা আবার উঠল।

'ডাইনে।' জো জানাল, 'তোমাদের ডাইনে।'

বাক্সটা সচল হল। ধীরে ধীরে এগোতে লাগল জো'র দিকে।

'থাম।'

থামল বাক্সটা। আবার নেমে এল সেটা পাথুরে মাটির উপর। জো যেখানে দাঁড়িয়েছিল তার মাত্র তিন-চার হাত দূরে। কেবলটা আবার ঢিলে হয়ে গেল।

কুয়াশা বুঝল এবার তাকে এগোতে হবে। পানি কেটে এগিয়ে গেল সে। বাক্সটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ইস্পাতের তৈরি ভারি বাক্স। জোও এগিয়ে এসেছে। কেবলের হুক থেকে বাক্সটাকে খুলতে শুরু করেছে। কুয়াশা তাকে সাহায্য করল। আর হাত চালানোর ফাঁকে ফাঁকে সে বাঁকা চোখে দেখল জো যেখান থেকে পাথরটা সরিয়েছে সেখানে একটা গর্তের মত লাগছে। আলোটা সেখানে ভাল করে পৌঁছায়নি। অন্ধকার লাগছে গুহাটাকে। ওটাই তাহলে জো'র গোপন ভাণ্ডার।

কেবলের হুক থেকে বাক্সগুলো খোলা হল। উঠে গেল কেবলটা উপরের দিকে। কুয়াশা ও জো দুজনে মিলে সেগুলো বয়ে নিল গর্তের প্রান্তে। কষ্টকর প্রয়াস। এক গজ এগোতে গেলে মনে হয় যেন একশ গজ এগোতে হচ্ছে।

তবুও এক সময় গর্তের প্রান্তে বাক্সগুলো বয়ে নেওয়া শেষ হল। গর্তের পাশে উপুড় হয়ে বসল জো। পা দুটো ঢুকিয়ে দিল গর্তের মধ্যে। নামতে লাগল সে।

কুয়াশার মনে হল ভিতরে বোধহয় মই লাগানো আছে। জো মই বইবার মত

করে ধাপে ধাপে নেমে যাচ্ছে।

কুয়াশা তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করতেই তা জো'র নজরে পড়ল। সে হাত নেড়ে কুয়াশাকে এগোতে নিষেধ করল। টেলিফোনে তার গলা ভেসে এল, 'ওখানেই থাক, আর বাক্সগুলো একে একে নামিয়ে দাও।'

ইতস্তত করল কুয়াশা। এখানেই– এই সামুদ্রিক গুহার মধ্যেই তার পায়ের নিচে আছে জো'র অন্তহীন ঐশ্বর্য, আছে বিপুল লুণ্ঠিত ধন, আছে অমিত রত্নরাজি। যার জন্য প্রাণ দিয়েছে অসংখ্য লোক, এডিথ আর এথেলের বাবা, এথেল নিজে। প্রাণ দিয়েছেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মণিষী রোজেনবার্গ, আরও কত নাম না জানা হতভাগ্য—যার জন্য ইতিমধ্যেই প্রাণ দণ্ডের নির্দেশ হয়েছে তার নিজের আর এডিথের। এই ভাণ্ডারের ইতিহাস রক্তের কালিমায় ক্লেদাক্ত। এর এতটুকু সামগ্রী ভোগের ন্যায়সঙ্গত অধিকার জো'র নেই। এ সম্পদ কুয়াশা যেকরেই হোক উদ্ধার করবে। তা ব্যয় করবে বিজ্ঞানের সেবায় আর মানুষের কল্যাণে। আর সেই জন্যেই সে পালিয়ে যাবার সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও পালিয়ে যায়নি– মারাত্মক এক ঝুঁকি নিয়েছে তার বদলে। এতটা মূল্যের বিনিময়ে সে জো'র ধনভাণ্ডারের এত কাছে এসে অন্তত সেটাকে চোখের দেখাও দেখতে পাবে না, তা তো হতেই পারে না।

অবশ্য কুয়াশা জানে তার জন্যে অপেক্ষা করলে ক্ষতি নেই। সে সময় আসতেও তেমন দেরি নেই।

সে জো'র হাতে একটা একটা করে বাক্স তুলে দিতে লাগল। জো সেগুলো নিয়ে মই বেয়ে নিচে নেমে রেখে আসতে লাগল। কুয়াশা জানে সে ইচ্ছা করলেই এই মুহূর্তে জো'কে গুহা পথের পাথর চাপা দিয়ে রেখে আসতে পারে। জীবনে আর কোনদিনই সে উঠতে পারবে না তার ধনাগার থেকে। যক্ষ হয়ে পাহারা দিতে হবে। কিন্তু সে সময় এখনও আসেনি। শিগগিরই আসবে।

আর এক দফা বাক্স নেমে এল। ধীরে ধীরে এসে নামল গুহার তিন চার গজ দূরে। জো ইতিমধ্যে উঠে এসেছে। সে আর এগিয়ে এল না। গুহামুখ থেকেই টেলিফোনে নির্দেশ দিল, 'বাক্সগুলো খুলে নিয়ে এস।'

কুয়াশা কেবল থেকে বাক্সগুলো খুলল। একে একে সেগুলো নিয়ে গেল গুহার পাশে। তারপর সেগুলো নামিয়ে দিতে লাগল জো'র হাতে। প্রচণ্ড পরিশ্রম হচ্ছিল কুয়াশার। বুঝতে পারছিল ডাইভিং স্যুটের অভ্যন্তরে তার দেহ থেকে দরদর করে ঘাম ঝরছে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল সে। চোখের সম্মুখে ঝাপসা লাগছে। চোখের সামনে গ্লাস প্যানেলে বাষ্প জমেছে। হেলমেটের বাঁ দিকের এয়ার কর্ক খুলে হাঁ করে মুখের ভিতর পানি নিল সে। কুলি করে পানিটা ছড়িয়ে দিল গ্লাস প্যানেলে। দৃষ্টিটা আবার স্পষ্ট হল। সুইমিং ড্রেসের কলারের ভিতর দিয়ে বুকের দিকে নেমে গেল পানি ফোঁটায় ফোঁটায়।

ক্লান্তিটা একটু দূর হল কুয়াশার। জো গুহার ভেতরে রয়েছে। বাক্সগুলো

গুছিয়ে রাখছে সে। বাক্সগুলোতে ইতিমধ্যে কত লক্ষ টাকার ধনরত্ন নিচে নেমেছে একবার হিসাব করার চেষ্টা করল কুয়াশা মনে মনে। পাঁচ লক্ষ টাকার? দশ লক্ষ টাকার? হিসাব করা আসলে দুঃসাধ্য। এমন কি আন্দাজ করতেও কল্পনার রাশটাকে খুলে দিতে হবে। আর জো তার দস্যুবৃত্তির ইতিহাসে এমন কত কোটি টাকার হীরা জহরৎ এনে এখানে সঞ্চয় করেছে কেউ কোনদিনও তা কল্পনা করতে পারবে না। জো নিজেও তা জানে না হয়ত। পৃথিবীর অনেক দেশের কোষাগারেও হয়ত এত অর্থ নেই। কুয়াশা নিজেও অনেক গোপন ভাণ্ডার করায়ত্তে এনেছে—মানিকপুরের গুপ্তধন, চিরণ মন্দিরের গুপ্তধন—কিন্তু জো'র এই সামুদ্রিক ধনাগারের ঐশ্বর্য নিঃসন্দেহে সেগুলোর চাইতে অনেক গুণ অধিক।

তার নিজের আকাঙ্ক্ষাও তো এমন কিছু বিরাট নয়। এমন বিশাল ধনভাণ্ডার করায়ত্তে আনার কথাও তো সে এর আগে ভাবেনি। শুধু যতটুকু দরকার মনে হয়েছে ঠিক ততটুকু বৈভবই সে সংগ্রহের চেষ্টা করেছে। তাও তো কখনই নিজের জন্য করেনি, করেছে পরের কল্যাণে। আর সে সম্পদ এমন কিছু বিপুলও নয়। জো'র ঐশ্বর্যের তুলনায় তা অতি নগণ্য, অতি তুচ্ছ। অথচ তার নাম আছে দুনিয়া জোড়া। অবশ্য নাম নয়, বদনাম। আর জো স্টিফেন দুনিয়া সুদ্ধ মানুষের অগোচরে দুনিয়ার সিংহভাগ ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করে তার মালিক হয়ে বসে আছে।

কিন্তু ঐশ্বর্যের পরিমাণ হিসেব করতে কুয়াশা পারুক আর না পারুক সময়ের হিসেব তার চুলচেরা।

সে হিসাব করে দেখল শূন্য কেবল উঠে যেতে আর তা বাক্সসমেত নেমে আসতে দশমিনিট সময় লাগে। বাক্সগুলো খুলে তা জো'র হাতে তুলে দিতে দরকার হয় ছয় মিনিটের। চার মিনিট তার হাতে থাকে। নাটকের শেষ দৃশ্যের মঞ্চ তৈরি করার জন্যে তাই আর দেরি করা সমীচীন নয়। কাজের ফাঁকে ফাঁকে যে চার মিনিট করে সময় পাবে এখন থেকেই তার সদ্ব্যবহার করতে হবে। আর দেরি করলে চলবে না।

তৃতীয়বার কেবলের হুক থেকে বাক্সগুলো খুলে সে জো'র হাতে তুলে দিল একে একে। সবগুলো নেয়া শেষ হলে জো নেমে গেল গুহার ভেতরে। জো'র হেলমেটটা অদৃশ্য হতেই কুয়াশা বাঁ হাত দিয়ে তার লাইফ-লাইনটা চেপে ধরল। একটু টেনে নামাল নিচের দিকে। ঢিলে হয়ে গেল কেবলটা।

তারপর শুরু হল তার কাজ। ডাইভিং স্যুটের বেল্টের ভাঁজে যে ছুরিটা সে লুকিয়ে রেখেছিল সেটা ধীরে সুস্থে বের করল। সাব-মেরীন লাইটের আলোতে চকচক করে উঠল ছুরিটা।

কুয়াশা জানে সে কি করছে। কিন্তু তার মনে জো'র প্রতি এতটুকু দয়া-মায়া নেই। তার ব্যাপারে সে নির্মম, নিষ্ঠুর। আর যাকেই হোক জো'কে ক্ষমা করার প্রশ্ন ওঠে না। কুয়াশার মনে হল প্রফেসর রোজেনবার্গের কথা। জো তাকে নির্মমভাবে

শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে সমুদ্রের অতলে তার আক্সজেন সিলিণ্ডার দুটো আগে থেকে নষ্ট করে রেখে, আর কপিকল নষ্ট হয়ে যাওয়ার অজুহাত দেখিয়ে। কুয়াশা তাকে ক্ষমা করতে পারে না। মানবতার এতবড় শত্রুকে ক্ষমা করা মানবতার চরম শত্রুতা সাধন ছাড়া আর কিছুই নয়। তাছাড়া জো'কে যদি সে ক্ষমাও করে তাহলে জো তাকে ছেড়ে কথা কইবে না। আল্ট্রাসোনিক্সের লোভেই জো তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে কুয়াশা তা জানে। জো যদি কুয়াশার কাছ থেকে আল্ট্রাসোনিক্স পায় তাহলেও সে তাকে হত্যার চেষ্টা করবে। না পেলে তো কথাই নেই। এডিথের কথাও তার মনে হল। সে জানে এডিথকে কি মূল্য দিতে হবে, শুধু জীবনটাই দিতে হবে না, ইজ্জতও বিক্রি করতে হবে।

সারাজীবনে সে নরহত্যাকে ঘৃণা করেছে, নরঘাতককেও ঘৃণা করেছে, কিন্তু আজকে জো'কে সে হত্যা করবে। সে এটাও জানে জো'কে হত্যা করায় কোন পাপ নেই, কোন অপরাধ নেই। আইনের চোখে যাই হোক, বিবেকের কাছে এটা কোন অন্যায় নয়।

দু হাতে জো'র লাইফ-লাইন কাটতে শুরু করল কুয়াশা।

উপর থেকে একের পর এক বাক্স আসছে। সেগুলো সে নামিয়ে জো'র হাতে তুলে দিচ্ছে। কিন্তু মাঝখানে সে যে চার মিনিট করে সময় পাচ্ছে সেটুকু সে ব্যয় করে চলেছে লাইফ-লাইনের আঁশ কাটতে।

লাইফ-লাইনটা এক সময় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। শুধু অবশিষ্ট রইল ভিতরে টেলিফোন লাইনটা। তারপর সে নিজের লাইনটাও কেটে ফেলল—টেলিফোন লাইনটা বাদ দিয়ে। দুটো লাইনই এমন অবস্থায় রইল যে, যেকোন মুহূর্তে ছুরির এক আঘাতেই টেলিফোন লাইনের ক্ষীণ যোগাযোগ ছিন্ন করা যেতে পারে। কুয়াশাকে এটা এই জন্য করতে হল যে, কোন লাইন দিয়ে কথা আসছে লাউড-স্পীকারে সেটা ধরা পড়বে না আর টেলিফোনে কণ্ঠস্বরের যেটুকু স্বাভাবিক বিকৃতি হয়, তার সাথে হেলমেটের মধ্যেকার বায়ু-তরঙ্গ মিলে গলার আওয়াজটা যে কার তাও চেনা যাবে না। কিন্তু উপরে জাহাজে লাইনের অপর প্রান্তে যে লোকটা বসে আছে কার লাইফ-লাইন কোনটা সে তো তা জানে। তাকে তো ফাঁকি দেওয়া যাবে না। তাছাড়া আলফানস যদি কোনক্রমে ডেকে চলে আসে তাহলে তার পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যাবে। তাহলে তাকে আর পৃথিবীর আলো-হাওয়ার পরশ পেতে হবে না।

মোট আটবার উপর থেকে বোঝা নামল। ছয়বারের মধ্যেই কুয়াশার কাজ শেষ। সে এখন প্রস্তুত। এখন সে অপেক্ষা করছে চরম মুহূর্তটার জন্য। সে জানে এখনও তার বিপদ পুরোপুরি কাটেনি, এখনও সে ধরা পড়ে যেতে পারে। তাতে অবশ্য তার আফসোস নেই, কারণ মরলে সে এখন একা মরবে না, জো'কে মেরে তবেই মরবে। তখন একমাত্র সেটাই হবে তার সান্ত্বনা।

অষ্টমবার বোঝা নামাবার পর উপর থেকে গলা ভেসে এল. 'ব্যস খতম।'

কণ্ঠটা সম্ভবত বার্নহামের।

ডাইভিং স্যুটের ভিতরে দেহটা নড়ে উঠল কুয়াশার। বাক্সগুলো এগিয়ে দিল জো'র হাতে। জো সেগুলো নিয়ে নেমে গেল নিচে। ছুরিটা বের করল কুয়াশা।

টেলিফোনের মধ্যে দিয়ে আবার শোনা গেল কণ্ঠ। 'একটা গোলযোগ ঘটেছে এখানটায়।'

চমকে উঠল কুয়াশা। কে বলছে? কার এই কণ্ঠ? জো'র? বার্নহামের? স্পষ্ট বুঝতে পারল না সে। সম্ভবত বার্নহামের। কারণ নিচে তো গোলযোগ এখন পর্যন্ত ঘটেনি। যেটা ঘটেছে জো সেটা এখনও জানে না। যেটুকু ঘটতে যাচ্ছিল পরের সেকেণ্ডে টেলিফোনে গোলমালের খবর কানে আসতেই সেটুকু স্থগিত রয়েছে। আর নিচে আসল গোলমালটা হলে জো'র কণ্ঠ ইতিমধ্যেই স্তব্ধ হয়ে যেত। তাহলে উপরে জাহাজ থেকেই কথা বলছে। বার্নহামই হবে। কিন্তু উপরে গোলমাল হলে তো আরও বিপদের কথা। তাহলে সে কি ধরা পড়ে গেছে? আলফানস কি ডেকে এসে সব ফাঁস করে দিয়েছে?

মুহূর্তে কুয়াশার দেহটা শক্ত হয়ে গেল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চাপল সে। কঠিন হাতে চেপে ধরল টেলিফোনের লাইন। একা সে মরবে না।

'কিসের গোলমাল?'

জো'র সেই একঘেয়ে নির্বিকার কণ্ঠ টেলিফোনের মধ্যে চিনতে কষ্ট হল না কুয়াশার।

ছুরিটা বসাল না জো'র টেলিফোন লাইনে। কান খাড়া করে রইল কুয়াশা। শোনাই যাক না। জো তো তার কবল থেকে পালিয়ে যেতে পারছে না। নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনতে লাগল সে।

'দুজন অতিথি এসেছে।'

'কোথা থেকে?'

'জানি না। বোধহয় টিকটিকি। সাঁতরে এসেছে।'

'জ্যান্ত ধরেছ?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় রেখেছ?'

'নিচে আছে। আতোয়ানের কেবিনে। তাকেও বন্দী করা হয়েছে।'

'কাকে?'

'আতোয়ানকে।'

'কেন?' এবার যেন জো'র কণ্ঠে একটু বিস্ময় ফুটে উঠল।'

'কার্ল আর ব্রিজম্যানকে গুলি করেছে আতোয়ান।'

'কি বলছ তুমি?'

'যা বলছ, তা ঠিক।'

'কারণটা কি?'

'জানি না। ওরা দুজন তোমাকে আর আলফানসকে ড্রেস পরিয়ে নেমে যেতেই ওদের দিকে পিস্তল ছুঁড়েছে আতোয়ান।'

'মারা যায়নি তো?'

'না। আঘাত কারও তেমন গুরুতর নয়। কার্লের ডান হাতে আর ব্রেজম্যানের বাঁ দিকে কাঁধের ভিতর দিয়ে গুলি চলে গেছে। দুজনই বেঁচে যাবে বোধহয়। তবে এখন দুজনই অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। ডাক্তার ওদের দেখছে।'

'বেশ, বিচার হবে আতোয়ানের। এমন শাস্তি দেব...'

'মহামান্য অতিথিদের কি এখনই শেষ করে দেব?'

'না। আমি আসছি। মিনিট কয়েক পরে আমাদের তুলবে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কুয়াশা। ড্রেসার দুজনের জন্য একটু আফসোসও হল। কিন্তু ওরা নিশ্চয় এমন কিছু করেছিল বা করতে যাচ্ছিল যার ফলে কুয়াশা ধরা পড়ে যেত মনে করে বাধ্য হয়েই আতোয়ান গুলি করেছিল। মনে মনে সে আতোয়ানের প্রতি কৃতজ্ঞও হল।

কে জানে হয়ত আলফানসেরও একই অবস্থা হয়েছে আতোয়ানের হাতে। অন্তত কিছু একটা যে আলফানসের ভাগ্যে ঘটেছে তাতে সন্দেহ নেই। অন্যথায় জাহাজের এমন মারাত্মক একটা ঘটনা ঘটে গেল তাতে আলফানসের কিছু একটা ভূমিকা তো থাকবার কথাই। আর তার ভূমিকা থাকলেই কুয়াশা ধরা পড়ে যাবে। কারণ ওরা সবাই জানে আলফানসই জো'র সাথে সমুদ্রের নিচে নেমেছে। আসল কথা জানে শুধু আলফানস নিজে, ড্রেসার দুজন, আতোয়ান আর কুয়াশা। তাই আলফানসকে এখন কেউ জাহাজে দেখলে প্রথমে হয়ত ভূত দেখবার মত চমকাবে কিন্তু পরক্ষণেই কুয়াশার সমস্ত পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যাবে। শুধু তাই নয় জীবন দিয়ে হলেও মূল্য শোধ করতে হবে।

নয়

জো'র টেলিফোন লাইনে ছুরি বসিয়ে দিল কুয়াশা। লাইনটা বিচ্ছিন্ন হল। জো'র লাইফ-লাইনের গোড়াটা সে টেনে নিয়ে নিজের কোমরে জড়াল। ভাল করে গিট দিল।

নিজের লাইফ-লাইন আরও কিছুটা টেনে নিল। আগেই এমন একটা শিলাখণ্ড সে দেখে রেখেছিল যেটাতে তার লাইফ-লাইনটা বেঁধে রাখা যায়। নিজের লাইফ-লাইনটা কেটে সেটা সেই শিলাখণ্ডে আচ্ছা করে পেঁচিয়ে বাঁধল। তার লাইফ-লাইনটা ঢিলে হয়ে গেলে উপরে জাহাজে যে লোকটা লাইফ-লাইন ধরে আছে তার

সন্দেহ হতে পারে। তাই এই ব্যবস্থা করল কুয়াশা।

জো'র হেলমেটটা দেখা গেল। সে মই বেয়ে গুহার ভিতর থেকে উঠে আসছে।

কুয়াশা গুহার প্রান্তে একটা হাঁটু মুড়ে।নচু হয়ে মুঠোর চাইতে দ্বিগুণ আকারের একটা পাথর তুলে নিল।

জো'র উচ্চারণ নকল করে টেলিফোনে জানাল, 'এবারে আমি উঠব। আচ্ছা রাখ, একটু দেরি কর। কিন্তু আমাকে একটু পরেই আবার নামতে হবে। আলফানস, তুমি কিছুক্ষণ থাক। তোমাকে আর একটা কাজ করতে হবে।'

জো'র হাতটা গর্তের উপরে এসেছে। সে হাত রাখবার একটা জায়গা খুঁজছে। হেলমেটটা গর্তের বাইরে এসে পড়েছে। এক হাত দিয়ে সে কুয়াশাকে সরে যেতে ইশারা করছে। হয়ত কে জানে মৌখিক নির্দেশও দিচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে।

কুয়াশা হাঁটু মুড়ে এমনভাবে বসেছিল যে, সে না সরলে জো উঠতে পারবে না গর্ত ছেড়ে।

কুয়াশা সরল না। সেখানে হাঁটু গেড়ে বসে থেকেই আবার জো'র উচ্চারণের অনুকরণ করে বলল, 'আতোয়ান বদমায়েসটাকে এখনি নিয়ে এস ডেকের উপর। আর দেখ ড্রেসারদের কেউ যেন বিরক্ত না করে। কোন কথা এখন তাদের জিজ্ঞেস করার দরকার নেই।'

'ডাক্তারও তাই বলেছে,' জানাল উপর থেকে।

এদিকে জো ক্রমাগত হাত নেড়ে তাকে সরে যাবার ইশারা করছে। তার লাইফ-লাইনের ছিন্ন অংশ যে পানির মধ্যে ভাসছে তা এখনও তার নজরে পড়েনি। সে উপরে আলোর দিকে চেয়ে আছে। আর তার ঠোঁট নড়ছে। নিশ্চয়ই কিছু একটা সে বলছে। কিন্তু কুয়াশা জানে জো'র জীবনের এই শেষ কথাগুলো কেউ শুনতে পাচ্ছে না, কোনদিন আর কেউ জো'কে দেখবে না। তার কণ্ঠস্বরও কোনদিন কেউ শুনবে না। কুয়াশা সেখানেই সেই অবস্থাতেই অটল হয়ে রইল।

হয়ত সে যা বলছিল তার কোন জবাব না পেয়ে অথবা প্রতিক্রিয়া ঘটতে না দেখে জো থমকে গিয়েছিল অথবা কুয়াশাকে অটল হয়ে থাকতে দেখে তার মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল। যেটাই হোক, তার হাত নাড়া বন্ধ হল, ঠোঁট দুটোও আর নড়তে দেখা গেল না কাঁচের মধ্যে দিয়ে। তারপর সে তার শিরস্ত্রাণে আবৃত মাথাটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আনল কুয়াশার মাথার কাছে। ধীরে ধীরে নিকটবর্তী হল দুজনের মুখাবরণের কাঁচ। পার্থক্য রইল মাত্র পাঁচ ছয় ইঞ্চি।

কুয়াশা জো'কে ভাল করে দেখতে দিল তার নিজের মুখটা। জো'র কাছে চরম সত্যটা গোপন করার পরিকল্পনা তার আদৌ ছিল না। এই প্রথম কুয়াশা সরাসরি জো'র দিকে তাকাল। এমনভাবে মুখটা তুলল যাতে করে জো তাকে চিনতে

পারে। সাব-মেরিন লাইটের উজ্জ্বল আলো কাঁচে প্রতিফলিত হওয়ায় মুখটা পুরোপুরি স্পষ্ট দেখা না গেলেও এত কাছে থেকে চিনতে পারা অসম্ভব নয়।

আর জো ঠিকই চিনতে পারল তাকে। তার কালো জ্বলন্ত চোখ দুটো আতঙ্কে ঠিকরে পড়ল। পাতলা রক্তশূন্য ঠোঁট দুটো ভেদ করে দাঁতগুলো বেরিয়ে এল নেকড়ে বাঘের মত। এই প্রথম তার নির্বিকার চেহারার মুখোশটা একেবারে খসে পড়েছে, তার বদলে বেরিয়ে পড়েছে নেকড়ের হিংস্রতা। আতঙ্কে বীভৎস দেখাচ্ছে জো'কে। হয়ত সে প্রচণ্ড চিৎকার করে ডাইভিং স্যুটের ভিতরটা কাঁপিয়ে তুলছে। কিন্তু সে চিৎকার সে একাই শুনছে। কোন উত্তর না পেয়ে তার আদেশ পালন হতে না দেখে সে হেলমেটের দিকে একহাত বাড়িয়ে দিয়েছে সন্দেহবশে। আর হাত দিয়েই বুঝতে পেরেছে তার টেলিফোন লাইন আর লাইফ-লাইন দুটোই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

কুয়াশা চেয়ে আছে জো'র দিকে। কে জানে কি ভাবছে জো। হয়ত সে ভাবছে, মৃত্যু তাহলে সত্যিই তার পিছনে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে এইখানে তার গোপন ধনাগারে।

কিন্তু কি করে এটা সম্ভব হল তা সে কোনদিনই জানবে না। সাফল্যের উত্তুঙ্গ শীর্ষে আরোহণ করেছিল সে। প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি দফায় সে একের পর এক জয় লাভ করে এসেছে।

জো জানে কুয়াশাকে সে বন্দী করে রেখে এসেছে পরাজিত, নিরস্ত্র ও অসহায় অবস্থায় তারই জাহাজের দুর্ভেদ্য এক কক্ষে। কিন্তু তবুও সে এখানে কেমন করে এসেছে আলফানসের বদলে কে জানে, সে রহস্য সে কোনদিন জানতে পারবে না। কুয়াশা পরাজিত হয়নি, সে স্বাধীন, সে অসহায় নয়, নিরস্ত্র নয়। নাবিকরাই তাকে পোশাক পরিয়েছে। তাকে নামিয়ে দিয়েছে। একটি কথাও উচ্চারণ করেনি। আর সেটাই হল নিয়তির শেষ মার। কিন্তু কিভাবে এই অসম্ভব সম্ভব হয়ে উঠল? কুয়াশা কি জাদু মন্ত্রে নাবিকদের আবিষ্ট করেছিল?

শেষ চেষ্টা করতে ছাড়ল না জো। বিস্ময় মিলিয়ে যেতেই আত্মসংবরণ করল মুহূর্তের মধ্যে। ডান হাতটা দ্রুত এগিয়ে এল কুয়াশার দিকে। চেপে ধরল তার কাঁধ। কিন্তু অমসৃণ টুইলের উপর থেকে হাতটা ফস্কে গেল। কুয়াশা তার কব্জিটা ধরে মোচড় দিয়ে সরিয়ে দিল। বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে জো একটা শিলাখণ্ড চেপে ধরে ভারসাম্য রক্ষা করছিল। হাতের পাথরটা দিয়ে চেপে জো'র সেই আঙুলের উপর প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত করল কুয়াশা।

কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখা গেল জো'র চেহারাটা যন্ত্রণায় কুঞ্চিত হয়ে গেছে। হাতটা সরিয়ে নিল সে।

কুয়াশা ছুরি চালিয়ে দিল জো'র এয়ার পাইপের মধ্যে। তারপর একটা ধাক্কা দিল।

জো ধীরে ধীরে পড়ে গেল চিৎ হয়ে। তার হাত দুটো নড়ছে। মই থেকে তার দেহটা পড়ে গেল। তলিয়ে গেল সে নিজের গোপন ধনাগারে। সূক্ষ্ম বুদবুদ উঠতে লাগল পানির মধ্যে দিয়ে।

'বার্নহাম।' জো'র উচ্চারণ নকল করে সে বলল।

'হ্যাঁ।' বার্নহামের কণ্ঠ শোনা গেল।

'শুধু আমাকে তোল।'

জো'র লাইফ-লাইন সে মজবুত করে তার কোমরে জড়িয়ে নিয়েছে। বার্নহামকে নির্দেশ দিয়েই সে নিজের টেলিফোনের লাইনটা কেটে দিল। এটাই ছিল তার লাইনের সাথে শেষ সংযোগ।

ধীরে ধীরে উঠতে লাগল কুয়াশা। বাতির পাশ দিয়ে সবুজ ছায়া ছায়া পানির রাজ্য ভেদ করে সে মুক্ত আলো হাওয়ার রাজ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। নিচে অন্ধকারে পড়ে আছে জো তার গুপ্ত ভাণ্ডারে। সে ভাণ্ডারের দ্বার আর কোনদিন খুলতে পারবে না। চিচিং ফাঁকের মন্ত্র আর কোনদিন সে উচ্চারণ করতে পারবে না।

কয়েক মিনিট পরে সে রোজমেরীর মইয়ের ধাপে পা রাখল। দেহের চারদিক থেকে অকস্মাৎ চাপ দূর হয়ে গেল। আলোর মধ্যে এসে দাঁড়াল কুয়াশা।

বার্নহাম ও এঞ্জিনিয়ার তাকে ধরে ডেকে নিয়ে গেল। একটা টুলের উপর বসিয়ে দিল তাকে। কুয়াশা বসে রইল সমুদ্রের দিকে মুখ করে। ওরা তার হেলমেটের সামনের কাঁচটা খুলে দিল। এক ঝলক হাওয়া কুয়াশার মুখে মিষ্টি পরশ বুলিয়ে দিল। মুক্ত হাওয়ায় বুক ভরে শ্বাস নিল কুয়াশা।

ওরা তার হেলমেট খুলছে। মাথাটা সামান্য নুইয়ে বসে আছে কুয়াশা। ডান হাতে বেল্টের ভাঁজ থেকে ছুরিটা বের করে বাঁ হাতে চালান করে দিল সে। হেলমেটটা খুলে ফেলা শেষ হতেই মাথাটা, ঘাড়টা আর একটু নিচের দিকে বাঁকাল। হাতটা উঠে গেল তার গলার কাছে।

পরের সেকেণ্ডেই তার বাঁ হাতে ছুরি আর ডান হাতে রিভলভার ঝলসে উঠল। সে মুখ ঘুরিয়ে মাথা তুলে সরাসরি ওদের দিকে তাকাল।

শান্ত, নম্র ও উদ্বেগহীন কণ্ঠে সে বলল, 'আমার মনে হয় এখানেই এই নাটকের যবনিকা ঘটল। জো খতম হয়েছে। গোলমাল করলে তোমরাও খতম হবে।'

যারা তার দিকে এতক্ষণ তাকায়নি তারাও তার কণ্ঠস্বর শুনে চমকে ফিরে তাকাল। যে নাবিকটা হেলমেট খুলেছিল সে ভূত দেখার মত চমকে উঠল। যেন তাদের সামনে বিনামেঘে বজ্রপাত হয়েছে। তারপর বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ওরা চেয়ে আছে তার দিকে নিঃশব্দে।

কিন্তু সে তো মুহূর্তের জন্যে। মাত্র দু'হাত দুরে দাঁড়িয়েছিল বার্নহাম। সে ঘুসি

বাগিয়ে এল। কুয়াশা বাঁ হাতের ছুরিটা সোজা বাগিয়ে রইল। আত্মসংবরণ করে দাঁড়িয়ে পড়ল বার্নহাম। তার চোখ দুটো বাঘের চোখের মত জ্বলছে। নাকের বাঁশি ফুলে উঠছে বারবার। হাতটা নামাল সে। পকেটের দিকে তার হাতটা এগোচ্ছে।

'হাত তোল, বার্নহাম!' কঠোর স্বরে আদেশ ঘোষণা করল কুয়াশা।

বার্নহাম দু'হাত শূন্যে তুলল। তার দৃষ্টি বিস্ফারিত।

কুয়াশা বলল, 'কেউ এতটুকু চালাকি করার চেষ্টা কোরো না। তাহলে মৃত্যু নিশ্চিত। কিন্তু কাউকে অহেতুক খুন করার ইচ্ছে আমার নেই। সবাই হাত তুলে রেলিং-এর দিকে এগিয়ে যাও। সমুদ্রের দিকে মুখ করে দাঁড়াও। বার্নহাম তুমিও...'

নিঃশব্দে তার আদেশ পালন করল ওরা।

আদেশ দানের ফাঁকে ফাঁকে কুয়াশা আতোয়ানের খোঁজ করছিল। একপাশে পিছমোড়া করে হাত পা বাঁধা অবস্থায় সে ডেকের উপর পড়ে আছে। কুয়াশা দেখল সেও বিস্ফারিত দৃষ্টিতে কুয়াশার কার্যকলাপ দেখছে।

'মি. এঞ্জিনিয়ার, আপনি আসুন এদিকে,' নির্দেশ দিল কুয়াশা।

এঞ্জিনিয়ার লোকটা ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এল। কুয়াশা দেখল লোকটা কাঁপছে। বলির-পাঁঠার মত এসে দাঁড়াল সে কুয়াশার কাছে। 'আতোয়ানের বাঁধন খুলে দিন।'

এঞ্জিনিয়ার নীরবে এগিয়ে গেল আতোয়ানের দিকে। মিনিটখানেক পরে মুক্ত আতোয়ান এগিয়ে গেল কুয়াশার দিকে। সে হাসল। কুয়াশাও হাসল প্রত্যুত্তরে।

কুয়াশা পরবর্তী নির্দেশ জারি করল এঞ্জিনিয়ারের উদ্দেশ্যেই। বলল, 'লাইফ-লাইনটা দিয়ে ওদের সবাইকে বেঁধে ফেলুন। কব্জিতে আচ্ছা করে বাঁধবেন। প্রত্যেকের মধ্যে অন্তত এক গজ দূরত্ব রাখবেন।'

'আমি কি ওকে সাহায্য করব?'

মাথা নেড়ে কুয়াশা বলল, 'না। ও কষ্টটুকু ওদেরই একজন করুক। তুমি বরং একটা রিভলভার সংগ্রহ কর। ওদের কারও পকেট থেকে তুলে নাও একটা রিভলভার।'

এঞ্জিনিয়ার লাইফ-লাইনটা নিয়ে এগিয়ে গেল নাবিকদের দিকে। কুয়াশা বোধহয় মুহূর্তের জন্যে অন্যমনস্ক হয়েছিল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল বার্নহামের দেহটা নড়ে উঠছে। শূন্যে উঠেছে দেহটা। পর মুহূর্তে বার্নহামের দেহটা রেলিং টপ্রকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল আতোয়ান রেলিং-এর দিকে।

কুয়াশা বলল, 'যেতে দাও। ওকে ইচ্ছা করলেই আমি শেষ করে দিতে পারতাম।'

আতোয়ান বলল, 'কিন্তু ওটাও তো কম শয়তান নয়।'

এঞ্জিনিয়ার লাইফ-লাইনটা হাতে নিয়ে বোকার মত দাঁড়িয়েছিল। কুয়াশার

ইশারায় তাকে কাজ শুরু করার নির্দেশ দিল। আতোয়ান এঞ্জিনিয়ারের রিভলভারটা তুলে নিল তার পকেট থেকে।

কুয়াশা আতোয়ানকে বলল, 'এরপর নিচের নাবিকগুলোকে বেঁধে ফেলতে হবে।'

'সে কাজটা ইতিমধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে,' সিঁড়ি থেকে কে যেন বলল।

কুয়াশা মুখ ফিরিয়ে দেখল কামাল এসে দাঁড়িয়েছে সিঁড়ির মাথায়। তার পিছনে শহীদ খান। দুজনেরই হাতে রিভলভার। হাসছে কামাল।

'আরে তোমরা! এস, এস!'

কামাল বলল, 'ওদেরকে কায়দা করতে মোটেও বেগ পেতে হয়নি। কেউ বাকি নেই। সব কটাকেই পাকড়াও করেছি। অবশ্য ওরাই আমাদেরকে আগে বন্দী করেছিল।'

'এডিথ—এডিথ কোথায়?'

'প্রসাধন করছে,' কামাল বলল।

জাহাজের ঘটনাগুলো শোনা গেল আতোয়ানের কাছে। সে বলল, 'কার্ল আর ব্রিজম্যান, মানে ড্রেসাররা সন্দেহ করেছিল আমাকে। চ্যালেঞ্জ করেছিল। তাই ওদেরকে সামান্য জখম করতেই হল। এছাড়া গত্যন্তর ছিল না।'

'আলফানস কোথায়?' কুয়াশা প্রশ্ন করল।

'সে এখনও তার ঘরে বন্দী হয়ে আছে।'

এডিথ রেডিও মেসেজ পাঠিয়েছিল কামাল আর ইন্সপেক্টর শার্লসের কাছে। কামাল মেসেজ পায়নি। তার আগেই সে আর শহীদ আতোয়ানের সাথে রওয়ানা দিয়েছে হার্কভিলের উদ্দেশে।

ইন্সপেক্টর হয়ত মেসেজ পেয়েছেন। হয়ত রওয়ানা দিয়েছেন।

কুয়াশা হিসাব করে দেখল সকাল হবার আগে বাইরের হস্তক্ষেপের কোন সম্ভাবনা নেই। সকালে হয়ত ইন্সপেক্টর শার্লস আসবেন তাঁর পুলিস বাহিনী নিয়ে। তার আগেই উদ্ধার করতে হবে জো'র গোপন ধনভাণ্ডারের ঐশ্বর্য। আতোয়ান আর সে এখনি নিচে নেমে যাবে। উপরে থাকবে শহীদ আর কামাল।

'একটা রহস্য কিন্তু অনুদঘাটিতই রয়ে গেল,' আতোয়ানের দিকে তাকিয়ে বলল এডিথ।

'কি রহস্য?'

'জো'র পিছু ধাওয়া করবার একটা নির্দিষ্ট কারণ আমাদের প্রত্যেকের আছে—আমার, এথেলের, কুয়াশার। কিন্তু আপনার কারণটা কি?'

মুখে বেদনার ছাপ ফুটে উঠল আতোয়ানের। সে ধীরে ধীরে বলল, 'উদ্দেশ্য অভিন্ন। আমিও প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলাম আপনাদের মতই। আমিও পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলাম।'

কুয়াশা ২০

প্রথম প্রকাশঃ অক্টোবর, ১৯৬৯

এক

এ ঘটনা ঘটেছিল কুয়াশার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মাস দুয়েক পরে। জরুরী কাজে করাচী গিয়েছিল দিন-দশেক আগে। আজ সে ফিরছে।

কাস্টমসের হাঙ্গামা কাটিয়ে ঢাকার একটা সংবাদপত্র নিল কুয়াশা। খবরটা ছিল প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কলামে। ছত্রিশ পয়েন্ট বোল্ডে হেডিং ঃ কুয়াশার কুকীর্তি। চোখটা গিয়ে পড়ল সেখানেই। দৃষ্টিটা থমকে গেল। কপালটা কোঁচকাল সে। একটু অবাক হয়েই পড়ল খবরটা।

চট্টগ্রাম ডেটলাইনে নিজস্ব সংবাদ-দাতার পাঠানো খবর। দীর্ঘ এক কলাম সংবাদের সারাংশ হলঃ গতকাল ৪ এপ্রিল রাত আটটা নাগাদ ফৌজদারহাটের কাছে একটি জীপের ভিতরে গুলি চালিয়ে কুখ্যাত দস্যু কুয়াশা জানে আলম চৌধুরী নামে এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। চৌধুরী ছিলেন পি. আই. এ.-র সাবেক পাইলট। জীপটির মালিক চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব বেদার বখত এম. এন. এ., টি. কে.। তিনি নিজেই জীপটি চালাচ্ছিলেন। পাশের আসনে ছিলেন জনাব চৌধুরী।

পথে লম্বা-চওড়া এক ভদ্রলোক তাদেরকে গাড়ি থামাতে ইশারা করে। গাড়িটা থামতেই লোকটা এগিয়ে গিয়ে জনাব চৌধুরীর দিকে পরপর তিনবার গুলি করে। একটা গুলি তার বুকে, একটা গলায় ও একটা মাথায় লাগে। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই মারা যান। জনাব বখতের গায়ে গুলি লাগেনি। তিনি জানান, আততায়ী যাবার সময়, 'কুয়াশা এইভাবেই তার কর্তব্য পালন করে', এই কথাগুলো বলে চলে যায়। স্তম্ভিত আতঙ্কিত জনাব বখত কিছুক্ষণ পরে মোটর সাইকেল স্টার্ট দেবার শব্দ শুনতে পান। পরে তিনি লাশ নিয়ে থানায় চলে যান।

নিহত জনাব চৌধুরীর পকেটে একটি চিঠি পাওয়া গেছে। তাতে পত্র-প্রেরক হিসেবে কুয়াশার নাম আছে। চিঠিতে জনাব চৌধুরীর কাছে দশলাখ টাকা দাবি করা হয়েছে এবং ৩০ মার্চের মধ্যে টাকাটা না পেলে তাকে হত্যা করা হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়েছে।

পুলিস ঘটনা সম্পর্কে জোর তদন্ত চালাচ্ছে। সি. আই. ডি.-র সুদক্ষ অফিসার সিম্পসনের উপর এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তের ভার দেওয়া হতে পারে বলে জানা

গেছে। অন্য একটা তদন্ত-কার্য উপলক্ষে তিনি চট্টগ্রাম এসেছেন।

আদ্যোপান্ত খবরটা পড়ে হাসি পেল কুয়াশার। মজা মন্দ নয়। হত্যাকারী তার কুখ্যাতিটুকু নিজের স্বার্থ সিদ্ধির কাজে চমৎকার ব্যবহার করেছে। তার ঘাড়ে সমস্ত দায়িত্ব চাপিয়ে পুলিসের সন্দেহ থেকে মুক্ত হবার অত্যন্ত সহজ পথ বের করেছে। এমন কি তার নাম করে একটা চিঠিও হাঁকিয়েছে। লোকটার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। সাহসেরও। কিন্তু কে এই বুদ্ধিমান বীরপুরুষ? এই নতুন কুয়াশার অভ্যুদয় ঘটল কোথা থেকে? হতভাগ্য জানে আলম চৌধুরীই বা কে? পি. আই. এ.-র পাইলট ছিলেন শুধু এইটুকুই বলা হয়েছে। তার সামাজিক অবস্থানের কোন উল্লেখ নেই। বেদার বখত এম. এন. এ., টি. কে.-র নামটা তার পরিচিত। সাম্প্রতিক খবরের কাগজে বহুল উল্লিখিত নাম। প্রায়ই বিবৃতি হাঁকিয়ে থাকেন।

উন্নয়ন-দশকে যাদের অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে তিনি সেই মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানদের একজন। ভদ্রলোক আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছেন। জনশ্রুতি, ফৌজদারহাটে না কোথায় কতগুলো গরিব চাষীদের উৎখাত করে তাদের জমি-জমা জবর দখল করে প্রায় চল্লিশ একর জমিতে পোলট্রি ফার্ম করেছেন তিনি। সম্ভবত সেটাই তাঁর তমঘায়ে খিদমত খেতাব লাভের পবিত্র কারণ।

সন্দেহ নেই, তার সম্পর্কে হত্যাকারীর এতটুকু ধারণা নেই। শুধু কুখ্যাতিটুকুই তার জানা আছে। তার গতিবিধির খোঁজও লোকটা রাখে না। তবে কাজটা আদপে সে ভাল করেনি। তার নামের আড়ালে নরহত্যা করে সে যে অপরাধ করেছে তার প্রায়শ্চিত্ত যে কি ভয়াবহ তা হয়ত সে কখনও কল্পনাও করতে পারেনি। সে জানে না কুয়াশার ক্রোধ কি ভয়ঙ্কর। সে হয়ত বুঝতে পারেনি। পুলিসকে ভুল পথে পরিচালনা করে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারলেও কুয়াশার রোষানল থেকে সে নিষ্কৃতি পাবে না। আর কুয়াশা তাকে ক্ষমাও করবে না। তার সন্ধান পেতে কতটুকু সময়ই বা লাগবে কুয়াশার! তারপর উদ্যত হবে কুয়াশার অশনি। নিয়তির মত অমোঘ ও নির্মম। ভস্ম হয়ে যাবে সে।

গাড়িতে বসেই কর্মপন্থা স্থির করে ফেলল কুয়াশা। এই বেদার বখত আর জানে আলম চৌধুরীর খোঁজ নিতে হবে। তার জন্যে তার হাতের কাজ আপাতত স্থগিত রেখে চট্টগ্রাম যেতে হবে। আজকেই যাবে সে, চট্টগ্রাম মেলে।

পোর্টিকোতে গাড়ি রেখে দরজা খুলে ড্রইংরুমে ঢুকল কুয়াশা। ডাক দিল, 'মি. ডি. কস্টা।

মি. স্যানন ডি. কস্টা তখন কলিমের জন্য একটা গ্লাসে মেপে তিন ফোঁটা হুইস্কি ঢালছিল। আর বিড়বিড় করে কি বকছিল। দোষটা অবশ্যই কলিমের।

সকাল বেলায় মেজাজ সাধারণত ভালই থাকে মি. স্যানন ডি. কস্টার। নাস্তার টেবিলে গল্প-গুজব হয়। কস্টা সাহেব কলিম ও মান্নানের কাছে তার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে। আজকের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল আলাদা। ইংরেজি-

উর্দু-হিন্দি-বাংলা মেশানো এক অপরূপ ভাষায় সে কি করে মদের বোতলের কর্ক খুলতে হয় তাই বোঝাচ্ছিল।

কিন্তু মেজাজ খিঁচড়ে গিয়েছিল কলিমের। কারণ ছিল দুটো। একঃ স্যানন ডি. কস্টা এই সাত-সকালে নিজেই দুটো বোতল সাবাড় করলেও ওর ভাগ্যে তলানিটুকুও জোটেনি। দুইঃ সকালেই পকেটে হাত দিয়ে দেখে পাঁচটা টাকার একটা নোট খোয়া গেছে। কাজটা যে কস্টা করেছে তা সে জানে। তাই ডি. কস্টার বক্তৃতার ফাঁকে কলিম একটা বেফাঁস মন্তব্য করে বসল।

মি. স্যানন ডি. কস্টা কুয়াশার সর্বশেষ আবিষ্কার—লেটেস্ট ফাইণ্ড। পকেট মারার বিদ্যা রপ্তত করতে ব্যর্থ হয়ে সে সম্প্রতি সিঁদকাটিতে শিক্ষানবিশী করছিল। একদা নওয়াবপুর রোডের রঙ্কু মিঞার দলের লোক ছিল সে। সিঁদকাটিতেও পারদর্শিতা অর্জন করতে না পারায় তাকে দল থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়। পরে সে নিজেই দল গড়ে তোলার চেষ্টা করে। দুটো ছেলেকে তালিম দিতে থাকে। সদলবলে একরাতে হানা দেয় কুয়াশার বাড়িতেই। প্রাঙ্গণে ঢুকেই ধরা পড়ে। তারপর থেকে তিনজনই কুয়াশার পরিবারের সদস্য হয়ে গেছে। ছেলে দুটো অবশ্য এখন আছে এতিমখানায়। স্যানন ডি. কস্টা নাকে খত দিয়েছে, আর কোনদিন সে চুরি করবে না। কিন্তু দীর্ঘদিনের অভ্যাস ও সঙ্গদোষের ফলে পরদ্রব্যকে এখনও সে লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান করতে শেখেনি। সুযোগ পেলেই এটা সেটা হাতড়াবে। পকেট মারবে। মান্নান ও কলিম বিরক্ত হয়। কুয়াশা হেসে বলে, 'ও ঠিক হয়ে যাবে। তবে দেখিস; বাইরে যেন কোথাও কিছু না করে বসে।'

সেদিকেও লক্ষ্য রাখে মান্নান ও কলিম। রাতে ডি. কস্টাকে তার রূমে তালাচাবি বন্ধ করে রাখে। তখন আবার তাকে গানে পেয়ে বসে এবং সেই সঙ্গীত-চর্চায় শান্তিপ্রিয় পড়শীদের জিঘাংসাবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলার আশঙ্কা থাকে বলে কয়েকটা বোতল দিয়ে ঠাণ্ডা রাখতে হয় ডি. কস্টাকে। বোতলগুলো শেষ হতেই সে নেশায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে। মদের বোতল অবশ্য এখন সে নিজেই বের করে নেয় সেলার থেকে। প্রভুর (যীশু নয় কুয়াশা) বিবেক ও স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতি তার যে একটা বিরাট কর্তব্য আছে সেটা আবিষ্কার করার পর থেকেই সেলারের চাবিটা সে হাতিয়ে নিয়েছে।

বয়স পঁয়ত্রিশের মত। লম্বা। হাড্ডিসার। চোয়ালভাঙা মুখটায় গোঁফ-দাড়ির চিহ্নও নেই, আছে শুধু পাউডারের উদার ব্যবহার। কদম-ছাঁট চুলে তেলের পরিমাণও অকৃপণ। রংটা আবলুস কাঠের মত কালো। সর্বদাই প্যান্ট-শার্ট-টাই পরে থাকে। রাজার জাত বলে নেটিভদের মত লুঙ্গি সে পরতে পারে না। কুয়াশার স্যুটগুলোও পরে মাঝে মাঝে। কোমরে দড়ি বাঁধতে হয় বলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আজকাল ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু না পরলেও স্যুটের পকেটগুলো ঠিকই হাতড়ায়। শেষটায় কুয়াশার রূমে সে যাতে ঢুকতে না পারে সেই ব্যবস্থা করতে হয়েছে

মান্নানকে। তার উপর তাই সর্বদাই চটে আছে ডি. কস্টা। কিন্তু কুয়াশার কাছে নালিশ ঠুকতে সাহস পায় না। মান্নান জানিয়ে দিয়েছে, 'বেশি গোল করলে সেলারের চাবি কেড়ে নেবে। ভাবনার কথা।'

রাজার জাত বলে মিস্টার না বললে রুষ্ট হয় ডি. কস্টা। কিন্তু কলিমের ধারণা ওকে কেষ্টা ব্যাটা ছাড়া আর কোন সম্বোধন করা উচিত নয়। কিন্তু তাতে করে সে ঝগড়াটে বুড়িদের মত পাড়া মাতিয়ে চিৎকার করবে এই আশঙ্কায় তাকে বড় একটা ঘাঁটায় না। মাঝে মাঝে অল্প-স্বল্প চটিয়ে দিয়ে মজা করে।

টাকাটা মার যাওয়াতে মেজাজটা অপ্রসন্ন ছিল কলিমের। তারপর ঝাড়া একঘন্টা বক্তৃতা শুনেছে ডি. কস্টার। কিন্তু ছেঁদো কথায় তো আর গ্লাস ভরে না। সুতরাং সে জুৎসই মুহূর্তে কথাটা উচ্চারণ করল, 'কেস্টা ব্যাটাই চোর।'

ঠোঁটের কাছে গ্লাস তুলেছিল ডি. কস্টা। চুমুক না দিয়ে আস্তে আস্তে গ্লাসটা নামাল। তারপর চোখ-মুখ পাকিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বলল, 'কি বললি? অ্যাঁ, কি বললি? টোর মাঠাটা হামি ভেঙে ডেয়েগা। ইনটু টু পার্টস।'

'তাই নাকি? কি দিয়ে রে? বোতল দিয়ে?'

'ঘুসি মেরে। মাই ফিস্ট ভেরী স্ট্রং। ডু ইউ নো ড্যাট?' টেবিলের উপর একটা ঘুসি বসাল ডি. কস্টা। আর্তনাদ করে উঠল বাসনপত্রগুলো।

স্ট্রাটেজী বদলাল কলিম। বিড়ালের মত মিউ মিউ করে বলল, 'সর্বনাশ, বলেন কি, ইওর অনার। আমার মাথাটা—অ্যাঁ!' হাত জোড় করল কলিম। 'এইবারটা মাফ করে দিন, ইওর অনার। আমার তো আপনার মত মজবুত মাথা নয় যে, একটা আস্ত থান ইট গুঁড়ো হয়ে যাবে।'

ঘটনাটা একদিন ডি. কস্টাই বলেছিল সগর্বে। সে নাকি একবার ইউনিভার্সিটির এক হলে চুরি করতে গিয়েছিল। রাতে নয়। দিনের বেলায়। কে একজন দেখে ফেলায় পালিয়ে যাচ্ছিল। ছাদের উপর থেকে আস্ত একটা থান ইট ছুঁড়ে দিয়েছিল একজন। সোজা মাথার উপর পড়েছিল ইটটা। খানখান হয়ে ভেঙে পড়েছিল। মাথায় একটু আঁচড়ও লাগেনি। মাত্র তিনহাত দূরে ছিল নিকটতম অনুসরণকারী। ইটের একটা কনা নাকি তার মাথায় লেগে দরদর করে রক্ত ঝরেছিল।

আত্মগর্বে স্ফীত হল ডি. কস্টা। বলল, 'টবেই ড্যাখ, অঠচ আমার হাটের একটা ঘুসি খেলে টোর মাঠার খুলিটা টু পার্টস হয়ে যাবে।'

'কি যে বলেন, কেষ্ট সাহেব? মাত্র...'

'ফের, কলিম।' চোখ পাকাল ডি. কস্টা।

'থুক্কু, বস্, আর কোনদিন ভুল হবে না। এইযে নাক মলছি, কান মলছি। বলছিলাম কি, আপনার হাতের ঐ ঘুসি খেলে মাথাটা শুধু টু পার্টস নয়, মেনি পার্টস হয়ে যাবে। কে যেন বলছিল, আপনি নাকি গ্লাভস ছাড়াই চমৎকার বক্সিং

করতে পারেন।'

প্রসন্ন হল ডি. কস্টা। একটু সন্দেহও হল। বলল, 'ঠাট্টা করছিস? জোকিং?'

'কি যে বলেন, স্যার, আপনি হচ্ছেন গিয়ে আমাদের বস্। কি বলিস মান্নান? আর আপনার সাথে ঠাট্টা করব! আমার জিভ খসে পড়বে না!'

'হ্যাঁ। মনে রাখিস সে কথা। কুয়াশা হচ্ছে আমার যাকে বলে বনচু। টোরা কি মনে করিস সে আমার বস্—প্রভু? উঁহু, প্রভু নয়, বনচু। রিমেমবার। কিরে, একটু খাবি না কি?'

'প্রভুর প্রসাদ পেতেই তো বসে আছি।'

কিন্তু প্রসাদ আর পাওয়া গেল না। মেপে মেপে তিন ফোঁটা ঢালল ডি. কস্টা একটা গ্লাসে। এমন সময় কুয়াশার কণ্ঠ শোনা গেল। ডি. কস্টা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'ইয়েস, বস্, কামিন।'

পড়ি কি মরি করে দৌড় দিল সে একহাতে গ্লাস অন্য হাতে বোতল নিয়ে

দুই

মি. সিম্পসন চট্টগ্রামে ছিলেন না। জানে আলম চৌধুরী যেদিন খুন হল সেদিনই সকালে তদন্ত উপলক্ষে গিয়েছিলেন কক্সবাজারে। তাঁকে টেলিফোনে খবর দিয়ে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানানো হল চট্টগ্রামে ফিরে আসবার। চট্টগ্রাম পুলিস-কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রামে কুয়াশার উপস্থিতিতে উদ্বিগ্ন বোধ করছিলেন। বড় বড় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরাও অস্বস্তি বোধ করছিলেন। কে জানে, কুয়াশা কখন কার দিকে নজর দেয়। তাঁরাই পুলিস কর্তৃপক্ষকে আরও বেশি সক্রিয় হবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকে। জানে আলম চৌধুরীর হত্যাকাণ্ডের তদন্তে তথা কুয়াশাকে গ্রেফতারের চেষ্টা করার জন্য মি. সিম্পসনের উপর দায়িত্ব আরোপের অনুরোধ জানায়। সবচেয়ে বেশি আগ্রহ দেখান বেদার বখত সাহেব। বন্ধুর শোচনীয় মৃত্যুতে তিনি ভয়ানক মুষড়ে পড়েছেন।

অতএব মি. সিম্পসনকে ফিরতেই হল চট্টগ্রামে। সেই দিন পারলেন না। এলেন পরের দিন। বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে গেলেন থানার দিকে।

ড্রাইভার মোসলেম আলী জীপ চালাচ্ছিল। মি. সিম্পসন পাশের আসনে। কর্মব্যস্ত রাস্তার দিকে আনমনে তাকিয়েছিলেন তিনি।

অনেকটা পথ ঘুরে জীপটা থানার কাছে গিয়ে পৌঁছুল। উল্টোদিক থেকে সাদা একটা ফোক্সওয়াগেন আসছিল। সেদিকে দৃষ্টি পড়তেই চমকে গেল মোসলেম আলী। অস্ফুট একটা ধ্বনি করে মি. সিম্পসনের দিকে তাকাল সে। ফোক্সওয়াগনটা সাঁ করে পাশ দিয়ে চলে গেল পেছন দিকে।

ব্রেক কষল মোসলেম আলী।

মি. সিম্পসন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন তার দিকে। প্রশ্ন করলেন, 'কি ব্যাপার, আলী মিঞা?'

'স্যার, মানে…।'

'কিছু বিগড়ে গেছে নাকি?'

'না, স্যার, একটা লোক। অবিকল আপনার মত দেখতে।'

'আমার মত দেখতে!' বিস্মিত হলেন মি. সিম্পসন।

'হ্যাঁ, স্যার, আমি নিজের চোখে দেখেছি। একটা ফোক্সওয়াগেনে ছিল। আমার এতটুকু ভুল হয়নি।'

'বল কি, হে?' সন্দেহ প্রকাশ করলেন তিনি তবুও।

'তাহলে আর বলছি কি, স্যার?'

'হুঁ।'

'গাড়ি ফেরাব, স্যার, দেখব একবার?'

'না। থানায় চল।'

ড্রাইভার বোধহয় মি. সিম্পসনের সিদ্ধান্তটায় সন্তুষ্ট হল না। সে বলল, 'বেশিদূর হয়ত যেতে পারেনি। রাস্তা ভাল না।'

'কোন লাভ হবে না।'

মোসলেম আলী অগত্যা থানার দিকেই গাড়ি ছোটাল।

মি. সিম্পসন ভাল করেই জানেন এই ভাবে নকল সিম্পসনকে অনুসরণ করে লাভ নেই। সন্দেহ নেই, কুয়াশা ছাড়া আর কারও পক্ষে এমন নিখুঁত ছদ্মবেশ ধারণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু তার ছদ্মবেশে কোথায় গিয়েছিল কুয়াশা? নিশ্চয়ই থানায়। কিন্তু সেখানেই ব যাবে কেন? কিসের সন্ধানে? কোন তথ্য প্রমাণ গায়েব করার জন্যে নয় তো? ও ছাড়া আর কি হতে পারে? থানাসুদ্ধ সবাইকে বোকা বানিয়ে নিশ্চয়ই সে তার কাজ হাসিল করে গেছে।

থানার বারান্দায় গিয়ে জীপ থামল। মি. সিম্পসন নামলেন গাড়ি থেকে। অফিসার-ইন-চার্জ সোবহান আখন্দ কি কারণে করিডরে এসেছিলেন। মি. সিম্পসনের মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। এগিয়ে এসে বললেন, 'আবার ফিরলেন যে, স্যার?'

ম্লান হাসলেন মি. সিম্পসন। বললেন, 'আবার এলাম মানে! এই তো সবে আসছি। আসুন, জরুরী কথা আছে।'

হতভম্ব সোবহান আখন্দ মি. সিম্পসনের পিছনে পিছনে নিজের রুমে ফিরে এলেন।

সামনাসামনি দুটো চেয়ারে বসলেন দু'জন। মি. সিম্পসনের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

সিগারেট ধরালেন মি. সিম্পসন। তারপর ধীরে ধীরে পথের ঘটনাটা বললেন।

শেষে যোগ দিলেন, 'আমার ছদ্মবেশ ধরে লোকটা যে থানাতেই তশরীফ এনেছিল এখন তা স্পষ্টই বুঝতে পারছি।'

অফিসার-ইন-চার্জ সোবহান আখন্দের অনেকক্ষণ বাক্‌স্ফূর্তি হল না। অবাক দৃষ্টি মেলে মি. সিম্পসনের দিকে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর বললেন, 'এ যে অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে, স্যার। দিনে দুপুরে এমনভাবে ছদ্মবেশ পরে দিব্যি থানায় এসে বোকা বানিয়ে গেল, স্যার। কিন্তু জানেন, স্যার, সত্যি কথা বলতে কি আমার একটু সন্দেহ হয়েছিল।'

'সন্দেহ হয়েছিল? তাই নাকি? কি সন্দেহ করেছিলেন? এখন আবার আমাকে সন্দেহ করছেন নাকি?'

'স্যার, কি যে বলেন। আপনাকে সন্দেহ! আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না, স্যার?' বিব্রত হয়ে প্রশ্ন করলেন সোবহান আখন্দ।

'কি কাজ?'

'এখুনি আমরা বেরিয়ে পড়ি লোকটার খোঁজে। যে গাড়িতে করে লোকটা এসেছিল, আমি চিনতে পারব, স্যার। ঐ যে কচ্ছপের মত দেখতে। ভক্স-ওয়াগন। সাদা রংয়ের। নম্বরটা, স্যার···এই যা! একবার মনে হয়েছিল, নম্বরটা টুকেই ফেলি। তবে গাড়িটা বোধহয় চট্টগ্রামের না, ঢাকার, না স্যার, চট্টগ্রামের গাড়ি। কি বলেন স্যার, তাহলে এখনি বেরিয়ে পড়ি, গাড়িটার খোঁজ করতে?' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন শেষ কথাগুলো।

'তাতে কি লাভ হবে, বলুন? কোথায় কোন পথে গাড়ি গেছে কে জানে? সাদারংয়ের ফোক্সওয়াগেনের অভাব আছে নাকি চট্টগ্রাম শহরে!' বিরক্তি চেপে গম্ভীর মুখে বললেন মি. সিম্পসন।

'তাও বটে।' মাথা চুলকাতে লাগলেন আখন্দ সাহেব, 'কিন্তু স্যার, এই যে লোকটা আপনার ছদ্মবেশে এসেছিল, সে কে তা মোটেও বুঝতে পারছি না। আর আপনার কি মনে হয়?'

'সম্ভবত কুয়াশা নিজেই এসেছিল অথবা তার কোন অনুচর পাঠিয়েছিল।'

'তাই হবে। আমারও তাই মনে হয়েছিল।'

'অবশ্য সম্পূর্ণ অন্য লোকও হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই, স্যার। তাও হতে পারে।'

'আপনি কি করে বুঝলেন?'

'আমি, না মানে, স্যার, যতদূর মনে হয়, স্যার।' মাথা চুলকাতে লাগলেন আখন্দ সাহেব।

মি. সিম্পসন বললেন, 'আপনাকে আর কষ্ট করে ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করতে হবে না। কষ্টটুকু আমিই করব না হয়। এখন আমি যা বলি তাই শুনুন। বসুন আপনি।'

বসলেন আখন্দ সাহেব, ধপ করে।

'লোকটা কি কোন কাগজপত্র নিয়ে গেছে?'

'মোটেও না, স্যার। আমাকে কি এত কাঁচা ছেলে বলে মনে করেন। টুয়েন্টি ইয়ার্স এক্সপেরিয়েন্স ইন পুলিস সার্ভিস। আমি কি কোন কাগজপত্র নিতে দিই। বললুম না, স্যার, আমার তখুনি সন্দেহ হয়েছিল। এসে চাইল আর দিলুম। আমি কি, স্যার, অতটাই বোকা?'

'তার মানে, নিতে চেয়েছিল।'

'না, স্যার। নিতেও চায়নি। তবে সব কাগজপত্র দেখেছে। ময়না তদন্তের রিপোর্ট, এজাহারের কপি, তদন্তের বিবরণ। জানে আলম চৌধুরীর পকেটে পাওয়া চিঠিটা আর আর, চোরাচালান ও জালিয়াতি সম্পর্কে যে গোপন ফাইল আছে সেটাও দেখেছে। অবশ্য ফাইলটা গোপনীয় হলেও ওতে কোন গোপন কথা নেই, স্যার। শুধু দুচারটে ইন্সট্রাকশন আছে। তাই দেখতে দিতে আপত্তি করিনি।'

'লোকটা কি মি. চৌধুরীর পকেটে পাওয়া চিঠিটা হাতে নিয়েছিল?'

'না, স্যার। আমি ভাঁজ খুলে টেবিলে রেখেছিলুম, স্যার।'

'প্রশ্ন করেছিল কিছু লোকটা?'

'হ্যাঁ, স্যার, অনেক।'

'যেমন?'

'লোকটা কিভাবে খুন হয়েছে? কবে, কখন, কোথায়? কে কে দেখেছে, লাশ থানায় এনেছিল কে? নিহত লোকটার পরিচয় কি? বাড়ি-ঘর, আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কেও জানতে চাইল। ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার সোনার চোরাচালান সম্পর্কেও অনেক প্রশ্ন করল, স্যার। জালিয়াতদের সম্পর্কে নতুন কিছু জানা গেছে কিনা জানতে চাইল। আসলে, স্যার, খুনের কেসটার চাইতেও সোনা চোরাচালান আর জালিয়াতি সম্পর্কেই দেখলাম লোকটার উৎসাহ বেশি।'

'হুঁ। সেটাই স্বাভাবিক।' মন্তব্য করলেন মি. সিম্পসন। 'যাক। কোন কাগজপত্র খোয়া যায়নি তো?'

'না, স্যার। একটাও না।'

'বেশ, এখন কাগজপত্রগুলো সব আমাকে দিন। সেই চিঠিটা কোথায়? জানে আলম চৌধুরীর পকেটে পাওয়া চিঠিটা?'

ড্রয়ার খুলে কনফিডেনশিয়াল চিহ্নিত একটা ফাইল বের করলেন আখন্দ সাহেব। সেটা মি. সিম্পসনের দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে বললেন, 'স্যার, সমস্ত কাগজপত্র এখানটায় আছে। জালিয়াতি আর সোনা চোরাচালানের কেসের ফাইলও দেব নাকি, স্যার?'

'দিতে পারেন। সব কাগজপত্রই আমার অফিসে আছে। কিন্তু সেই ছদ্মবেশী লোকটার এ ব্যাপারে উৎস্যাহের কি কারণ আছে ঠিক বুঝতে পারছি না। লোকটা

যদি কুয়াশাই হয় তাহলে হঠাৎ করে এতে তার উৎসাহের কি কারণ থাকতে পারে, ফাইল দেখলে হয়ত তা বোঝা যেতেও পারে।'

অফিসার-ইন-চার্জ উঠলেন। লকার খুলে পেট মোটা দুটো ফাইল এনে টেবিলের উপর রাখলেন। মি. সিম্পসন তখন খুনের কেসের ফাইলে মনোনিবেশ করেছেন।

৪ এপ্রিল রাত আটটায় মারা গেছেন জানে আলম চৌধুরী। ময়না তদন্তে বলা হয়েছে সন্ধ্যা ছ'টা থেকে রাত দশটার মধ্যে গুলি লেগেছে। হৃৎপিণ্ড ভেদ করে একটা গুলি বেরিয়েছে। একটা গলার ভিতর দিয়ে বেরিয়েছে। অন্যটা কানের ভিতর দিয়ে ঢুকে মাথার খুলি ভেঙে বেরিয়ে গেছে। মৃত্যু হয়েছে সঙ্গে সঙ্গেই।

লাশ নিয়ে থানায় এসেছেন বেদার বখত। বখত পোলট্রি ফার্মের মালিক। এজাহারও দিয়েছেন তিনিই।

'এই বেদার বখত সাহেবটা কে?'

'অত্যন্ত গণ্যমান্য লোক, স্যার। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলীর মেম্বার। বিরাট বড়লোক। ফৌজদারহাটে বিরাট পোলট্রি ফার্ম। তাঁর গাড়িতে চট্টগ্রাম শহরের দিকে আসছিলেন জানে আলম চৌধুরী।'

'বখত সাহেব লোক কেমন?'

'চমৎকার লোক, স্যার। কি অমায়িক ব্যবহার। দিল দরিয়া মেজাজ। আমাকে যা খাতির করে কি আর বলব, স্যার।'

'হুঁ। আর এই জানে আলম চৌধুরীর হোয়্যার এবাউট কিছু জানা আছে? তদন্তকালে জানা গেছে কিছু?'

'অতি সামান্য, স্যার।' গড়গড় করে বলে গেলেন আখন্দ সাহেব। যা বললেন তার সার সংক্ষেপ হলঃ ভদ্রলোকের আদিবাড়ি বাংলাদেশে হলেও শৈশব তাঁর কেটেছে বার্মায়। বাংলাদেশেই আছে চোদ্দ-পনের বছর। বাপ-মা বাংলাদেশী বলে নতুন করে নাগরিকত্ব নিতে হয়নি। অবশ্য জন্মও হয়েছে বাংলাদেশেই। দিনাজপুর ছিল পিতামাতার আদি-ভিটা। পি. আই. এ.-তে পাইলট ছিলেন। বাপ-মা গত হয়েছেন কয়েক বছর আগে। বিয়ে করেছিলেন। স্ত্রীর সাথে বনিবনা হয়নি। তালাক হয়নি অবশ্য। কিন্তু সম্পর্ক নেই। ভদ্রমহিলা ঢাকাতে থাকেন। এখন এখানেই আছেন। স্বামীর মৃত্যুর খবর পেয়ে এসেছেন। তিনিই লাশ নিয়ে গিয়েছেন দাফনের জন্য।

'ঠিকানাটা নিশ্চয়ই রেখে গিয়েছেন, তিনি?'

'হ্যাঁ, স্যার। ডেডবডি ডিসপোজাল অর্ডারে ঠিকানা আছে।'

'মি. চৌধুরী কি করতেন?'

'পি. আই. এ.-র চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসার ধান্দায় ছিলেন, স্যার। বখত সাহেবের বন্ধু। বোধহয় উনিই টাকা পয়সা দিয়েছিলেন।'

সোনা চোরাচালানের আর জালিয়াতি কেসের নথিপত্রগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লেন মি. সিম্পসন। চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে গত এক বছরেই এককোটি টাকার সোনা চোরাচালান হয়েছে। কুয়াশা হয়ত সেই এককোটি টাকার খোঁজে এসেছে। এছাড়া অন্য কি কারণ থাকতে পারে কুয়াশার এ ব্যাপারে উৎসাহিত হবার, ভেবে পেলেন না তিনি।

তিন

বখত সাহেবের পোলট্রি ফার্মটা বঙ্গোপসাগরের তীরে বন এলাকায়। ফৌজদারহাটের শেষ প্রান্তে। সড়ক থেকে দুই ফার্লং দূরে। ফার্মের পয়সা‍‍য় তৈরি একটা রাস্তা সড়ক ও ফার্মের মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেছে। রাস্তার মাথায় প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড। লেখাঃ 'বখত পোলট্রি ফার্ম'। নিচে একটা ছোট সাইনবোর্ড। তাতে লেখাঃ 'প্রাইভেট রাস্তা, বিনানুমতিতে প্রবেশ নিষেধ।' সংযোগ পথের দু'ধারে কাঁটাতারের বেড়া। দু'পাশে ঘন জঙ্গল। বন থেকে শুধুমাত্র কাঠবিড়ালী ছাড়া আর কারও সেই বেড়া ভেদ করে রাস্তার উপর ওঠার সাধ্য নেই।

প্রাইভেট রাস্তাটা কর্ম মুখর। সারাদিন ট্রাক যাতায়াত করছে। গেটে চব্বিশ ঘন্টা বন্দুকধারী দারোয়ান মোতায়েন। বিনানুমতিতে কেউ গেট পর্যন্ত আসতে পারলেও দারোয়ান কাউকে ফটক পার হতে দেয় না। এ ব্যাপারে মালিকের কড়া নির্দেশ আছে। কিন্তু ফার্মে যারা যাতায়াত করে তারা সবাই দারোয়ানদের চেনা। তাই মালিকের কঠোর নির্দেশ সত্ত্বেও কড়াকড়িটা শিথিল।

গেট পেরোলেই একতলা অফিস-ভবন। আকারটা ইংরেজি 'ই' হরফের মত। সামনের সুন্দর বাগান বখত সাহেবের সুরুচির পরিচয় দিচ্ছে। বামবাহুটা গেস্ট হাউজ। ডানবাহুটা রিসার্চ ল্যাবরেটরি।

অফিস-ভবনের পিছনে ছাদ-সমান উঁচু প্রাচীর। উপরে কাঁটা তারের বেড়া। প্রাচীরের উপর দিয়ে উঁকি দিচ্ছে অনেকগুলো সেগুন গাছ। মূল ফার্মের শুরু এই প্রাচীর থেকেই। সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর বেদার বখত মি. সিম্পসনের সাথে কথা বলছিলেন। জানে আলম চৌধুরীর হত্যা সম্পর্কে তদন্ত করতে এসেছেন তিনি।

বখত সাহেব লম্বা-চওড়া মানুষ। দোহারা গড়ন। মুখটা চৌকোণা। চোখ দুটো ছোট ছোট। চোখের কোনায় লালচে রং। চুল ছোট করে কাটা। থুতনির নিচে সামান্য দাড়ি। পান-দোক্তার বদৌলতে দাঁতগুলো কালো। তবে সামনের দাঁত দুটো সোনা দিয়ে বাঁধানো। গায়ে কালো রংয়ের শেরোয়ানী।

অনুচ্চ, শোকার্ত কণ্ঠে তিনি জানে আলম চৌধুরীর হত্যা পরিস্থিতি বর্ণনা করছিলেন।

তিনি বললেন, 'যেন একটা অবিশ্বাস্য ভোজবাজির মত ঘটনাটা ঘটে গেল। আমি বিস্ময়ে, আতঙ্কে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম। বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে বসেছিল। কি হয়ে গেল তা যেন আমার স্নায়ুমণ্ডলিতে কোন চেতনা সৃষ্টি করতে পারছিল না। সংবিৎ যখন ফিরে পেলাম তখন সব শেষ।' একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন বখত সাহেব।

'তারপর?' প্রশ্ন করলেন মি. সিম্পসন।

'সোজা থানায় চলে গেলাম।'

'হাসপাতালে গেলেন না?'

'জানে আলমের দেহ তখন স্থির হয়ে গেছে। হাসপাতালে গেলে কোন লাভ হত না।'

'তা বটে। গাড়িতে আপনারা দু'জনেই ছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

একটা সিগারেট ধরালেন মি. সিম্পসন। কয়েকটা টান দিয়ে বললেন, 'যেহেতু নিহত চৌধুরী সাহেব আপনার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন তাই তাঁর হত্যাকাণ্ড তদন্তে আপনার সহযোগিতা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া একমাত্র আপনিই ছিলেন অকুস্থলে। হত্যাকাণ্ডটা ঘটেছে আপনার চোখের সামনেই। আশা করি, আপনার আপত্তি নেই আমাদের সহযোগিতা করতে?'

'আপত্তি! বলেন কি, মি. সিম্পসন? এ তো আমার সৌভাগ্য। সব রকম সহযোগিতা আমি সাগ্রহে করব। এই শয়তানটা মানে কুয়াশাকে ধরার ব্যাপারে আমি যথাসাধ্য সহায়তা করব।' জোর দিয়ে কথাগুলো বললেন বখত সাহেব।

সিম্পসন সাহেব মৃদু হাসলেন। সিগারেটে একটা টান দিয়ে বললেন, 'আপনি বোধহয় ধরে নিয়েছেন, কুয়াশাই খুন করেছে?'

বখত সাহেব পান মুখে দিতে যাচ্ছিলেন। পান দুটো তাঁর হাতেই রইল। একটু অবাক হয়েই মি. সিম্পসনের মুখের দিকে তাকালেন তিনি। বললেন, 'আপনার কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, মি. সিম্পসন। আপনি কি বলতে চাচ্ছেন কুয়াশা জানে আলমকে খুন করেনি?'

'না, আমি ঠিক তা বলতে চাই না। কথাটা হল, কুয়াশাই যে হত্যা করছে তার কোন কনক্লুসিভ এভিডেন্স, মানে নির্ভুল প্রমাণ নেই।'

'কেন কেন?' উত্তেজিত হলেন বখত সাহেব। 'স্পষ্ট প্রমাণ আছে। কুয়াশার চিঠি পাওয়া গেছে জানে আলম চৌধুরীর পকেটে। তাছাড়া হত্যাকারীর কথাগুলো তো আমি নিজের কানে শুনেছি। জানে আলমকে গুলি করে লোকটা চলে যাবার সময় বলে গেল, কুয়াশা এই ভাবেই তার কর্তব্য পালন করে। এর পরেও কি সন্দেহের অবকাশ আছে, মি. সিম্পসন? আশা করি আমার কথা আপনি অবিশ্বাস করবেন না?'

'সে প্রশ্ন ওঠে না। আপনার ইনটেগ্রিটি সম্পর্কে কোন প্রশ্ন না তুলেও বলা যায় যে, কুয়াশাই এই হত্যাকাণ্ড করেছে কিনা তা প্রমাণ অথবা অপ্রমাণ করার জন্য আরও তথ্য প্রয়োজন।'

'মনে হচ্ছে আপনার মনে খট্‌কা আছে,' বখত সাহেব বললেন।

'নিশ্চয়ই আছে। আর তার সঙ্গত কারণও আছে। সেইটাই তো হয়েছে অসুবিধা,' ভাবনাজড়িত কণ্ঠে বললেন মি. সিম্পসন।

অনেকক্ষণ দু'জনের কেউ কোন কথা বললেন না। সিম্পসন সাহেব অ্যাশট্রেতে সিগারেটের শেষাংশটা ফেলে দিলেন। ছ্যাঁৎ করে একটা শব্দ হল। বখত সাহেব দুটো পান মুখে দিয়ে কিছুক্ষণ চিবিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। পিক ফেলে এসে বসলেন আবার। বললেন, 'শুনেছি, কুয়াশা নাকি অত্যন্ত চতুর। কেউ তাকে আজ পর্যন্ত দেখেনি। ধরা তো দূরের কথা।'

'ওসব গুজব। তবে এখন পর্যন্ত যে তাকে গ্রেফতার করা যায়নি এটা সত্য কথা। কিন্তু চিরটা কাল তো আর সে পুলিসের চোখে ধুলো দিতে পারবে না। একদিন তাকে ধরা দিতেই হবে। সে যাক। এখন দয়া করে সেদিনের ঘটনা সম্পর্কে আর একটু আলোকপাত করুন।'

'বলুন।'

'হত্যাকাণ্ডটা ঠিক ক'টায় হয়েছিল?'

'রাত আটটার দিকে।'

'ঘড়ি দেখেছিলেন?'

'এখান থেকে আমরা যখন বেরিয়েছি তখন আটটা বাজতে মিনিট ছয়েক বাকি ছিল?'

'খুনী কি একা ছিল?'

'শুধুমাত্র তাকেই তো দেখেছিলাম।'

'রাস্তায় অন্য কোন যানবাহন ছিল না?'

'সাধারণত থাকে—কিন্তু সেদিন ছিল না।'

'একটু বর্ণনা করুন ঘটনাটা।'

'গাড়ি চালাচ্ছিলাম আমি নিজে। ফার্মের জীপটা চালাচ্ছিলাম। ড্রাইভার একজন ছিল ছুটিতে আর দুজন অন্য দুটো গাড়ি নিয়ে শহরে গিয়েছিল। পথে দু-একটা গাড়ি যে দেখিনি, তা নয়। কয়েক মিনিট ধরে গাড়ি চালাবার পর দেখি, একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে পথের উপরে। গাড়ির আলোটা সরাসরি লোকটার গায়ে গিয়ে পড়েছিল। অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে আশঙ্কা করে স্পীড কমিয়ে দিলাম তখুনি। দেখলাম, লোকটা হাত দিয়ে গাড়ি থামাবার ইঙ্গিত করছে পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। ওর কাছে গিয়ে গাড়ি থামালাম। লোকটা আমার দিকে এল না। গাড়ির সামনে দিয়ে ঘুরে জানে আলম চৌধুরীর দিকে তাকাল। মনে হল, কিছু

বলবে। কিন্তু না, পরপর তিনবার পিস্তলের আওয়াজ হল। চৌধুরীর আর্তনাদও শুনতে পেলাম সঙ্গে সঙ্গে। পড়ে গেল আমার গায়ের উপর। ভাবলাম, এবার হয়ত আমার পালা। কিন্তু তখন আমি চিৎকার করার সাহসটুকুও হারিয়ে ফেলেছি। লোকটা গুলি করে দাঁড়াল না। চলে গেল। যাবার সময় বলে গেলঃ কুয়াশা এই ভাবেই তার কর্তব্য পালন করে।'

'কোনদিকে গেল, লোকটা?'

'পিছন দিকে গেল বলেই মনে হল। একটু পরেই মোটর সাইকেলে স্টার্ট দেবার আওয়াজ পেলাম, পিছন দিকে।'

'লোকটাকে ভাল করে দেখেছেন?'

'না, তেমন দেখতে পাইনি। তবে বেশ লম্বা-চওড়া।'

'পরনে কি ছিল?'

'প্যান্ট আর শার্ট।'

'আপনি কি দৈনিক ঐ সময়েই ফার্ম থেকে বেরোন? মানে, রাত আটটার দিকে?'

'না—না। কোন ঠিক নেই।'

'সেদিন কখন চৌধুরী সাহেব আপনার ফার্মে গিয়েছিলেন?

'বিকেল পাঁচটার দিকে। আমিই ডেকে পাঠিয়েছিলাম। কিছু অর্ডার ছিল আমার। গাড়িও পাঠিয়েছিলাম। সেই গাড়িতেই এসেছিল এখানে।'

'ওর সাথে আপনার আলাপ কতদিনের?'

'আমরা দু'জনেই রেঙ্গুনে মানুষ। শৈশব কাটিয়েছি সেখানেই। বয়সে অবশ্য আমার চাইতে ও বছর দশেকের ছোট। বরাবরই আমি ওকে স্নেহের চোখে দেখতাম। চৌধুরীও আমাকে বড় ভাইয়ের মতই দেখত। মাঝখানে অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। করাচীতে বীচলাক্সারী হোটেলে আকস্মিকভাবে দেখা হল। ও তখন পি. আই. এ.-তে পাইলট। পুরানো সম্পর্কটা আবার ঝালিয়ে নিলাম।'

'চৌধুরী সাহেব পি. আই. এ.-র চাকরি ছেড়েছেন কবে?'

'বছর দুয়েক হবে।'

'পরে কি করতেন?'

'ব্যবসার ধান্ধায় ছিল। এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের একটা ফার্ম করেছিল। টাকাটা দিয়েছিলাম আমিই। সবটা নয় অবশ্য।'

'তাহলে উনি খুব বিত্তশালী ছিলেন না?'

'মোটেও না। সামান্য পুঁজি।'

'হুঁ। শুনেছি ভদ্রলোকের ব্যক্তিগত জীবন নাকি সুখময় ছিল না।'

'স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ভাল ছিল না। দোষটা, আমি যতদূর জানি, জানে আলমের নয়। সেই মহিলারই। তিনি হচ্ছেন আর্টিস্ট। নাম শুনেছেন বোধহয়। সীমা

চৌধুরী। এক্সিবিশনও করেছেন কিছুদিন আগে। কিন্তু ভীষণ দাম্ভিক। আমাদের মত ব্যবসায়ী মানুষদের গেরাহ্যির মধ্যে আনে না। বলে, আমরা নাকি সব রাস্টিক গেঁয়ো। স্বামীটাকেও ঐ রকম অশ্রদ্ধার চোখেই দেখত। আমি বলেছিলাম, আমার একটা পোর্ট্রেট করে দিতে। কানেই তুলল না।'

'এটাই বুঝি তাঁর উপর আপনার রাগের কারণ?' মৃদু হাসলেন মি. সিম্পসন।

'না না, তা হবে কেন? তাছাড়া এখন রাগ করার কোন মানেই হয় না! হাজার হলেও সে আমার বউমার মত। ওকে তো আমিই খবর দিয়েছিলাম। এখানে আসবার জন্য ঢাকায় ওর কাছে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলাম। মৃতদেহের সৎকারের দায়িত্ব তো ওরই। এখনও সে চট্টগ্রামেই আছে। আপনি নিশ্চয়ই তার সাথে দেখা করবেন?'

মাথা নাড়লেন মি. সিম্পসন। তারপর বললেন, 'ছাড়াছাড়িটা হয়েছে কবে?'

'মাস ছয়েক হবে। ঠিক ছাড়াছাড়ি নয়। মানে তালাক হয়নি। জানে আলম বেঁচে থাকলে পরে কি হত বলা যায় না।'

'এসব নিয়ে আপনার সাথে কখনও কোন আলাপ হয়েছে?'

'কক্ষণো না। ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সে আমার সাথে কখনোই আলোচনা করত না।'

'মি. চৌধুরী খুন হবার আগে তার মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা দেখেছেন?'

'কয়েকদিন ধরে একটু চঞ্চল মনে হত। কেমন যে বিষণ্ন, কি যেন এক চিন্তার ভারে পীড়িত। সবসময় কি যেন ভাবত। মাস দুয়েক ধরে ব্যবসাতেও মনোযোগ দেয়নি তেমন। আমি ভেবেছিলাম, পারিবারিক অশান্তির জন্যেই বোধহয় মন-মেজাজ ওর প্রসন্ন নেই।'

'কিছু জিজ্ঞেস করেননি?'

'করেছিলাম। প্রথমটায় এড়িয়ে যেত। পরে বলত, কই না, ঠিকই তো আছি। কি যে বল, বেদার ভাই! তবে ইদানীং প্রায়ই বলত, সে কানাডা চলে যাবে চিরদিনের জন্য দেশ ত্যাগ করে।'

'শুধু মুখেই বলত, না, তেমন কোন লক্ষণ দেখেছিলেন?'

'পাসপোর্টের আবেদনও বোধহয় করেছিল।'

'মি. চৌধুরীর কোন শত্রু ছিল কিনা বলতে পারেন? তেমন কিছু কখনও বলেছেন?'

'না। তেমন কিছু কোনদিন আমার সাথে আলাপ করেনি। আসলে সে ছিল অত্যন্ত চাপা প্রকৃতির। আমার সাথে যথেষ্ট হৃদ্যতা থাকলেও, ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে পারতপক্ষে কখনোই আলোচনা করত না।'

'কুয়াশা সম্পর্কে কোনদিন কোন কথা হয়েছে?'

'অনেকদিন আগে একবার হয়েছিল। কয়েকবছর আগে। সংবাদপত্রে কুয়াশা

সম্পর্কে একটা খবর ছাপা হয়েছিল, সেই সূত্রে।'

'ইদানীং কোন কথা হয়েছিল?'

'না। ঐ শব্দটাই উচ্চারণ করেনি সে।'

সামনের ফাইল থেকে একটা খাম বের করে বখত সাহেবের দিকে এগিয়ে দিলেন মি. সিম্পসন। বললেন, 'পড়ে দেখুন, জানে আলমের পকেট থেকে এই চিঠিটাই পাওয়া গিয়েছিল কিনা।'

খামটা নিয়ে তার ভিতর থেকে চিঠিটা বের করলেন বখত সাহেব। ভাঁজ খুললেন। ছোট এক টুকরো নীল কাগজে বাংলা টাইপরাইটারে মুদ্রিতঃ জানে আলম চৌধুরী। আগামী ৩০ মার্চের মধ্যে দশ লাখ টাকা চাই। রাজি থাকলে তোমার ফ্ল্যাটের সামনে লাল আলো জ্বালিয়ে দিয়ো, ২৯ মার্চ রাতে। গিয়ে নিয়ে আসব টাকা। পুলিসে খবর দিলে পরিণাম খারাপ হবে। টাকাটা না পেলে মৃত্যু অবধারিত। কুয়াশা।

চিঠিটা পড়ে ভাঁজ করে খামটার মধ্যে পুরতে পুরতে বখত সাহেব বললেন, 'হ্যাঁ, এটা সেই চিঠিটাই।'

'বের করেছিল কে মি. চৌধুরীর পকেট থেকে?' প্রশ্ন করলেন মি. সিম্পসন।

'ইন্সপেক্টর সোবহান আলী।'

'এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আপাতত আপনার আর কিছু বলবার আছে, বখত সাহেব?'

'না—না। তেমন কিছু আর বলবার নেই। যদি মনে হয় তাহলে পরে অবশ্যই জানাব।'

'বেশ, আমি উঠি এবার।'

টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুললেন বখত সাহেব, 'হ্যালো, বখত, পোলট্রি ফার্ম...হ্যাঁ, আছেন উনি। ...ধরুন, মি. সিম্পসন, আপনার ফোন।' রিসিভার এগিয়ে দিলেন তিনি মি. সিম্পসনের দিকে।

'হ্যালো—হ্যাঁ, সিম্পসন বলছি...ও হ্যাঁ, বল...কোন ভুল নেই তো...? আচ্ছা রাখছি।'

বখত সাহেব লক্ষ্য করলেন, অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উঠেছে মি. সিম্পসনের মুখ।

তিনি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

পথে গাড়িতে ব্যাপারটা ভাবছিলেন মি. সিম্পসন। বেশ ভাল রকমের একটা জট পাকিয়ে গেছে। জানে আলম চৌধুরীর হত্যা-রহস্য সম্ভবত একমাত্র তিনি ছাড়া আর সবাই সহজ কেস বলে মনে করছে। অথচ তিনিই জানেন, ব্যাপারটা কতটা জটিল। সবাই জানে হত্যাকারী কুয়াশা। অর্থাৎ হত্যাকারী কুয়াশার উপর দোষ চাপিয়ে দিতে সফল হয়েছে পুরোপুরি। অথচ মি. সিম্পসনের ধারণা সম্পূর্ণ আলাদা। মাত্র দশ লাখ টাকার জন্য কুয়াশা কাউকে খুন করবে এটা কোন মতেই

বিশ্বাস করা যায় না—বিশেষ করে কুয়াশা নিতান্ত প্রাণের দায় ছাড়া নরহত্যা এড়িয়ে যায় একথা আর কেউ জানুক আর নাই জানুক, তিনি নিজে তো ভাল করেই জানেন। তাছাড়া কুয়াশার নামে দেয়া চিঠির বক্তব্যের সাথে হত্যাকারীর কথাগুলোর (কুয়াশা এইভাবে তার কর্তব্য পালন করে) কোন সামঞ্জস্য নেই। একটাতে টাকা দাবি করা হয়েছে. অন্যটাতে কোন এক অজ্ঞাত কর্তব্যের উল্লেখ করা হয়েছে।

তাছাড়া কুয়াশা এইভাবে চিঠি লেখার ক্লাসিক্যাল স্টাইলটাও পছন্দ করে না। করলেও সে নিজের হাতেই চিঠি লিখত টাইপরাইটারের সাহায্য নিত না।

টাকার ব্যাপারটাও জটিল। বেদার বখতের মতে জানে আলম সঙ্গতিসম্পন্ন ছিল না। কিন্তু এইমাত্র ঢাকা থেকে তাকে ফোনে জানানো হয়েছে বিভিন্ন ব্যাংকে জানে আলম চৌধুরীর উনচল্লিশ লক্ষ টাকা ডিপোজিট ছিল। জানুয়ারি থেকে মার্চের চব্বিশ তারিখের মধ্যে সমস্তটা টাকা তুলে ফেলা হয়েছে। অন্যদিকে মিসেস রুখসানা চৌধুরীর অ্যাকাউন্টে যুক্ত হয়েছে মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা। বাকি টাকাটা তাহলে গেল কোথায়? জানে আলম চৌধুরী কুয়াশাকে যদি দাবি অনুযায়ী দশ লাখ টাকা দিয়েই থাকে তাহলে নিশ্চয়ই কুয়াশা তাকে খুন করতে আসত না। তাহলে খুনের কারণ আলাদা এবং এই খুনের সাথে কুয়াশার জড়িত থাকার কোন সম্ভাবনা নেই। অন্য কেউ কুয়াশার দুর্নামটুকু ব্যবহার করেছে। কিন্তু কে সে। তার হদিস পাওয়ার এতটুকু সূত্র নেই।

এই বেদার বখত সাহেব লোকটাও অত্যন্ত ধুরন্ধর। তার নিকট থেকে এমন কিছু আদায় করা গেল না, যা জানে আলম চৌধুরীর খুনের রহস্য উদঘাটনে সহায়ক হতে পারে। অথচ উনি অনেক কিছুই জানেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রঙ্গ-মঞ্চে আসল কুয়াশা কখন প্রবেশ করেছে তাও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না. হত্যাকাণ্ডের আগে থেকেই কি সে চট্টগ্রামে ছিল? হত্যাকারী ... তার উপস্থিতি... সুযোগ নিয়েছে? না বহুদিন ধরে কুয়াশার কোন খবরাখবর বড় একটা কেউ জানে না বলেই হত্যাকারী তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়েছে?

যাই হোক, হত্যাকারী বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়নি। কুয়াশা যদি খেপে গি... থাকে তাহলে সে নকল কুয়াশাকে খুঁজে বের করতে চেষ্টার ত্রুটি করবে না সেটাই বোধহয় তার বর্তমান তৎপরতার কারণ। এই জন্যেই বোধহয় সে সক্রি... হয়ে উঠেছে। তার ছদ্মবেশে থানায় গিয়ে খোঁজ-খবরও করে এসেছে। কি... সোনা-চোরাচালানীদের ব্যাপারে ওর এত উৎসাহ প্রদর্শনেরই বা কারণ কি জালিয়াতির ব্যাপারটাতেই বা ওর এত আগ্রহ কেন? সে কি এ সম্পর্কে কি... জানতে পেরেছে? নাকি, জানে আলম চৌধুরীর হত্যা-রহস্যের সাথে এর কো... সম্পর্ক আছে?

জানে আলম চৌধুরী কি কোন র‍্যাকেটের মেম্বার ছিল? বখত সাহেব হয়ত এ

সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করবেন না।

কুয়াশা কতটাই বা এগিয়ে গেছে? হয়ত অনেকটা, হয়ত আদৌ এগোয়নি। তার মতই অন্ধকারে হাতড়াচ্ছে। কিন্তু, এবারে কুয়াশাকে বাজিমাৎ করতে দেয়া হবে না। তার নাকের ডগায় বসে কুয়াশা অপরাধীকে নিজ হাতে শাস্তি দেবে, আর তিনি শুধু নীরব দর্শকের মত তা দেখবেন, তা এখন আর তিনি সহ্য করবেন না। তাঁকে এগোতে হবে কুয়াশার চাইতে দ্রুত। অপরাধীকে শাস্তি দেবে আদালত: কুয়াশা নয়। গাড়ি শহরের মধ্যে প্রবেশ করেছে।

ড্রাইভার মোসলেম মিঞা প্রশ্ন করল, 'কোনদিকে যাব, স্যার।'

'আন্দরকিল্লার দিকে যাও।'

আন্দরকিল্লায় জানে আলম চৌধুরীর বাসা। মিসেস চৌধুরী আপাতত সেখানেই আছেন। পুলিসের অনুরোধেই তিনি চট্টগ্রাম ছেড়ে যাননি। স্বামীর হত্যা-রহস্য উদঘাটনে তাঁর কতটুকু উৎসাহ আছে, মি. সিম্পসন তা জানেন না। তবু একবার আলাপ করা প্রয়োজন। তাছাড়া একটা সম্ভাবনার কথা তাঁর মনের কোণে উদয় হয়েছে। মহিলাকে একটু ঘনিষ্ঠভাবে দেখা দরকার। নকল কুয়াশা-রহস্য হয়ত তাঁকে কেন্দ্র করেই ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।

জানে আলম চৌধুরীর বাসা খুঁজে পেতে সময় লাগল না। ড্রাইভার মোসলেম আলী বহু বছর ধরে চট্টগ্রাম শহরে আছে। এখানকার অলি-গলি তার নখদর্পণে। নম্বরটা খোঁজ করতে দু-একজনকে জিজ্ঞেস করতে হল, এই যা।

কিন্তু নিরাশ হতে হল মি. সিম্পসনকে। গেটে একটা বিরাট তালা ঝুলছে।

চার

পরদিন সকালে মিসেস রুখসানা চৌধুরীর সাথে দেখা করতে গিয়ে আবার নিরাশ হলেন মি. সিম্পসন। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সের একটা চাকরমত লোক বেরিয়ে এসে বলল,'মেমসাহেব তো নাই। সকালের ট্রেনে ঢাকা গেছেন গিয়া।'

'ঢাকা চলে গেছেন মিসেস চৌধুরী?' অবিশ্বাসের সুরে বললেন মি. সিম্পসন।

'হ্যাঁ, স্যার। আপনি কে?'

'আমি সি. আই. ডি.-র লোক। জানে আলম সাহেবের খুনের তদন্ত করছি। তুমি কে?'

'আমি এই বাড়ির কাজকাম করি। রান্নাও করি।' তার কণ্ঠে ভয়ের আভাস।

'মিসেস চৌধুরী কবে ফিরবেন কিছু বলে গেছেন?'

'ঠিক নাই, স্যার। তবে শিগগিরই আইবেন।'

'বেশ, তোমাকেই কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব।'

লোকটা সপ্রতিভ। কিন্তু মি. সিম্পসনের শেষের কথায় হকচাকয়ে গেল।

সভয়ে বলল, 'আমি তো কিছু জানি না, স্যার।'

'না না, সে কথা নয়। অন্য কয়েকটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করব। যেগুলো জানতে পারলে তোমার সাহেবের খুনের তদন্তের সুরাহা হবে। তোমার নিশ্চয়ই আপত্তি নেই?'

লোকটার ভয়ের ভাবটা তবু দূর হল না। সে আবার বলল, 'আমি তো কিছুই জানি না!'

'তুমি অকারণে ভয় পাচ্ছ। খুন হয়েছে রাস্তায়। তোমার তা জানার কথা নয়। আমি শুধু তোমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব। তার জবাব পেলে আমার তদন্তের সুবিধা হবে।'

লোকটা কি বুঝল কে জানে? সে বলল, 'আচ্ছা, কন : আইয়েন ড্রইংরুমে।'

ড্রইংরুমে গিয়ে বসলেন মি. সিম্পসন। লোকটা সামনের দেয়ালের পাশে দাঁড়াল।

ঘরটা জরীপ করলেন মি. সিম্পসন। নিখুঁত একটা ড্রইংরুম। আসবাব-পত্রগুলো দামী। দেয়ালে দুটো জলরংয়ের ছবি। যেখানে তিনি বসেছিলেন চিত্রকরের নামটা সেখান থেকে দেখ. যাচ্ছিল না। কিন্তু অনুমান করলেন, ছবি দুটো বোধহয় মিসেস চৌধুরীর আঁকা হবে। উনি নাকি নামকরা আর্টিস্ট। একটা ল্যাণ্ডস্কেপ। নদী-তীরের একটা পরিচিত দৃশ্য। গুণ টেনে যাচ্ছে একটা নৌকা। আর একটার মাথা-মুণ্ড কিছুই বুঝতে পারলেন না। মনে হল কয়েকটা তক্তা যেন এলোমেলো ফেলে রাখা হয়েছে।

লোকটা নীরবে দাঁড়িয়েছিল। চিত্র-পরিক্রমার অবসান ঘটিয়ে তার দিকে নজর দিলেন মি. সিম্পসন।

'তোমার নাম কি?'

'কদম রসুল।'

'অনেকদিন ধরে আছ বোধহয় জানে আলম সাহেবের কাছে?'

'হ্যাঁ, স্যার। বছর পাঁচেক তো অইবই।'

'সাহেব তোমার লোক কেমন ছিল?'

'খুব ভাল লোক, স্যার। এমন মানুষ হয় না। আমাকে, স্যার, খুব ভাল বাসতেন।'

'তোমার সাহেবকে যে খুন করেছে সে ধরা পড়ুক, তা নিশ্চয়ই তুমি চাও?'

মাথা নাড়ল লোকটা।

'আচ্ছা, ঘটনার দিন তোমার সাহেবের মন-মেজাজ কেমন ছিল বলতে পার?'

'হ্যাঁ, স্যার। খুব ভাল ছিল। সকাল বেলা বেগমসাহেব ঢাকা থাইকা ফোনে কি যেন বলছিলেন। সাহেব তাতে খুব খুশি ছিলেন।'

'বেগমসাহেব মানে মিসেস চৌধুরী ফোন করেছিলেন?' অবাক হলেন মি.

সিম্পসন।

'হ, স্যার।'

'ঠিক জান, তুমি?'

'আমিই তো প্রথমে ফোন ধরছিলাম।'

'গলা চিনেছিলে?'

'নিশ্চয়ই, স্যার। মেমসাহেবের গলা চিনুম না?'

'ভুল হয়নি তো?'

'না, স্যার, ভুল অইতেই পারে না।'

'বেশ, তারপর?'

'সায়েব খুব খুশি। নাস্তার সময় আমারে কইলেন, কদমা, তোরে দুই হাজার ট্যাকা দিলে ব্যবসা করতে পারবি? আমি কইলাম, খুব পারুম। তারপর অফিসে গেলেন গা। রাইতে শুনলাম সায়েব নাই।' ছলছল করে উঠল কদম রসুলের চোখ দুটো।

'তোমার সাহেবের গাড়ি ছিল না?'

'বিক্রি কইরা দিছেন কয়েকদিন আগে।'

'চৌধুরী সাহেব খুন হবার আগে তার সাথে কোন অপরিচিত লোক দেখা করতে এসেছিলেন?'

'না, স্যার। বখত সায়েব ছাড়া আর কেউ আসেন না এই বাড়িতে। আগে মেমসায়েব থাকতে অনেক মেহমান আইত।'

'মেমসায়েব বাড়ি ছেড়ে কবে চলে গেছেন?'

'কার্তিক-অঘ্রাণ মাসে, স্যার।'

'খুব ঝগড়া হত না কি?'

'না তো, স্যার। বছরের দুই-একদিন ঝগড়া অইত। সে তো, স্যার, সব বাড়িতেই অয়।'

প্রশ্নটাতে কদম রসুল একটু ক্ষুব্ধ হয়েছে বলে মনে হল মি. সিম্পসনের। তিনি বিস্মিত হলেন। কিন্তু বিস্ময় চেপে বললেন, 'তাহলে মিসেস চৌধুরী তোমার সাহেবকে ছেড়ে চলে গেলেন কেন?'

'তা তো, স্যার, বলতে পারব না। আমি ছুটিতে বাড়ি গেছিলাম। আইয়া দেখি মেমসাব নাই।' সাবরে কিছু জিগাইতে সাহস পাই নাই। তবে স্যার, দৈনিক রাতে টেলিফোনে মেমসাবের লগে সা'ব কথা কইতেন। মেমসাব মাঝে মাঝে চাটগাঁ আইতেন। কিন্তু বাসায় উঠতেন না, হোটেলে উঠতেন।'

'কারণ কিছু জান?'

'না, স্যার,' আমতা আমতা করে বলল কদম রসুল।

মি. সিম্পসন তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। তিনি বললেন, 'কিছুই

জান না?'

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, 'না, স্যার, জানি না।'

চিন্তিত হলেন মি. সিম্পসন। এই লুকোচুরির অর্থ কি? হয়ত এর মধ্যে জানে আলমের হত্যা-রহস্য লুকিয়ে আছে।

'তোমার সাহেবের লাশ দাফনের ব্যবস্থা কে করেছে?'

'যা করার বখত সায়েবের লোকেরাই করছে! মেমসায়েব তো খালি কাঁনছেন। কাঁইদা কাঁইদা চোখ-মুখ ফুলাইয়া ফেলছেন।'

'মিসেস চৌধুরীর সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছিলেন, কাল বা পরশু?'

'পরশু কেউ আসে নাই, স্যার। কাল রাতে সুন্দরপনা এক সায়েব আইছিলেন। শহীদ খান না কি নাম যেন। তার সাথে আর এক সায়েব ছিল—কামাল সায়েব।'

ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন মি. সিম্পসন। শহীদ তাহলে ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছে। আশ্চর্য, তিনি জানেন না! অবশ্য জানবার কথাও নয়, কিন্তু কোন সূত্রে এসেছে সে! মিসেস চৌধুরীর আহ্বানে, না কুয়াশার অনুরোধে, না নিজের আগ্রহে? এসে নিশ্চয়ই খোঁজ করেছে তাঁর?

তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কি আলাপ হল, জান কিছু?'

'আমি কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তেমন কিছু কানে আসে নাই। তবে সায়েবের খুনের ব্যাপারেই আলাপ অইছিল।'

'মেমসাহেব কখন গেছেন?'

'সকালের ট্রেনে। বললাম তো।'

'কবে আসবেন কিছু বলেছেন?'

'দুই-চারদিনের মধ্যেই আইয়া পড়বেন।'

'আচ্ছা, আমি এবার চলি। মিসেস চৌধুরী এলে তাঁকে জানিও যে আমি এসেছিলাম।'

মাথা নাড়ল কদম রসুল।

পাঁচ

স্বামীর শোচনীয় মৃত্যুর খবর পেয়ে মিসেস রুখসানা শোকে পাথর হয়ে গিয়েছিল। আকুল হয়ে কেঁদেছিল। কিন্তু মানসিক আবেগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তার বরাবরই প্রবল। তাই চরম শোকের মধ্যেও স্বামীর হত্যাকারীকে শাস্তিদানের কর্তব্যের কথা স্মরণ করে আত্মসংবরণ করেছে। আত্মস্থ হয়ে উঠেছে সে।

দাফনের পালা চুকতেই ঢাকায় টেলিফোনে যোগাযোগ করেছে শহীদ খানের সাথে। ভদ্রলোক তার পূর্ব-পরিচিত। এক চিত্র-প্রদর্শনীতে আলাপ হয়েছিল। তার একটা ছবি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন ভদ্রলোক। কিনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিক্রি না

করে বিনামূল্যেই দিয়েছিল সে তাঁকে ছবিটা, তাঁর নাম শুনে। সৌখিন গোয়েন্দা হিসাবে তাঁর খ্যাতিটুকু সংবাদপত্র মারফৎ, বন্ধু-বান্ধব মারফৎ তার কানে পৌঁছেছিল অনেক আগেই। বিনামূল্যে ছবি নিতে আপত্তি করেছিলেন ভদ্রলোক। বলেছিলেন, অন্তত খাটুনি আর খরচটা তো নেবেন? রাজি হয়নি সে। জবাবে বলেছিল, আপনার মত খ্যাতিমান লোক যে আমার ছবি কিনতে চেয়েছেন এই আমার সবচেয়ে বড় প্রাওয়া। সেই সূত্রেই আলাপ। পরে নানা অনুষ্ঠানে সভা-সমিতিতেই দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। কুশল বিনিময় হয়েছে।

স্বামীর হত্যাকাণ্ডের পর শোকের প্রথম ধাক্কা কাটতেই মনে পড়ল তার শহীদ খানের কথা। ভদ্রলোক হয়ত তার স্বামী। হত্যাকারীকে—সে কুয়াশাই হোক, আর যে-ই হোক, খুঁজে বের করতে তাকে সাহায্য করবেন।

গাইড থেকে নম্বর বের করে রিং করেছিল সে ঢাকায় শহীদ খানের বাড়িতে।

প্রথমটা ইতস্তত করেছিল শহীদ খান। বলেছিল, 'কুয়াশা যদি হত্যাকারী হয়ে থাকে তাহলে তাকে খুঁজে বের করার সাধ্য কারও নেই। অন্তত আমার তো নেই-ই। তাছাড়া হয়ত জানেন না, কুয়াশা আমার পরমাত্মীয়।'

'কি রকম!' অবাক হয়েছিল রুখসানা।

'আমার স্ত্রীর একমাত্র ভ্রাতা।'

'ওহ্, আমার জানা ছিল না । শুধু এই জন্যেই কি আপনার আপত্তি?'

'যদি বলি তাই?'

'তাহলে আমি বলব, আপনার সখের গোয়েন্দাগিরির কোনই অর্থ হয় না। আমি নিজে জানতাম যারা গোয়েন্দা, সত্য নির্ণয়ই তাদের কাছে সবচেয়ে বড় কথা। আত্মীয়তা বা অন্য কোন বিবেচনা সেখানে ঠাঁই পায় না। কিছু মনে করবেন না। আমার কথাগুলো বোধহয় রূঢ় শোনাচ্ছে। কিন্তু কথাটা সত্যি কিনা আপনি বলুন?'

হকচকিয়ে গিয়েছিল শহীদ খান। এই প্রশ্নের জবাব দেয়নি। শুধু বলেছিল, 'বেশ, আপনার কেস আমি হাতে নিলাম। আজ রাতেই আমি চট্টগ্রাম পৌঁছব। প্লেনের টিকেট না পেলে উল্কায় যাব।'

সেই দিনই সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম পৌঁছল শহীদ। সঙ্গে কামাল। শহীদ খান পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, 'আমার বন্ধু ও সহকারী।' অভিবাদন বিনিময়ের পরে শহীদ খান প্রশ্ন করল, 'তারপর, মিসেস চৌধুরী, বলুন কিভাবে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি? আমি একবার যখন আপনার কেস হাতে নিয়েছি, তখন যথাসাধ্য করবই। তাতে কোন ত্রুটি হবে না।'

'সে বিশ্বাস আমার আছে। কিন্তু আমার কথায় আপনি নিশ্চয়ই রাগ করেননি?'

'মোটেই না। আপনি বরং আমাকে আমার কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন,

তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।'

'আর লজ্জা দেবেন না।'

'বলুন, এবারে তাহলে?'

কয়েক মুহূর্ত নীরব রইল মিসেস রুখসানা। মনে মনে গুছিয়ে নিল তার বক্তব্যটা। তারপর বলল, 'শুরু করার আগে একটা প্রশ্ন করব, শহীদ সাহেব?'

'বলুন।'

'আপনি জানেন কি, কুয়াশা এখন কোথায়?'

'না।'

আবার নীরব হয়ে গেল রুখসানা। সিগারেট ধরাল শহীদ ও কামাল।

রুখসানা মুখ খুলল, 'প্রথমেই বলে নিই যে, কুয়াশাই আমার স্বামীকে হত্যা করেছে বলে ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করা হলেও আদতে সে এর সাথে জড়িত নেই বলেই আমার বিশ্বাস।'

'আপনার এই ধারণার হেতু?' কামাল প্রশ্ন করল।

'প্রথমত, কুয়াশার সাথে তার যোগাযোগ বা সংঘর্ষ ঘটার কোন সঙ্গত কারণ নেই। দ্বিতীয়ত, থাকলে তা আমি জানতে পারতাম। কারণ, তার প্রত্যেকটা ব্যাপার, প্রত্যেকটা সমস্যা আমার জানা আছে। এমন কোন বিষয় নেই, যা সে আমার কাছে গোপন রেখেছিল।'

'কিন্তু আমি শুনেছি, আপনাদের মানে আপনার স্বামীর সাথে আপনার বনিবনা ছিল না,' বলল শহীদ খান।

'আপনাদের শোনবার দোষ দিই না। কিন্তু আমাদের মানে আমার আর আমার স্বামীর নিরাপত্তার জন্যে ঐ ধরনের একটা ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছিল। আসল ব্যাপারটা জানত শুধু আমাদের চাকর কদম রসুল। তবে যে বিশেষ ব্যক্তিটার মনে ঐ ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করছিলাম, তার ক্ষেত্রেই আমরা ঐ ধারণা সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছিলাম। ওর হত্যাকাণ্ড তারই প্রমাণ।'

'মিসেস চৌধুরী। ব্যাপারটা আর একটু খোলাসা করে বলুন। কেমন যেন জটিল করে তুলছেন,' বলল কামাল।

'সেটা বোধহয় আমার মানসিক অবস্থার জন্যে। আমি কথাগুলো ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না। আমার স্বামী এক ভয়ঙ্কর চরিত্রের লোকের পাল্লায় পড়েছিলেন। লোকটা একটা আস্ত শয়তান। দুনিয়ায় এমন অপরাধ নেই যা সে করেনি, বা করতে পারে না। জালিয়াতি ও চোরাচালানী হচ্ছে তার প্রধান পেশা। বাইরে অবশ্য অন্য ব্যবসায়ের একটা ছদ্ম-খোলস আছে। কিন্তু সেটা লোক দেখানো। এদিকে অবশ্য সে একটা গণ্যমান্য কেউকেটা লোক।'

'লোকটাকে আপনি নিজে চেনেন?'

'নিশ্চয়ই চিনি। নামটা পরে বলছি। সেই শয়তানটা ধীরে ধীরে আমার স্বামীকে গ্রাস করে ফেলেছিল। প্রলোভন দেখিয়ে তাঁকে সোনা-চোরাচালানের ব্যবসায়ে ঢুকিয়েছিল। কিন্তু পরে তার জন্যে অনুশোচনা হয়েছিল ওঁর মনে। উনি শয়তানটার জাল কেটে বাইরে আসবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শয়তানের সাথে শয়তানিতে উনি পারবেন কেন? আমার স্বামী বিদ্রোহ করতেই শয়তানটা তাঁকে বেকায়দায় ফেলে দিল। গোপনে পি. আই. এ. কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিল যে, উনি সোনা-চোরাচালান করছেন। ধরাও পড়লেন কাস্টমসের হাতে বমাল। অথচ উনি হলফ করে আমাকে বললেন, সেদিন ওঁর ব্যাগের মধ্যে সোনার বার কি করে এল তা উনি জানেন না। পি. আই. এ. থেকে ওঁর চাকরি গেল। শয়তানটাই আবার টাকা পয়সা খরচ করে আর ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে ওঁকে নিশ্চিত কারাবাসের কবল থেকে বাঁচাল এবং ওঁকে তার উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল করে তুলল। নির্বিষ সাপের মত ওঁকে খেলাতে লাগল শয়তানটা। বস্তুত আমার স্বামী তখন শয়তানটার একটা যন্ত্রে পরিণত হয়েছিলেন।'

একটু থামল রুখসানা। তারপর আবার আরম্ভ করল, 'এসব ঘটনা ঘটেছে আমার বিয়ের আগে। ওঁর পি. আই. এ.-র চাকরি চলে যাবার পর আমাদের বিয়ে হয়। বিয়েটাও ঠিক করে ঐ শয়তানটাই। এক্ষেত্রেও তার একটা ভয়ঙ্কর উদ্দেশ্য ছিল।

'চিত্রকর হিসাবে তখন আমার মোটামুটি ভাল নাম হয়েছে। এই সময় বিয়ের প্রস্তাব এল। শয়তানটার উদ্দেশ্য ছিল, আমাকে দিয়ে এটা-সেটা জাল করিয়ে নেবে। বিয়ের কয়েকদিন পরেই লোকটা এই ধরনের একটা প্রস্তাব নিয়ে আসে। আমি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করি। আমাকে নানারকম প্রলোভন দেখায়। তাতেও আমাকে দিয়ে সে তার কাজ করাতে পারেনি। শেষে সে এই বলে হুমকি দেয় যে, আমি তার কাজ করতে রাজি না হলে আমার স্বামীকে সে পুলিসের হাতে তুলে দেবে। আমার স্বামীর বিরুদ্ধে তার হাতে যে-সব প্রমাণ আছে তাতে করে ওঁকে অনায়াসে কয়েক বছরের জেল খাটানো যেতে পারে।

'ইতিমধ্যে আমার স্বামীর কাছ থেকে সমস্তটা জেনে নিয়েছিলুম। বলতে গেলে উনি নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাকে বলেছিলেন। সহ্যের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন উনি। আর কিছুদিন গেলে হয়ত নিজের অপরাধের বোঝার ভার সইতে না পেরে আত্মহত্যাই করে বসতেন উনি। সুতরা আমাকেই পরিস্থিতির মোকাবেলায় নামতে হল। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে দু'জনের মধ্যে বনিবনা নেই এই ধারণা সৃষ্টি করার জন্যে দু'জনে আলাদা হয়ে গেলাম। আমি চলে গেলাম ঢাকায়, উনি রইলেন এখানে। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হল দুটো। প্রথমত, সেই শয়তানটা সরাসরি আমাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পাবে না এবং আমার উপর চাপ সৃষ্টির জন্যে ওঁর উপর অত্যাচার করবে না। উনি বলতে পারবেন যে আমার উপর

তাঁর কোন কর্তৃত্ব নেই। দ্বিতীয়ত, ঢাকায় বসে আমি ওঁর আর আমার পাকিস্তান ছেড়ে চিরতরে কানাডা চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করছিলুম। আমরা চেয়েছিলুম, ঐ শয়তানের ছায়া থেকে চিরতরে দূরে সরে গিয়ে শান্তিতে বসবাস করতে। সব ব্যবস্থাই হয়ে গিয়েছিল। পাসপোর্টও পেয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু শেষ দিকে বোধহয় শয়তানটা জানতে পেরেছিল। তাই ওঁকে আর বাঁচাতে পারলাম না।'

আঁচলে মুখ ঢাকল রুখসানা। এতক্ষণ ধরে প্রচণ্ড মানসিক শক্তি দিয়ে সে কান্না চেপে রেখেছিল। তার কথা শেষ হবার পরই সে শক্তি নিঃশেষিত হওয়ায় প্রবল কান্নায় ভেঙে পড়ল। কান্নার দমকে তার দেহটা বারবার কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

কামাল ও শহীদ চুপ করে বসে রইল। কিছুক্ষণ পরে উঠে দাঁড়াল রুখসানা। কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল, 'বসুন, আমি আসছি।'

শহীদ জিজ্ঞেস করল, 'কি বুঝলি?'

কামাল প্রশ্নটার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে বলল, 'কি বুঝলাম মানে? কোনটার কথা বলছিস? অনেক কিছুই তো বঝলাম, আবার অনেক কিছুই বুঝলাম না।'

'যেমন?' জানতে চাইল শহীদ।

'বুঝলাম যে কুয়াশা এই ঘটনার সাথে জড়িত নেই, আর বুঝলাম না কালপ্রিটটা কে।'

'ঘোড়ার ডিম বুঝলি। কুয়াশাই কালপ্রিট।'

'তুই কচু বুঝেছিস। ভারি বুদ্ধিমান তুই!'

'বুদ্ধিমানই তো। তোর মত তো গোবর নেই আমার মাথায়।'

'তোর মাথার গোবর সব ঘুঁটে হয়ে গেছে। মহুয়া বৌদিকে বলব হিটারটা বিক্রি করে দিতে।'

'শোন, মেলা ভ্যাচর ভ্যাচর করিস নে। এখন আমাদের আসল কাজটা কি হবে, জানিস?'

'এখনও জানি না।'

'জেনে নে তাহলে। আসল কাজটা হবে হৈ চৈ করে কুয়াশার খোঁজ করা। আর গোপনে আসল হত্যাকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।'

'ব্যবস্থা আবার কি? মিসেস চৌধুরী তো জানেনই কে এই হত্যাকাণ্ড করেছে সোজা গ্রেফতার করলেই হয়।'

'ঐ জন্যেই তো বলি তোর মাথায় গোবর ছাড়া আর কিছুই নেই। ব্যাপারটা এত সহজ হলে উনি চট্টগ্রাম আসবার জন্য এমন করে অনুরোধ করতেন না। খুন কে করেছে তা জানা থাকলেও তাকে ফাঁসাবার মত কোন প্রমাণ নেই। তাছাড়া খুনী এমন গণ্যমান্য ব্যক্তি যে, কেউ তাকে সন্দেহই করবে না। মিসেস চৌধুরী

চান যে, আমরা যেন আসল খুনীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় প্রমাণ সংগ্রহ করি এবং তারপর তাকে পুলিসের হাতে তুলে দিই।'

'হুঁ, ব্যাপারটা তাহলে এই?'

'তাছাড়া আর কি হবে? অন্যথায় এই কথাগুলো উনি আমাদের না বলে পুলিসের কানে তুলতেন। কিন্তু তাতে লাভ হবে না বলেই ওঁর ধারণা।'

রুখসানা ফিরে এল। ওকে আগের মতই শান্ত বলে মনে হচ্ছে আবার। চোখে-মুখে পানি দিয়ে এসেছে। বলল, 'মাফ করবেন। আমি, আমি—।'

'না, ওতে কি? আপনার মানসিক অবস্থা আমরা বুঝতেই পারছি। এবারে বলুন সেই নামটা, যাকে আপনি হত্যাকারী বলে সন্দেহ করেন,' কামাল বলল।

'সন্দেহ করি না। আমি এব্যাপারে নিশ্চিত। কিন্তু আমি অসহায় স্ত্রীলোক। তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সাধ্যাতীত। তাছাড়া লোকটা ভয়ানক ধূর্ত। খুন শুধু এই একটাই নয়, আগেও অনেক করেছে। অথচ প্রমাণ করা তো দূরের কথা, কেউ তাকে সন্দেহই করতে পারেনি।'

'কিন্তু লোকটা কে?' কামাল অস্থির হয়ে প্রশ্ন করল।

'বখত পোলট্রি ফার্মের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বেদার বখত এম. এন. এ., টি. কে।' কেটে কেটে উচ্চারণ করল রুখসানা।

কামাল ও শহীদ দু'জনেই চমকাল।

'চমকে উঠলেন যে?' প্রশ্ন করল রুখসানা। 'বিশ্বাস হচ্ছে না?'

জবাব দিল কামাল, 'সত্যি বিশ্বাস হতে চায় না। ঐ রকম একজন গণ্যমান্য লোক দিনের পর দিন সমাজবিরোধী কাজ করে বেড়াচ্ছে সে কথা সহজে বিশ্বাস হতে চায় না। কিন্তু তার জন্য চমকাইনি। অন্য একটা কারণ আছে। আপনি টেলিফোন করার কিছুক্ষণ পর বখত সাহেবও কুয়াশাকে গ্রেফতারে সাহায্য করার আবেদন জানিয়ে ফোন করেছিলেন শহীদকে।'

'তাই নাকি?' ম্লান মুখে বলল, 'আমার কথা বলেছেন নাকি?'

'না। তা বলব কেন? আপনি সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকুন,' শহীদ বলল।

'রাজি হয়েছেন?'

'না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে রাজি হলেই ভাল হত।'

'আশা করি এবারে আমাকে সাহায্য করতে আপনার আপত্তি নেই?'

হাসল শহীদ, 'আপত্তি আগেও ছিল না। কুয়াশাকে আমি জানি। এসব ইতরামির সাথে সে কখনোই জড়িত থাকে না। তবুও সন্দেহ যে ছিল না এমন নয়। কিন্তু বেদার বখত যত চালাকই হোক কুয়াশার নামটা ব্যবহার করে ভুল করেছে সে। জানি না, কুয়াশা এখন কোথায়। সম্ভবত পাকিস্তানে সে নেই। কিন্তু যদি থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই ঘটনাটা সে শুনেছে। সুতরাং বখত আমাদের হাত থেকে ফস্কে গেলেও কুয়াশার হাত থেকে রক্ষা পাবে না। তার হাতেই চরম

শাস্তি পেতে হবে তাকে। ভাল কথা মিসেস চৌধুরী, শুনেছিলাম মি. সিম্পসন নাকি এই কেসটার দায়িত্ব নিচ্ছেন?'

'হ্যাঁ। তাঁর উপরই দায়িত্ব পড়েছে. কিন্তু শুনেছি উনি জরুরী কাজে কক্সবাজার গিয়েছেন। আজ অথবা আগামীকাল এসে পড়বেন।'

'উনি নিশ্চয়ই আপনার সাথে দেখা করতে আসবেন। কিন্তু তাঁর সাথে আপনার দেখা হোক এটা আমি চাই না। তাহলে, আপনি তাঁকে সমস্তটা ব্যাপার বলে ফেলেছেন এই ধারণা করে বখত আরও সাবধান হয়ে যাবে। সেটা আমাদের কাম্য নয়।'

'তাহলে? নিজেকে তো আর লুকিয়ে রাখতে পারব না।'

'লুকোতেই হবে। আর লুকোতে হবে সেই শয়তানটার আড্ডায় গিয়ে।'

'অর্থাৎ?'

'মিসেস চৌধুরী, আমি ইতিমধ্যেই কর্মপন্থা ঠিক করে ফেলেছি। আপনি কাল সকালেই চলে যাবেন বখতের আস্তানায়, তার পোলট্রি ফার্মে। তার সাথে যেভাবেই হোক বন্ধুত্ব সৃষ্টি করতে হবে আপনাকে। প্রয়োজন হলে তার হয়ে জালিয়াতি করতেও রাজি হতে হবে আপনাকে। অবশ্য আপনাকে একবার হাতের মুঠোয় পেলে সে বন্দী করেই রাখবে। আর বেরোতে দেবে না। পরে আমরা আপনার সাথে যোগাযোগ করব। ওখানে আপনাকেই আসল কাজটা সারতে হবে। সে যে জালিয়াতিতে জড়িত আছে, সোনা-চোরাচালানের সাথে জড়িত আছে. তার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আপনাকে সংগ্রহ করতে হবে।'

'কিন্তু, কিন্তু। যদি আমার উপর অত্যাচার করে?' ম্লান মুখে বলল রুখসানা।

'অতটা সাহস সে পাবে না। তাছাড়া আপনাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতেই সে বেশি আগ্রহী হবে। তবে খুব সাবধান। এক বারে রাজি হবেন না। রয়ে-সয়ে পাকা অভিনেত্রীর মত এগোতে হবে। পারবেন?'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে। মনে হয় বড্ড বেশি ঝুঁকি নেওয়ার কথা বলছেন।'

'ঝুঁকি একটু নিতে হবে বৈকি? আমি নিজে যদি আর্টিস্ট হতাম তাহলে যেভাবেই হোক আমিই বখতের দলে ভিড়ে যেতাম। সেটা সম্ভব নয়। অথচ তার বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে তার ফার্মের ভিতর থেকেই। সুতরাং আপনাকেই যেতে হবে।'

'বেশ, তাই হবে। কবে যেতে বলেন?' অবশেষে মনস্থির করল রুখসানা।

'কাল সকালেই। আপনার চাকরকে বলবেন, আপনি ঢাকা যাচ্ছেন। দু'-এক দিনের মধ্যেই ফিরবেন।'

শহীদ ব্যাগটা খুলে তার ভিতর থেকে একটা প্যাকেট বের করে রুখসানার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এর মধ্যে একটা ছোট যন্ত্র আছে। সেটা দিয়ে অনায়াসে

যে কোন তালা খোলা যায়। এটা সঙ্গে রাখবেন।'

'কিন্তু আমি যে ব্যবহার করতে জানি না।'

'শিখতে হবে না। দেখলেই বুঝতে পারবেন,' হাসল শহীদ।

বাইরে খুব কাছে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ কানে যেতেই কামাল ও শহীদ পরস্পরের দিকে তাকাল। পর মুহূর্তেই শহীদ উঠে দাঁড়াল। বেরিয়ে গেল সে চোখের নিমেষে।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে রইল কামাল ও রুখসানা। কয়েক সেকেণ্ড পরে ধস্তা-ধস্তির একটা আওয়াজ শোনা গেল। কামাল আর দেরি করল না। সে-ও বেরিয়ে গেল। রুখসানার মুখটা পাংশু বর্ণ ধারণ করেছে। তার বুকের ভিতরটা কাঁপছে।

একটু পরেই ফিরে এল কামাল ও শহীদ। দু'জন মিলে একটা লোককে ধরে এনেছে। লোকটার পরনে স্যুট, শরীরের তুলনায় দ্বিগুণ ঢোলা। টাইয়ের গোড়াটা শহীদের মুঠোয়। উঃ আঃ, করছে কালো লম্বা লোকটা। বেঢপ মুখটা কেমন বোকা-বোকা।

রুমের মধ্যে টেনে এনে লোকটাকে ছেড়ে দিল ওরা দু'জন। দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল কামাল। লোকটা ছাড়া পেয়ে প্রথমে তার টাইয়ের ফাঁসটা ঢিলে করল। তারপর বোকার মত বারবার ওদের দিকে তাকাতে লাগল। তারপর ধীরে সুস্থে বসে পড়ল একটা সোফায়।

শহীদ বলল, 'বাছাধন, কে পাঠিয়েছে তোমাকে?'

'ড্যাট ইজ ব্যাড। আমাকে টুমি বলবেন না। টাহলে আমি জবাব ডেবে না। ডু ইউ নো হু আই অ্যাম? মি. স্যানন ডি. কস্টা।'

'উহ্, একেবারে রাণী এলিজাবেথের ভাইপো। পাঠিয়েছে কে, তোমাকে?' ধমক দিল শহীদ।

'আবার টুমি বলছেন?' পাল্টা ধমক দিল ডি.কস্টা। 'টোমরা সবাই ডশ্যু আছ। মি. চোঢরীকে মারডার করেছ। ম্যাগার আমি এসেছি টু সেভ মিসেস চোঢরী। আর টোমরা আমাকে মারছ! আমার বস্ জানতে পারলে টোমাডের খুন করবে।'

'তা, হুজুর, আপনার বস্ কে?' ঠাট্টা করল কামাল।

'সে কঠা বলটে নিষেঢ আছে। বাট হি ইজ এ গ্রেটম্যান। টোমরা সব মার্ডারার। টোমাদের বলব না।'

'বেদার বখত?'

'হু ইজ বেডার বখঠ?'

'ওমা তাও জান না বুঝি! দুটো পাঞ্চ খেলে ঠিকই চিনতে পারবে,' কামাল বলল।

'পাঞ্চ আমিও ডিটে জানি। কাম অন মাই বয়,' আস্তিন গোটাবার চেষ্টা করল সে। 'এমন একটা গাঁট্টা মারব. হ্যাঁ— ।'

শহীদ বিরক্ত হচ্ছিল, সে বলল, 'এই যে সোনা-মানিক, বল তো লক্ষ্মীটি, কে তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে?'

'না, সেটা কখনোই বলা যাবে না। নেভার। আমি এসেছি মিসেস চোঢরীকে সেভ করতে।'

'পারমিশনটা দিল কে?'

'বলব না।'

'কামাল, ওর পকেটে দেখ তো কি আছে?'

দরজা ছেড়ে কামাল এগিয়ে গেল কস্টার দিকে। ডিগবাজি খেয়ে সোফার পেছন দিকে পড়ে গেল ডি. কস্টা। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'খবরডার।'

কামাল বলল, 'চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকুন, কস্টা সাহেব। না হলে খুব খারাপ হবে।'

'আচ্ছা, বেশ। কিনটু কিছু নিটে পারবে না, বলে ডিলুম।' আত্মসমর্পণ করল ডি. কস্টা।

কোটের দু'পকেট থেকে দুটো বিয়ারের বোতল বেরোল। একটা পুরানো মরচে ধরা ছুরি। গুলিশূন্য একটা পিস্তল। আর গোটা বিশেক টাকা বের করল কামাল। সমস্ত দেহ তল্লাশি করে আর কিছু পাওয়া গেল না।

তল্লাশি সমাপ্ত করে কামাল বোকার মত শহীদের দিকে তাকাল। ভাবটা এই, আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেছে! এই পাঁড় মাতালটা এসে জুটল কোত্থেকে?

'আর ইউ স্যাটিসফায়েড?' বোতল দুটো দ্রুত পকেটে পুরতে পুরতে বলল ডি. কস্টা।

বিরক্ত বিব্রত শহীদ ধমকের সুরে বলল, 'নো। কে তোমাকে পাঠিয়েছে একথা না বললে পিটতে পিটতে লাশ বানিয়ে ফেলব।'

'ক্রেজী। ইউ পিপল আর রিয়েলী ক্রেজী। বললুম টো, মিসেস চোঢরীর যাটে কোন খটি না হয় টার জন্য আমি টাকে পাহারা ডিটে এসেছি।'

'কে পাঠিয়েছে?'

'কেউ পাঠায়নি। আমার বস্ অন্য ডুজনকে পাঠিয়ে ডিল। আমি এটো করে বললুম, আমি খুব ভাল পাহারা ডিটে পারি। কিনটু বস্ রাজি হল না। টাই পালিয়ে এলুম ওডের ডুজনের পিছনে পিছনে। বসকে ডেখাতে চাই আমিও হিরো হতে পারি।'

'ওরা দু'জন কোথায়?'

'এই বাড়ির চারদিকে ঘোরা-ফেরা করছে।'

'ওদেরকে কেন পাঠিয়েছে, তোমার বস্?'

'চোঢরী সাহেব টো মারডার হয়েছেন। আমার বস্ বললেন, 'মিসেস চোঢরীর উপর অ্যাটাক হটে পারে। টাই ওডের পাঠিয়েছেন।'

'ওদের নাম জান?'

'হাঃ হাঃ। নাম বললে খুব সুবিঢা হয়, না? কিন্তু সুবিঢা হবে না। নাম বললেও ওডের চিনটে পারবে না। আর ওরা ডুজনই ইয়ং জোয়ান। স্ট্রং অ্যাণ্ড স্টাউট। কারাট ভি জানে, জুজুৎসু ভি জানে। পাঞ্চ ভি জানে।'

'তাহলে আর নাম বলতে ক্ষতি কি?'

'একজনের নাম মান্নান, আর একজনের নাম কলিম। জাস্ট গো অ্যাণ্ড সি ইফ ইউ ক্যান চ্যালেঞ্জ ডেম। বাবা, এটো ডি. কস্টা নয়। একেবারে খুন হয়ে যাবে।'

স্তম্ভিত হয়ে গেল শহীদ ও কামাল। কলিম ও মান্নান তো কুয়াশার সহকারী। তাহলে রঙ্গমঞ্চে এর মধ্যেই কুয়াশার আবির্ভাব ঘটেছে!

কামাল ও শহীদ দৃষ্টি বিনিময় করল।

রুখসানা এতক্ষণ নীরবে ওদের কথাবার্তা শুনছিল। এতক্ষণে সে বলল, 'শহীদ সাহেব, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে।'

'পরে আপনাকে বলছি।'

ডি. কস্টার দিকে ফিরে শহীদ বলল, 'বেশ, এবারে তুমি ফিরে যাও। তোমার ওই সামগ্রীগুলো পকেটে তুলে ফেল আর তোমার বসকে বলবে, শহীদ সাহেব ও কামাল সাহেব আপনাকে সালাম দিয়েছেন। আর, বাছা, তুমি আর কষ্ট করে পাহারা দিতে এস না। কলিম ও মান্নানই যথেষ্ট।'

মুক্তি পেয়ে ডি. কস্টা খুশি হয়ে বলল, 'একশ' বার পাহারা ডেব। মিসেস চোটরীকে সেভ করটে হবে টো?' রুখসানাকে বাউ করে বিদায় নিল ডি. কস্টা।

ছয়

'তারপর রুখসানা, খবর কি? আছ কেমন?'

ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে রুখসানা চৌধুরী চেয়ে রইল বেদার বখতের দিকে, এই প্রশ্নের জবাবে। ঘৃণা ও ক্রোধে তার অনিন্দ্যসুন্দর মুখটা বিকৃত হয়েছে। আর ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে বেদার বখতের মুখটাও। সামনের সোনা-বাঁধানো দাঁত দুটো খুলে ফেলায় তাকে দন্তহীন বুড়ো নেকড়ের মত হিংস্র দেখাচ্ছে।

'কি, জবাব দিচ্ছ না যে?' ধূর্ত শেয়ালের মত হাসল বেদার বখত।

মিসেস রুখসানা চৌধুরীর বয়স হবে তিরিশ বছরের মত। একহারা দীর্ঘ দেহ। রংটা টকটকে ফর্সা। বড় বড় দুটো চোখ। মুখটা লম্বাটে। ঠোঁট দুটো সামান্য চাপা। কোঁকড়া চুলগুলো তেলের অভাবে রুক্ষ। পরনে পাড়হীন সাদা সিল্কের শাড়ি।

এ প্রশ্নেরও জবাব দিল না রুখসানা।

'দবীর খাঁ!' বেদার বখত হাঁক ছাড়লেন।

ভয়ঙ্কর চেহারার বিশালকায় একটা লোক এসে দাঁড়াল। ভয়ে শিউরে উঠল রুখসানা তাকে দেখে। লোকটা যেন কুঁৎকুঁতে চোখে তাকে গিলে খাচ্ছে।

বেদার বখত বললেন, 'কথার জবাব না দিলে দবীর খাঁর হাতে তোমাকে ছেড়ে দেব। খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হাসলেন তিনি। ইশারা করতেই লোকটা চলে গেল।

হিংস্রতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করল রুখসানা।

'স্বামী-স্ত্রীতে মিলে আমার চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করছিলে। দেশ ত্যাগ করার মতলব করছিলে। ব্যাংকের সব টাকা তুলে বিদেশে পাঠিয়েছ। তুমি জান, জানে আলমকে কেন তোমার সাথে বিয়ে দিয়েছিলাম। শুধুমাত্র আমার নিজের জন্য। অথচ তোমাকে দিয়ে আমার কাজ হয়নি। আমার লক্ষ লক্ষ টাকা আয়ের পথ তুমি বন্ধ করে দিয়েছ।' কথাগুলো চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন বখত সাহেব।

'সেটা কোন অন্যায় করিনি আমি।' কঠোর স্বরে বলল রুখসানা। ক্রোধে তার নাকের বাঁশিটা ফুলে উঠেছে। ঠোঁট দুটো কাঁপছে।

'অন্যায়? ন্যায়-অন্যায় শেখাচ্ছ আমাকে? পি.আই.এ. থেকে যখন জানে আলমের চাকরি চলে গিয়েছিল তখন তাকে টাকা পয়সা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল কে? ব্যবসার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল কে? নিশ্চিত কারাবাস থেকেই বা তাকে বাঁচিয়েছিল কে? এই বেদার বখত।' দাঁত খিঁচিয়ে বললেন বখত সাহেব।

'কিন্তু ওঁর চাকরি চলে যাবার জন্যই বা দায়ী কে? কোন শয়তানের পাল্লায় পড়ে ওঁর চাকরি চলে গিয়েছিল? কোন আশায় তাঁকে আপনি ব্যবসায়ের টাকা দিয়েছিলেন? আর তার কতগুণ আপনি তার বদৌলতে আয় করেছেন? সে সব কথা ভুলে যাবেন না।'

'ভুলে আমি কিছুই যাই না। আর যাই না বলেই বেঈমানীর সাজা হিসেবে তাকে চরম শাস্তি দিয়েছি।'

'ও, তাহলে কুয়াশা সেজে আপনিই আমার স্বামীকে খুন করেছেন!'

হাঃ হাঃ করে হাসলেন বখত সাহেব, 'অর্থাৎ তোমার সন্দেহ ছিল? কিন্তু তোমার তো সন্দেহ থাকবার কথা নয়। ও নামটা তো নেওয়া হয়েছে শুধু পুলিসকে বোকা বানাবার জন্যে।'

'পুলিসকে অতটা বোকা মনে না করলেই ভাল করতেন। তাছাড়া কুয়াশা। সে যখন জানতে পারবে?'

'জানতে পারবে মানে? জানবে কি করে? সে তো অসম্ভব।'

'আমি যদি বলে দিই।'

আবার উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন বখত সাহেব, 'তুমি বলবে! তোমার মারণ কাঠি আমার কাছে আছে না? আমি ধরা পড়লে তুমি নিস্তার পাবে মনে করেছ?'

'নাইবা পেলাম। বড় জোর জেল হবে কয়েক বছরের।'

'তাতে ইজ্জত বাড়বে না।'

'কিন্তু অনিচ্ছাকৃত অপরাধের শাস্তি পাব।

'কিন্তু সে সুযোগ তুমি পাচ্ছ কোথায়? একবার বাঘের গর্তে যে ঢুকেছে সে কখনও তার কবল থেকে রক্ষা পেতে পারে না। আমার এই ফার্মের বাইরে জীবিত অবস্থায় বেরিয়ে যাবার সাধ্য তোমার নেই। আর তোমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবার সাধ্যও কারও নেই। বেশি বাড়াবাড়ি করলে খুন করে বঙ্গোপসাগরের পানিতে ফেলে দেব। তাইবা কেন করব? একটা চিতাবাঘ পুষেছি, তার খাঁচায় ছেড়ে দেব। নিদেনপক্ষে দবীর খাঁর হাতে ছেড়ে দেব। আর আমার কথা যদি শোন তাহলে তোমার ভালই হবে। কি রাজি?'

'কি কথা?'

'তুমি তো জানই।'

'মানে, নোট জাল করতে হবে?'

'শুধু নোট জালের জন্য এত কষ্ট করতে যাব কেন? অনেক কিছু জাল করবার আছে। যেমন—ডিফেন্স বণ্ড, প্রাইজ বণ্ড, সেভিংস সার্টিফিকেট, স্বাক্ষর, অনেক—অনেক কিছু। যখন যেটা দরকার হবে। রাজি?

'না।'

'বেশ, তাহলে তোমাকে প্রথম রাউণ্ডে দবীর খাঁর হাতেই তুলে দেব। দবীর! দবীর খাঁ।'

'না না। ওকে ডাকবেন না। ওকে ডাকবেন না। ওকে দেখলেই আমার ভয় করে। প্লীজ।' করুণ আবেদন ঝরে পড়ল রুখসানার কণ্ঠে।

আকাশ ফাটিয়ে আবার হাসলেন বখত সাহেব, অনেকক্ষণ একটানা হাসি। দবীর খাঁ এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিল। হাতের ইশারায় তাকে চলে যেতে বললেন। লোকটা চলে গেল।

হাসি থামিয়ে বললেন, 'তাহলে রাজি? তাই না? দেখ আমি কাজের মানুষ। অনেকক্ষণ সময় তোমাকে দিয়েছি। আর নয়। মস্করা করার সময় আমার নেই। রাজি হলে বলে ফেল।' ঘড়ি দেখে বললেন, 'এক মিনিট সময় দিলাম সিদ্ধান্ত নেবার জন্যে।'

'বেশ, আমি রাজি।'

'এই তো লক্ষ্মী মেয়ের মত কথা। এখানে তোমার থাকবার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করে রেখেছি। ঘরটা অবশ্য আণ্ডার-গ্রাউণ্ডে। তবে আলো হাওয়ার কমতি হবে না। একেবারে আধুনিক ব্যবস্থা। কিন্তু ঐ দেখ, পালাবার চেষ্টা কর না। অবশ্য যখন খুশি উপরে আসতে পারবে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই।'

'কিন্তু একবার আমাকে বাসায় যেতে হবে।'

'না, সেটা সম্ভব নয়। কিছু দরকার হলে বল। তোমার জন্য আলাদা চাকর

থাকবে। সব ব্যবস্থা করে দেবে সে।'

'আমার নিজের একবার যাওয়া দরকার।'

'তা হয় না। বিশ্বস্ততার নির্ভুল প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত এই ফার্ম-এরিয়ার বাইরে তুমি যেতে পারবে না। দবীর খাঁ, হাসমত আলীকো বোলাও।'

বাইরে কণ্ঠ শোনা গেল, 'জ্বি, সরকার।'

রুখসানা মনে মনে হাসল। যাক, অভিনয়টা ভালই হয়েছে। শহীদ খানের নির্দেশ অনুযায়ী প্রথম পালাটা সাফল্যের সাথেই সে পাড়ি দিয়েছে। অবশ্য শেষ রক্ষা করতে পারলেই হয়।

সাত

'বস্, একটা চান্স আমাকে ডিটেই হবে। আমি যে রিয়েলি হিরো একটা চান্স পেলেই প্রমাণ করে ডেব। চোঢরীকে যারা হট্যা করেছে একবার চান্স ডিলেই ওডের খটম করে ডেব আমি।'

'নিশ্চয়ই, মি. ডি. কস্টা। আপনাকে তো সেই বদমাশদের খতম করার জন্যই নিয়ে যাচ্ছি। একেবারে খতম করে দিয়ে আসবেন।' অন্ধকার পথের দিকে দৃষ্টি রেখে বলল কুয়াশা।

'কিন্টু আপনি যেন আবার পালিয়ে যাবেন না। আমি ঠাকটে আপনার কোন ভয় নেই,' বুক ঠুকল ডি. কস্টা।

'সে তো আমি জানিই, মি. কস্টা। সেই জন্যেই তো আপনাকে সাথে করে এনেছি। আমি কি আর এসব কাজ পারি? আপনি আছেন, সেই ভরসাতেই যাচ্ছি।'

ফৌজদারহাট সড়ক বেয়ে চলছে গাড়ি। রাত বারটার কাঁটা পেরিয়ে গেছে। গাড়ি চালাচ্ছে কুয়াশা। পাশের আসনে বসে তাকে অভয়বাণী শোনাচ্ছে ডি. কস্টা।

পোলট্রি-ফার্মের প্রাইভেট পথের মুখ ছাড়িয়ে প্রায় পোয়া মাইল দূরে গাড়ি থামাল কুয়াশা। বাতিটা নিভিয়ে দিল। পথ নির্জন, নিঃশব্দ। পথের দু'পাশে ঘন জঙ্গল। এখান থেকে হাতের ডাইনে প্রায় দু'শ গজ দূরে ফার্ম।

পথের উপর গাড়ি রাখা নিরাপদ নয়। বখত সাহেবের অনুচররা নিয়মিত টহল দেয় তা জানতে পেরেছে কুয়াশা। তাদের চোখে পড়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সুতরাং গাড়িটাকে জঙ্গলের মধ্যে কোথাও ঢোকাতে হবে। গাড়ি থেকে নামল কুয়াশা। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে এদিক-ওদিক ঘুরে এল। গাড়ি ঢোকাবার মত একটা প্রবেশ-পথ পাওয়া গেল অবশেষে। ফিরে এসে গাড়িটা নিয়ে গেল উঁচু-নিচু পথ দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে।

ডি. কস্টার চোখ দুটো বুজে এসেছিল। পেটে মাল পড়েছে বিস্তর। কিন্তু উঁচু-নিচু জায়গায় গাড়ি ঢোকানোর ধকলে তার মৌতাতটা ভেঙে গেল। চোখ খুলে

দেখল অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে গাড়িটা।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল ডি. কস্টা। সভয়ে ডাকল, 'বস্।'

'বলুন, মি. কস্টা?'

'বাঘ-টাঘ নেই টো এই জঙ্গলে? অবশ্য বাঘকে আমি ঠোড়াই ডরাই। আমার মামা মস্টবড় শিকারি ছিলেন টো। আমিও খুব ভাল মার্কসম্যান।'

'বাঘ মেরেছেন ক'টা?'

'চান্স পেলাম কোঠায়? ডেশের সব বাঘ টো মামার হাটেই মারা গেল। কটো করে বললুম, অন্টটঃ ভাগ্নের জন্য একটা বাঘ রাখ। টা শুনল কই। বস্?'

'আবার কি হল?' কুয়াশা প্রশ্ন করল।

'আপনি একাই যাবেন, না আমি আসব সাঠে? যডি কেউ আপনাকে আক্রমণ করে? ওরা ডুষ্টু লোক টো।'

'এখন আমি একাই যাই। খোঁজটা নিয়ে আসি। তারপর আপনি নিজে যাবেন। পিস্তলটা সাথে আছে তো?'

'আছে, বস্।'

'ওতে কিন্তু গুলি ভরা আছে। দেখবেন শেষটায় আমাকেই গুলি করে বসবেন না যেন।'

'কি যে বলেন, বস্!' জিভ কাটল ডি. কস্টা।

একটু পরেই জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেল কুয়াশা। কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথি হবে বোধহয় আজ। আর একটু পরেই চাঁদ উঠবে। কিন্তু আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন। জঙ্গলের ভিতরটা নিবিড় অন্ধকার। দূরে দৃষ্টি চলে না। ফ্ল্যাশ লাইটের আলোয় এগোতে লাগল কুয়াশা। মিনিট দশেক এগোবার পরেই সে উঁচু দেয়ালের কাছে গিয়ে পড়ল। প্রায় দুই মানুষ সমান উঁচু দেয়াল। উপরে কাঁটাতার। দেয়ালের পাশ দিয়ে পশ্চিম দিকে এগোতে লাগল। সেই গাছটা, সেটা কোথায়? ওই তো সেই গাছটা।

বিরাট একটা কড়ই-গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়াল কুয়াশা। ফ্লাশ লাইটটা নিভিয়ে পকেটে পুরল। চুপ করে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল গাছের তলায়। রাত-জাগা পাখির ডাক ছাড়া অন্য শব্দ তার কানে এল না।

অন্ধকারটা সয়ে এলেও দৃষ্টি দূরে যায় না। তবু সন্ধানী দৃষ্টিতে চারদিকে চোখ বুলাল একবার কুয়াশা। তারপর তরতর করে গাছ বেয়ে উঠল। মোটা একটা ডাল দেয়ালের হাত কয়েক উপর দিয়ে ফার্মের অভ্যন্তরে প্রসারিত হয়ে আছে। ডালটা বেয়ে এগিয়ে গেল সে। তার দেহের ভারে ডালটা নুয়ে পড়ল। দেয়ালের সীমানা পার হয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে পকেট থেকে নাইলনের কর্ড বের করে ডালটাতে মজবুত করে বাঁধল সে। তারপর আস্তে করে ঝুলে পড়ল কর্ড ধরে।

ফার্মের ভিতর যে জায়গাটাতে সে নামল সেখানটায় এদিকে-ওদিকে ছোট-খাট ঝোপঝাড়। পশ্চিমে অনেকটা দূরে একটা বাতি দেখা যাচ্ছে। ওটাই বোধহয় বেদার বখতের অফিস। বাতি লক্ষ্য করেই এগোতে লাগল সে। ঝোপঝাড় পার হয়ে ফাঁকা মাঠ। হাঁটু সমান উঁচু ঘাস। চোরকাঁটায় ভর্তি।

কমলার কোয়ার মত আধ ফালি চাঁদ মুহূর্তের জন্যে দেখা দিয়ে মেঘের আড়ালে মিলিয়ে গেল। মাঠ পেরিয়ে সারিবদ্ধ গাছ। গাছের সারিটা বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত। বোধহয় কড়ই-গাছের সারি। উঁচু। মাঝে মাঝে হাওয়ার সর্সর্ শব্দ আসছে। সারিবদ্ধ গাছের তলায় সম্ভবত বুক সমান উঁচু বেড়া। অস্পষ্ট আলোয় দেখা গেল তরুশ্রেণীর ওপারে সিমেন্টের বাঁধানো চওড়া পথ।

সারিবদ্ধ গাছের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল কুয়াশা। গতিশীল একটা আলো চোখে পড়ল তার। আলোটা এদিকেই আসছে। একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াল কুয়াশা। দেহটাকে গাছের সাথে মিশিয়ে দিল।

মানুষের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। উঁকি দিয়ে দেখল কুয়াশা, দু'জন লোক আসছে বাঁধানো পথের উপর দিয়ে। একজনের হাতে টর্চলাইট।

দূরে কোথা থেকে যেন 'গুড়ু গুড়ু গুড়ু গুড়ু' শব্দ ভেসে আসছে গভীর নৈঃশব্দ ভেদ করে। শব্দটা ক্রমেই উচ্চতর হচ্ছে। মেঘের আওয়াজ নয় বা দূরে পথ চলতি কোন মোটর গাড়ির আওয়াজও নয়। প্লেনের শব্দ। হয়ত পতেঙ্গা বিমান বন্দরের দিকে কোন বিমান যাচ্ছে। কিন্তু এদিক দিয়ে তো কোন বিমান আসবার কথা নয়। শব্দটা আসছে দক্ষিণ অর্থাৎ সোজা বঙ্গোপসাগরের দিক থেকে।

সামনের দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করল কুয়াশা। লোক দুটো চওড়া রাস্তাটার দু'পাশে কয়েকটা মশাল জ্বালিয়ে দিয়েছে। দু'পাশে দু'সারি মশাল। বোধহয় কেরোসিনে ভেজানো তুলো দিয়ে জ্বালানো হয়েছে মশালগুলো। চারদিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে আলোকিত হয়ে উঠেছে। আগুনের তাপ এসে লাগছে তার কপালে, চোখে, মুখে। দুই সারিতে ছ'টা করে মোট বারটা মশাল জ্বলছে। সর্বশেষ মশালটা এইমাত্র জ্বালানো হল। প্রায় দু'শ গজ পর্যন্ত জায়গা জুড়ে আলোকিত হয়ে আছে উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত। মশাল জ্বালানো শেষ করে লোক দুটো দূরে অন্ধকারে সরে গেল।

বিমানটার গর্জন প্রচণ্ডতর হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। খুব কাছে—একদম মাথার উপর এসে পড়েছে। উপরের দিকে তাকাল কুয়াশা। একটা হেলিকপ্টার, মাথার উপর বিরাট একটা পাখির মত ঘুরছে। আরও দু'একটা চক্কর দিয়ে চারদিকের হাওয়ায় প্রচণ্ড আলোড়ন তুলল। গাছের পাতায় কাঁপন তুলে হেলিকপ্টারটা নেমে এল দু'সারি মশালের মাঝখান দিয়ে। পাখাটা এখনও ঘুরছে।

নিঃশ্বাস রোধ করে পরবর্তী দৃশ্যের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল কুয়াশা। হেলিকপ্টারটা ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। মোড় ঘুরে পশ্চিমে অন্ধকারে এগিয়ে

যাচ্ছে হয়ত কোন অদৃশ্য হ্যাঙ্গারের দিকে। আগুনগুলো নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছে। গগলস্, হেলমেট ও লেদারকোট পরা পাইলটকে চেনবার প্রশ্নই ওঠে না।

বঙ্গোপসাগরের তীরে এই বিরাট এলাকা জুড়ে ফার্ম স্থাপনের অর্থটা এতক্ষণে স্পষ্ট হয়ে উঠল কুয়াশার কাছে। অন্য কারও সন্দেহের উদ্রেক না করেই অনায়াসে সাগরের উপর দিয়ে বিমান চালিয়ে সোজা নামানো যেতে পারে এখানে। বাইরের লোকের চোখে পড়লেও তারা মনে করবে বিমানটা হয়ত বিমান-বন্দরের দিকেই যাচ্ছে। অথবা হয়ত পরীক্ষামূলক ফ্লাইটে বেরিয়েছে। কিন্তু কুয়াশার মত করে কেউ যদি গোপনে এখানে ঢুকে পড়বার সুযোগ পায়, তাহলে ব্যাপারটা বুঝতে কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু কেউ কি এতদিনে সে সুযোগ পেয়েছে?

লোক দুটো চলে গেছে হেলিকপ্টারের পিছনে পিছনে। কুয়াশা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়ল। পাশ দিয়ে সড়াৎ করে একটা কাঠবিড়ালী লাফ দিয়ে সরে গেল। মেঘের আড়াল থেকে চাঁদটা আবার উঁকি দিয়েছে। সে আলোয় কুয়াশা দেখতে পেল কাঠবিড়ালীটা আর একটা লাফ দিয়ে গাছের নিচে ঝোপের মধ্যে ঢুকতে গিয়েই ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল। 'ক্যাঁও' করে একটা শব্দ করে ছটফট করতে লাগল। মাথা নুইয়ে দেখল সে কিছুক্ষণ কাঠবিড়ালীটাকে। স্থির হয়ে গেল ছোট্ট প্রাণীর দেহটা। মরে গেছে।

চাঁদটা আবার মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে। কাঠবিড়ালীটার আকস্মিক মৃত্যুর কারণ খুঁজে বের করার জন্য সে ফ্ল্যাশলাইটটা মাটির খুব কাছে নিয়ে জ্বালল। ঝোপঝাড়ের ভিতর ছয় ইঞ্চি পর পর তামার তার, মাটি থেকে প্রায় পাঁচ ফুট উঁচু। ঐ তারে লেগেই মারা গেছে কাঠবিড়ালীটা। আহা বেচারী! তব মনে মনে কুয়াশা মৃত প্রাণীটাকে ধন্যবাদ জানাল।

মশাল ও হেলিকপ্টার নিয়ে সে এতক্ষণ এমন ব্যাপৃত ছিল যে তার ঠিক দু'হাত দূরেই যে মৃত্যু নীরবে অপেক্ষা করছে তা চিন্তা করার মত সময়ও সে পায়নি। উপরের দিকে তাকাল সে। যা ভাবা গিয়েছিল তাই। ডালেও তামার তার জড়ানো। একটু এগিয়ে গিয়ে পাশের গাছটাও দেখল কুয়াশা। সেটার ডালেও তার জড়ানো।

ফিরে এল কুয়াশা। মিনিট পনের পরে সে গাড়ির কাছে এসে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে ডাকল, 'মি. ডি. কস্টা, মি. ডি. কস্টা।'

কোন সাড়া পাওয়া গেল না। ফ্ল্যাশলাইটটা জ্বালল কুয়াশা। ডি. কস্টা নেই। মাটিতে পড়ে আছে ভাঙা একটা বোতল। এদিকে ওদিকে খানিকক্ষণ খোঁজ করল কুয়াশা। কোথাও পাওয়া গেল না। গাড়ির ভিতরেও নেই। রাস্তার দিকে গেল। সেখানেও পাওয়া গেল না। চিন্তিত হল কুয়াশা। গাড়ির কাছে ফিরে এল সে। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। স্টার্ট দিল গাড়িতে। কিন্তু গাড়ি চলল না। কিছুক্ষণ চেষ্টা করে নেমে এল কুয়াশা। টর্চ জ্বালিয়ে দেখল চারটে চাকার মধ্যে একটারও

পাম্প নেই। ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল, ধারালো কোন অস্ত্র ঢুকিয়ে কেটে ফেলা হয়েছে চারটে টায়ারই।

আবার রাস্তার দিকে এগোল কুয়াশা। আকাশে মেঘ আর নেই। পিচ-ঢালা পথের উপর আলোর বন্যা। হেঁটে চলল সে। কিছুক্ষণ পরেই মোটর গাড়ির শব্দ কানে এল। পিছনের দিক থেকে শব্দটা আসছে। দাঁড়িয়ে পড়ল পথের উপর। একটা গাড়ির হেড-লাইট দেখা যাচ্ছে। দ্রুত গতিতে আসছে গাড়িটা। কাছে আসতেই গাড়িটার গতি স্তিমিত হল। ধীরে ধীরে এসে থামল কুয়াশার পাশেই।

'কুয়াশা!'

'কে, শহীদ?'

'হ্যাঁ,' দরজা খুলতে খুলতে জবাব দিল শহীদ। নেমে এল পথের উপর। বলল, 'কামাল আর তোমার সেই পাগলা খ্রীস্টানটা ধরা পড়েছে বেদার বখতের লোকদের হাতে।'

'কামালও ধরা পড়েছে! কিন্তু কিভাবে?'

তোমার ঐ পাগলা লোকটার দোষে। আমি আর কামাল এসেছিলাম ফার্মের ভিতরে ঢুকবার চেষ্টা করার জন্যে। গাড়িটা প্রায় মাইলখানেক দূরে রেখে দিয়েছিলাম। তারপর হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এসে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম। তোমার গাড়িটা আমার চোখে পড়েনি। কিন্তু লোকটা আমাদের দেখেই ভয়ে চিৎকার করে উঠল। বেদার বখতের লোকও সেই সময় এসে পড়েছিল। চিৎকার শুনে ওরা এগিয়ে এসে লোকটাকে ধরে ফেলল। পালাবার চেষ্টা করতেই পিস্তলের গুঁতো দিয়ে অজ্ঞান করে ফেলে দিল। আমরা দু'জন গেলাম ওকে হেলপ করতে। কামাল একটা গাছের গুঁড়িতে পা আটকে পড়ে গেল। তাকে তুলতে যেতেই আমার উপর দু'জন ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোনক্রমে ওদের কবল থেকে রক্ষা পেয়ে লুকিয়ে পড়লাম। কিন্তু ততক্ষণে প্রায় বার-তেরজন লোক এসে গেছে। আর এগোতে সাহস পেলাম না।' শেষের দিকে করুণ শোনাল শহীদের কণ্ঠ।

'আর একবার চেষ্টা করে দেখতে চাও?' কুয়াশা প্রশ্ন করল।

'তাতে লাভ হবে কি?'

'সম্ভাবনা কম।'

'তাহলে কি করা যায়?

'চিন্তার কি আছে? দু-একটা দিন অপেক্ষা কর।'

'এখন কি করবে?' শহীদ প্রশ্ন করল।

'আপাতত চট্টগ্রাম শহরে ফিরে যাব।'

'চল তাহলে আমার গাড়িতে।'

'চল। আমার গাড়ির চারটে টায়ারই ফাঁসিয়ে দিয়েছে।'

কিছুদূর এগোবার পর শহীদ বলল, 'ভাবছি সকালেই মি. সিম্পসনকে নিয়ে পুলিস বাহিনীসহ চড়াও হব ফার্মে।'

'তাতে লাভ হবে না। বরং ক্ষতি হবে। তাছাড়া, সে ন্যাশনাল এসেম্বলীর মেম্বার। তাকে অ্যারেস্ট করতে গেলে এবং সম্ভবত রেইড করতে গেলেও গভর্নমেন্টের পারমিশন দরকার। আর সে পারমিশনের জন্যে বখত সাহেবের বিরুদ্ধে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ চাই। সে প্রমাণ আছে?'

'অন্তত একটা প্রমাণ তো হল, ফার্মে কামালের বন্দীত্ব?'

'সেটা তো বখত সাহেবেরই পক্ষে যাবে। মাঝখান থেকে বেআইনী অনুপ্রবেশকারী হিসেবে শাস্তি পাবে কামালই।'

'তাও তো বটে।' কুয়াশার যুক্তিটা মেনে নিল শহীদ।

কুয়াশা বলল, 'তাছাড়া আমার মনে হয় কয়েকদিন চুপচাপ থাকাই ভাল। অন্যথায় বেদার বখত আরও বেশি সাবধান হয়ে যাবে। হয়ত কামালকে সরিয়েই দেবে চিরতরে। ভাল কথা, কামালকে বেদার বখত চেনে নাকি?'

'না, বোধহয়। আমার সাথেও সাক্ষাৎ পরিচয় নেই। নামটা শুনেছে অবশ্য। জানে আলম চৌধুরীর হত্যাকারীকে অর্থাৎ কুয়াশাকে খুঁজে বের করার অনুরোধ করেছিল।'

'সেই আমন্ত্রণেই এসেছিলে বোধহয়?' হাসল কুয়াশা।

প্রত্যুত্তরে শহীদও হাসল। বলল, 'আমি এসেছি মিসেস চৌধুরীর অনুরোধে।'

'তা, আমার পিছু ছেড়ে বেদার-বখতের পিছনে ধাওয়া করছ কেন?' হালকা সুরে প্রশ্ন করল কুয়াশা।

শহীদ কোন জবাব দিল না।

গাড়ি চট্টগ্রাম শহরে প্রবেশ করতেই কুয়াশা বলল, 'আমি এবার নামব। যদি কিছু মনে না কর, তাহলে আবার তোমাকে অনুরোধ করব, কয়েকদিন চুপচাপ কাটিয়ে দিতে।' গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল কুয়াশা।

'কিন্তু মি. সিম্পসন তো ছাড়বেন না। তিনি খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন এ নকল কুয়াশার হদিস জানবার জন্যে। আজকে আমার সাথে তাঁর কথা হয়েছে। তাঁর ধারণা আমি অনেক দূর এগিয়ে গেছি।'

'কিছু জেনেছেন?'

'মোটেও না। তাঁকে এখনও কিছু বলবার সময় আসেনি। উনি একেবারে অন্ধকারে আছেন আর সেই জন্যেই অস্থির হয়ে উঠেছেন বেশি। তাছাড়া তাঁর ধারণা হয়েছে, মিসেস চৌধুরীও নকল কুয়াশার পাল্লায় পড়েছে। তাঁর অস্থিরতার সেটাও একটা কারণ।'

'তাকে যেভাবে হোক ঠাণ্ডা কর।'

'দেখি চেষ্টা করে।' গাড়িতে স্টার্ট দিল শহীদ। রাত তিনটে বেজে গেছে।

কিন্তু বখত সাহেবের পোল্ট্রি ফার্ম এখনও পুরোপুরি ঘুমিয়ে পড়েনি। একটা কক্ষে এখনও জোরাল আলো জ্বলছে। বখত সাহেব একটা ডিভানে বসে আছেন। তাঁর চেহারাটা ক্রোধে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।

সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে দবীর খাঁ। তার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি মেলে বখত সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'ধরা পড়েছে ক'জন?'

'দো আদমী, হুজুর।'

'পালিয়ে গেছে ক'জন?'

'এক আদমী।'

'পালাল কি করে?

'একা, হুজুর, তিনজনকে কায়দা কোরতে পারিনি। আর লোকটাকে দুবলা দেখলে কি হোবে গায়ে তাগদ বহুত।'

'আর তুমি কি ঘাস খাও? জমিরুদ্দিন, কমর এরা যায়নি?'

উর্দু-বাংলা মেশানো বিচিত্র ভাষায় দবীর খাঁ জবাব দিল, 'নাকের উপর এমন একটা পাঞ্চ কোষল যে মাথাটা আমার ঘুরিয়ে গেল। আমি আচ্ছাছে খাড়া হোনে কো আগেই চো-চা দৌড় দিল। হামি ভি নসুমিয়াকে পাস দো আদমীকো ছোড়কে দৌড় দিলাম। তো হুজুর, আন্ধারমে বিলকুল ভাগ গেল। জমিরুদ্দিনরা, স্যার, পরে গিয়েছিল। তোখন লোকটা ভেগে গেছে।'

'রেখেছ কোথায়, ওদের?'

'তিন নম্বর মে। বেগম সাহেবের পাশের রুমে।'

'ইডিয়ট। এখুনি ওদের সরাও। চল, আমি যাচ্ছি।'

'চলিয়ে, হুজুর।'

ডিভান থেকে নামলেন বখত সাহেব। দরজা খুলে সরু প্যাসেজ দিয়ে এগোতে লাগলেন। দবীর খাঁ নীরবে অনুসরণ করল।

একটা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল দু'জন। কোমর থেকে চাবি বের করে তালা খুলল দবীর খাঁ। দরজার পাশেই সুইচবোর্ড। একটা সুইচ টিপে দিল। রিভলভার বের করলেন বখত সাহেব।

দরজা খুলতেই ষাট পাওয়ারের বিদ্যুতের আলোয় দেখা গেল রুমের দু'জন বাসিন্দার মধ্যে একজন শূন্য মেঝেতে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। লোকটা ডি. কস্টা। তার ঠোঁটের কোণ বেয়ে লালা গড়াচ্ছে। অন্যজন কামাল! সে দেয়ালে হেলান দিয়ে আগন্তুকদের দিকে ঔৎসুক্যভরে তাকিয়ে আছে।

তার চেহারায় যন্ত্রণার ছাপ কিন্তু চোখে আশার আলো। পিস্তল হাতে বখত সাহেবকে দেখেই চোখের আলোটা মুহূর্তে দূর হয়ে গেল।

বখত সাহেব সেটা লক্ষ্য করলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কামালের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'শ্বশুর বাড়ির সদর রাস্তাটা বোধহয় চিনতে পারনি! তাই

পিছন দিক দিয়ে ঢুকবার চেষ্টা করছিলে। কোথা থেকে উদিত হয়েছ, বাছা?'

কামাল কোন উত্তর দিল না।

'কথা বলবে না বলে মনে করেছ? ভুল করছ। বলতেই হবে। আগে হোক পরে হোক।'

দবীর খাঁ ডি. কস্টার দিকে এগিয়ে গেল। পা দিয়ে একটা গুঁতো দিল ডি. কস্টার গালে। মাথা নুইয়ে মুখটা দেখল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'শ্লা ভিরমি গেছে, হুজুর।'

সেকথা কানে তুললেন না বখত সাহেব। বললেন, 'বুঝলে তো চাঁদ, উত্তম-মধ্যম দিয়ে আমি মূককে বাচাল করতে পারি।'

দবীর খাঁকে বললেন, 'এটাকে আগে নিয়ে যা, ওকে পরে এসে নিয়ে যাবি। চল হে। দরজাটা বন্ধ করে দে, দবীর।'

'শেষ ক রে দেব, হুজুর?'

প্রশ্নটা শুনে কেঁপে উঠল কামাল।

'অত তাড়াহুড়ো করার কি আছে? আলাপ পরিচয় হোল না। আজ আমার সময় হবে না। তবে ইচ্ছে করলে হাতের সুখ করে নিতে পারিস,' নির্বিকার কণ্ঠে বললেন বখত সাহেব।

রিভলভার উদ্যত করে রইলেন বখত সাহেব। কামাল তাঁর সামনে। আগে খেয়াল করেনি সে, এখন সে দেখল সরু প্যাসেজের দুই পাশে অনেকগুলো দরজা। নিশ্চয়ই অনেকগুলো রুম আছে। কোনটা বাইরে থেকে তালা দেওয়া। কোনটা ভিতর থেকে বন্ধ।

কিছুদূর এগোবার পর বখত সাহেব বললেন, 'ডাইনে যাও।' ডাইনে আর একটা প্যাসেজ। মোড় ঘুরল কামাল। পিছন থেকে বখত সাহেবের কণ্ঠটা আবার শোনা গেল, 'কারও সাধ্য নেই, তোমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাবার। নিজে তো পারবেই না। তাছাড়া যেখানে তোমাকে রাখব সেই রুম থেকেও সারাজীবনে তুমি বেরোতে পারবে না।'

আরও একবার মোড় ঘুরতে হল। তারপর বখত সাহেব বললেন, 'থাম।'

থামল কামাল। বখত সাহেব ডাকলেন. 'দবীর খাঁ।'

'জ্বি, হুজুর।'

পাশের একটা দরজা খুলে গেল। দবীর খাঁ কামালকে ইশারা করে বলল. 'অন্দর ঘুসো।

নীরবে নির্দেশ পালন করল কামাল। রুমের ভিতরটায় অস্পষ্ট আলো। একটা বিছানাও দেখা যাচ্ছে। অনাহূত আগন্তুকদের প্রতি উদারতার অন্ত নেই বখত সাহেবের।

রুমের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল কামাল। বখত সাহেব বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

রিভলভারটা নামালেন না।

'ওকে সার্চ করেছিস?' প্রশ্ন করলেন তিনি।

'জ্বি, হুজুর।'

'কিছু পাওয়া গেছে?' বাঁ হাতে দাড়ি চুলকে জানতে চাইলেন।

'পাওয়া গেছে সিগারেট কেস আর সিগারেট লাইটার।'

'পিস্তল-টিস্তল?'

'জ্বি, নেহী। একটা পেন্সিল কাটনে কো ছুরি থা। তোবে ঐ লোকটার কাছে একটো পিস্তল পাওয়া গিয়েছে।'

'আর কিছু?'

'নেহি, সরকার।'

'বেশ, চলে আয় এবার।'

দবীর খাঁ বেরিয়ে গেল। একটু পরেই দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ দরজার দিকে তাকিয়ে রইল কামাল। তারপর ঘরটা দেখল ঘুরে ঘুরে। ঝকঝকে তকতকে চুনকাম করা দেওয়াল! ছাদটা অনেক উঁচুতে। আলো-হাওয়া ঢুকবার জন্যে ছাদের লাগালাগি দুটো ছোট খুপরির মত স্কাই-লাইট আছে। আলো নিশ্চয়ই ওখান দিয়ে ঢোকে না। কারণ, কক্ষটা যে মাটির তলায় তা সে প্রথমে ঢোকার সময়ই টের পেয়েছে। অথচ ব্যবস্থা সত্যি সুন্দর। মাটির নিচে ঘর হলেও হাওয়ার ব্যবস্থা আছে পর্যাপ্ত। শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে তেমন কষ্ট হয় না।

দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল কামাল। সেগুন-কাঠের শক্ত দরজা। এখানে-সেখানে টিপে দেখল। না, কোথাও গোপন কোন সুইচ জাতীয় কিছু চোখে পড়ছে না!

বিছানায় গিয়ে বসল। সিগারেট খেতে বড্ড ইচ্ছে করছে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে শূন্য হাতটা আবার বের করল। তাই তো, সিগারেট তো ওরা কেড়ে নিয়েছে।

শহীদ এখন কোথায়? সে-ও কি ধরা পড়েছে? না সে পালিয়ে যেতে পেরেছে? যদি পালিয়ে যেতে পেরে থাকে, তাহলে সে শীঘ্রই ওকে উদ্ধার করতে আসবে। কিন্তু ততক্ষণে বেদার বখতের ঐ ভয়ঙ্কর স্যাঙ্গাতটার কবল থেকে রক্ষা পেতে পারবে কি? কতক্ষণ ওকে বাঁচিয়ে রাখবে বখত সাহেব? নিশ্চয়ই বেশিক্ষণ নয়! তার আগে ওর পরিচয় জানতে চেষ্টা করবে। উদ্দেশ্য জানবার জন্যে অত্যাচার করবে।

মিসেস চৌধুরী কি এখনও বেঁচে আছেন? বখতসাহেব কি তাঁকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে? কোনক্রমে মিসেস চৌধুরীর সাথে দেখা করতে পারলে হয়ত বাঁচবার একটা উপায় বের করাও যেতে পারে। অবশ্য যদি উনি বেঁচে থাকেন আর ঐ শয়তানটার আস্থা অর্জন করতে পারেন।

আর এক ভরসা কুয়াশা এবং সম্ভবত শ্রেষ্ঠ ভরসা। দেখা যাক, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। সেই আশার দীপ জ্বেলে অনন্তকালের জন্যে অপেক্ষা করতে পারে কামাল।

আট

বখত সাহেবের প্রাতঃভ্রমণের অভ্যাস বহুদিনের। ফার্মের মধ্যেই সাধারণত তিনি সকাল বেলা পায়চারি করেন। সেদিন তিনি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে সমুদ্রের ধারে চলে গিয়েছিলেন। হঠাৎ বিমানের গর্জন কানে যাওয়ায় আকাশের দিকে তাকালেন। একটা হেলিকপ্টার তাঁর ঠিক মাথার উপরে ঘুরছে। নিচের দিকে নেমে আসছে ক্রমশ। দু-একটা পাক দিয়ে মুরগীর একটা বিরাট খাঁচার পিছনে ছোট এক ফালি জমিতে নেমে পড়ল। সভয়ে ডেকে উঠল মুরগীগুলো। কোনটা দৌড়ে, কোনটা উড়ে পালাবার চেষ্টা করল।

বিস্মিত বখত সাহেব স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর বুঝতে বাকি রইল না যে ককপিটে বসা লোকটা একটা ঝানু পাইলট। দেশলাই-বাক্সের উপরেও সে যেকোন বিমান নির্বিঘ্নে নামাতে সক্ষম। ঠিক যেমনটা পারত জানে আলম চৌধুরী।

পাইলট নেমে এল। হেলমেট আর গগলস্ না খুলেই ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল, 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত। সম্ভবত আপনার জায়গায় আমি হেলিকপ্টারটা নামিয়েছি। অথচ না নামিয়ে উপায় ছিল না।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ বখত সাহেব পাইলটের দিকে।

'হুঁ, বুঝতে পারছি।' নীরসকণ্ঠে বললেন বখত সাহেব।

পাইলট আবার বিনীত ভঙ্গিতে কৈফিয়ৎ দিল, 'সত্যি আমার উপায় ছিল না। খুব তাড়াতাড়ি তেল পুড়ছিল সুতরাং আমাকে নামতেই হল। আশা করি আপনার কোন ক্ষতি করিনি। যত তাড়াতাড়ি পারি আমি চলে যাব। দয়া করে যদি আমাকে পতেঙ্গা এয়ারপোর্টের পথটা দেখিয়ে দেন তাহলে আমি সেখানে গিয়ে মেকানিক নিয়ে আসতে পারি।' হেলমেট ও গগলস্ খুলতে খুলতে পাইলট বলল।

বেদার বখত জবাব দিলেন না। পাইলটকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, 'আসুন আপনি আমার সাথে।'

'এক মিনিট,' কুয়াশা বলল।

হেলিকপ্টারের দিকে ফিরে গেল সে। ককপিট থেকে একটা চামড়ার অ্যাটাচি কেস নিয়ে ফিরে এল। কেসটার বেল্ট সম্ভবত ভাল করে আটকানো হয়নি। বখত সাহেবের কাছে আসতেই ঢাকনিটা খুলে গেল। ভিতর থেকে জিনিসপত্রগুলো ছড়িয়ে পড়ে গেল মাটিতে। শার্ট, প্যান্ট, মোজা, পাজামা, শেভিং-ট্যাকল, টুথ-ব্রাশ, পেস্ট ইত্যাদি নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের কোনটাই বেরোল না কেস থেকে।

কাশির লজেন্সের কৌটোর মত ছোট ছোট অনেকগুলো কৌটো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। বস্তুত, কৌটোগুলোর গায়ের লেবেলে লেখাও ছিল কফ-লজেন্স। কিন্তু একটা কৌটো খুলে গিয়ে সাদা গুঁড়ো বেরিয়ে পড়ল।

কুয়াশা হাঁটু গেড়ে বসে দ্রুত কৌটোগুলো তুলে অ্যাটাচি কেসে পুরল। সাদা পাউডারগুলোও খোলা কৌটোতে ভরল। আর যখন বখত সাহেব তার ঘাড়ে স্পর্শ করলেন, তখন সে চমকে উঠল।

বখত সাহেব বললেন, 'আমার ঔৎসুক্য ক্ষমা করবেন, কিন্তু আপনার লাগেজ তো মোস্ট আন-ইউজুয়্যাল?'

বোকার মত হাসির ভান করল কুয়াশা, 'হ্যাঁ, তা একটু তো বটেই। আমি হংকং-এর একটা মেডিক্যাল ফার্মের রিপ্রেজেন্টেটিভ। কোম্পানির পক্ষ থেকে পাকিস্তানে এসেছি।' বেল্টটা বাঁধতে বাঁধতে কুয়াশা বলল।

'হুঁ।' হেলিকপ্টারটার দিকে তাকিয়ে বললেন বখত সাহেব, 'এই হেলিকপ্টারে করেই বুঝি চলাফেরা করেন? অতদূর থেকে তো কেউ হেলিকপ্টারে আসে না? অবশ্য দরকার হয় না বলেই।'

'আপাতত আমি এসেছি রেঙ্গুন থেকে। ওখানে এখন আমাদের একটা অফিস নেয়া হয়েছে। আপনার অসুবিধা সৃষ্টি করায় আমি আন্তরিক দুঃখিত।'

'না না, তাতে কি হয়েছে? চলুন এগুলো থাক।' বখত সাহেবের কণ্ঠ নীরস আর অস্বাভাবিক শোনাল।

দু'জন চলতে শুরু করল। কুয়াশা অ দৃচোখে চেয়ে দেখল, বখত সাহেবের চেহারাটায় চিন্তার ছাপ। বারকয়েক তিনি কুয়াশার দিকে তাকালেন। চেহারা দেখে মনে হল কি যেন বলবেন। কুয়াশা নীরবে চলতে লাগল।

সামনেই দুই মানুষ-সমান উঁচু দেওয়াল। ডাইনে বাঁয়ে বহুদূর বিস্তৃত। এখানে-সেখানে ছড়ানো অনেক খাঁচা। নানা জাতের, নানা রঙের, নানা চেহারার হাঁস-মুরগী। নানা রকম পাখিও আছে। কয়েকজন লোক প্রাণীগুলোর তদারকি করছে। এদিকটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গাছ-পালাও নেই।

গেটের ভিতর দিকে বখত সাহেব তাঁর নতুন অতিথিকে নিয়ে অফিসের দিকে এগোলেন। অফিস-ভবনের বারান্দায় উঠে বললেন, 'যদি অসুবিধে না হয় তাহলে বলুন আপনার কি কি দরকার? আমি আমার শোফারকে পাঠিয়ে দিই এয়ারপোর্টে। এয়ারপোর্টের অফিসাররা আমাকে চেনে। আমি ফোন করে দিচ্ছি। কোন অসুবিধা হবে না। তাছাড়া কর্তৃপক্ষকেও ব্যাপারটা জানানো দরকার।' কথাগুলো বলার সময় পাইলটের প্রতিক্রিয়া তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করছিলেন তিনি।

'না না, তার দরকার নেই।' বিনীত কণ্ঠে আপত্তি জানাল কুয়াশা, 'আপনাকে এমনিতেই অনেক কষ্ট দিয়েছি।'

'কষ্ট আর কোথায়? এটুকু তো সবাই করে। তাছাড়া আপনার বোধহয় নাস্তাই

করা হয়নি। আসুন, আপনি আমার সাথে নাস্তা করবেন মি....?'

'হাসিবুল হাসান।'

'আসুন, মি. হাসান, এই দিকে।'

নাস্তাটা প্রায় নীরবেই সম্পন্ন হল। বখত সাহেব বার বার কি যেন বলতে গিয়ে চেপে গেলেন। অবশেষে অন্তরের অপ্রতিরোধ্য আবেগের মত প্রকাশ করেই ফেললেন, 'আপনার এই ওষুধ বিক্রির কাহিনীটা কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনি মোটেও।'

'বিশ্বাস করেননি?' ভ্রূ কোঁচকাল কুয়াশা। 'কিন্তু–

'নিশ্চয়ই না,' মুচকি হাসলেন বখত সাহেব। 'আমি দেখেই বঝেছি ওগুলো কোকেন।'

কুয়াশা হাসবার চেষ্টা করার ভান করল। নিচে চেয়ারের পাশে রাখা অ্যাটাচি কেসটার দিকে একবার তাকাল। তারপর দৃষ্টিটাকে কঠিন করে তুলল।

'অবশ্য,' বখত সাহেব অভয়বাণী শোনালেন। 'ভয়ের কিছু নেই। আমি ব্যাপারটা পুলিসকে জানাতে যাচ্ছি না। সে ভয় করবেন না। আমি ভাবছি অন্যকথা। তাহল, আপনার মত বুদ্ধিমান,সাহসী আর দক্ষ পাইলট এই সামান্য কাজ নিয়ে কিভাবে সন্তুষ্ট থাকেন? আশ্চর্য!'

'কাজটা কি আসলেই খুব সামান্য? তা নয়। তাছাড়া যে দিনকাল পড়েছে, অর্থ উপার্জন আগের মত সহজ নয় এখন।'

'কিন্তু এই কাজে তো আর লাখ লাখ টাকা আয় করা যায় না?'

হাসল কুয়াশা, 'ওটা তো আমার কাছে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে স্বপ্ন দেখার মত। আপনি যদি এমন কোন পথ দেখাতে পারেন যাতে লাখ লাখ টাকা আয় করা যায়, তাহলে আমি অবশ্যই তা করব।' জবাবের অপেক্ষায় বখত সাহেবের দিকে তাকিয়ে রইল কুয়াশা।

কিন্তু তৎক্ষণাৎ কোন জবাব দিলেন না বখত সাহেব। চা শেষ করে দুটো পান মুখে দিলেন। জানালার ধারে গিয়ে পিক ফেললেন। কুয়াশা সিগারেট ধরাল।

বখত সাহেব ফিরে এসে বসলেন আবার। সরাসরি কুয়াশার মুখের দিকে না তাকিয়ে বললেন, 'চট্টগ্রাম বিমান বন্দর থেকে একটা প্লেনে দশ টন সোনা হংকং হয়ে টোকিও যাচ্ছে। পথে বঙ্গোপসাগরের উপর প্লেনটাকে গুলি করে নামাতে হবে। যদি সাহস থাকে তবে এই কাজটা আপনি করতে পারেন। সোনাগুলোর দাম কম হলেও এগার কোটি টাকা হবে।'

স্তম্ভিত হল কুয়াশা। বখত সাহেবের মুখের দিকে অবাক দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল সে। অনেকক্ষণ বাক্‌স্ফূর্তি হল না তার।

'একেবারে বোবা বনে গেলেন যে?' হাসলেন বখত সাহেব।

'এটা কি সম্ভব?'

'সাহসী লোক হলে অবশ্যই সম্ভব। সমস্ত খবরই আমার জানা আছে। সমস্ত ব্যবস্থাই আমি করে রেখেছি। কিন্তু অসুবিধে হয়েছে পাইলট নিয়ে। আমার যে পাইলট ছিল সে গোলমাল পাকাচ্ছিল বলে সরিয়ে দিতে হয়েছে তাকে। অথচ এই মুহূর্তে একজন অত্যন্ত দক্ষ পাইলট আমার দরকার। আমি নিজেই যাব বলে ঠিক করেছিলাম কিন্তু দক্ষ পাইলট আমি নই। তাছাড়া আমার লড়াইয়ের অভিজ্ঞতাও নেই। আপনি যদি রাজি হয়ে যান···।' কুয়াশার চোখের দিকে তাকালেন বখত সাহেব।

'কিন্তু শুধুমাত্র পাইলট হলেই তো চলবে না?' চিন্তা জড়িত কণ্ঠে বলল কুয়াশা, 'একটা জঙ্গীবিমানও চাই যাতে মেশিনগান থাকবে এবং আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাও থাকবে।'

'আমি ইতিমধ্যেই একটা হেলিকপ্টার সংগ্রহ করেছি চট্টগ্রাম এয়ারপোর্ট থেকে। গতরাতে নিয়ে এসেছি কপ্টারটা। তাতে মেশিনগান ও কামান ফিট করা হয়েছে। কপ্টারটা বিদেশী। চট্টগ্রাম হয়ে যাচ্ছিল। ওতে প্রয়োজনীয় রসদও আছে। আমি নিজেই কপ্টারটা চালিয়ে নিয়ে এসেছি। তাও দিনের বেলায় নয়, রাতের বেলায়। রাতে কপ্টার চালানো আমার এই প্রথম।'

'আপনি নিজেই নিয়ে এসেছেন হেলিকপ্টারটা?'

'অবশ্যই।'

'কিন্তু আরও সমস্যা আছে।' কুয়াশা বলল, 'সোনাবাহী বিমানের পাইলট তো সব সময় উপকূলের সাথে যোগাযোগ রাখবে এবং তাকে সাহায্য করার জন্য নিকটবর্তী দেশের সরকারদের অনুরোধ করা হয়েছে নিশ্চয়ই।'

'তাতে কিছু এসে যায় না।' শান্ত স্বরে বললেন বখত সাহেব। 'এ তো আর যুদ্ধের সময় নয়? আসলে পাইলট তো কোন আক্রমণের আশঙ্কা করছে না। ঐ পথে হেলিকপ্টার প্রায়ই চলা-ফেরা করে। সুতরাং পাইলট কোন সন্দেহ করবে না। তাছাড়া আপনি আগেই চলে যাবেন। তারপর আকস্মিকভাবে হামলা করতে হবে। ঠিক মত আঘাত করতে পারলে উপকূলে খবর দেবার সময়ই পাবে না।'

'কিন্তু নেভী আছে। তাদের নিশ্চয়ই জানানো হয়েছে?'

'পাকিস্তান-নেভীকে অনুরোধ করা হয়েছে লক্ষ্য রাখতে। কিন্তু তাই তো বললাম, আক্রমণ করতে হবে আকস্মিকভাবে। আর উপকূল থেকে একশ' মাইল দূরে গিয়েই হামলা করতে হবে। এ ব্যাপারে ভুল করলে চলবে না।'

'কিন্তু সমুদ্র থেকে সোনা উদ্ধার হবে কিভাবে? প্লেন ডুবে যেতে তো বেশিক্ষণ লাগবে না?'

কুয়াশা যেন বোকার মত কথা বলেছে এই ধরনের একটা ভাব দেখিয়ে হাসলেন বখত সাহেব। বললেন, 'সে ব্যবস্থাও করা হয়েছে। আপনাকে শুধু আপনার দিকটা দেখতে হবে। সে দিকটা দেখবার লোক আছে। আপনি রাজি

আছেন কিনা তাই বলুন?'

কুয়াশা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, 'আই অ্যাম ইওর ম্যান।'

খুশির ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল বখত সাহেবের মুখে। সোনা-বাঁধানো দাঁত দুটো বের করে হাসলেন তিনি। বললেন, 'তাহলে আর আমার শোফারকে এয়ারপোর্টে পাঠাবার দরকার নেই।'

'কিন্তু আমার হেলিকপ্টারের কি হবে?'

'ওটা এখানেই থাকুক আপাতত। আমার হ্যাঙ্গারে স্থানাভাব ঘটবে না। মেকানিকও আছে। কোন ত্রুটি থাকলে সে মেরামত করতে পারবে।'

'তাহলে তো খুব ভাল হয়,' জোর দিয়ে বলল কুয়াশা। কিন্তু সে জানে তার হেলিকপ্টারে কোন গলদ নেই। সেটা ধরতে মেকানিকের বেশিক্ষণ লাগবে না।

বখত সাহেব কুয়াশার অ্যাটাচি কেসটা নিয়ে ডাইনিংরুমের কোণে বিরাট একটা সেফের মধ্যে রেখে দিলেন। সেফটা চাবি দিতে দিতে বললেন, 'আপনার স্যাম্পল নিরাপদে রইল। চলুন, এবার আপনাকে বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিই।'

'এখন এই সকাল বেলা বিশ্রাম!' আপত্তির সুরে বলল কুয়াশা।

'বেশ, তাহলে আসুন আমার সাথে। গত রাতে দুটো টিকটিকি ধরা পড়েছে। ওদের একটু খোঁজ-খবর করতে হয়। আপনিও না হয় আসুন?'

'না, না। মাফ করবেন, ওসবে আমার আগ্রহ নেই। আমি বরং একটা সংবাদপত্র পেলে পড়ে দেখতাম।'

কুয়াশা টিকটিকিদের চেনে। জানে,ধরা পড়েছে কামাল আর ডি. কস্টা। ডি. কস্টা যা বুদ্ধিমান! হয়ত তার পরিচয়টাই প্রকাশ করে ফেলবে। সুতরাং বখত সাহেবের সঙ্গে ওদের কাছে যাওয়া চলবে না।

'তাহলে চলুন, আপনাকে আমার অন্যান্য লোকদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। ওদের সাথে বরং খেলাধুলো করে সময় কাটাবেন। সংবাদপত্রও আছে সেখানে।'

ডাইনিংরুম থেকে বেরিয়ে কয়েক হাত দূরে একটা দরজার পাশের বোতাম টিপলেন বখত সাহেব। দরজাটা খুলে গেল। সামনে একটা সিঁড়ি নিচের দিকে নেমে গেছে। উজ্জ্বল আলোয় সিঁড়িটা আলোকিত।

বখত সাহেব বললেন, 'আসুন।'

মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করল কুয়াশা। তারপর হাত দিয়ে পকেটের রিভলভারটা অনুভব করে অনুসরণ করল বখত সাহেবকে। সিঁড়ির নিচে সরু প্যাসেজ। একটা চলে গেছে সোজা। একটা ডাইনে। প্যাসেজের দু'পাশে অনেকগুলো দরজা। সামনের দিকেই এগোল দু'জন। কিছুদূর এগিয়ে বাঁ দিকে মোড় নিল। একটা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। পকেট থেকে চাবি বের করে দরজার তালা খুললেন। ফাঁকা একটা বড় কামরা। কামরাটা পেরিয়ে একটা

দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন দু'জন। দরজাটা ঠেলা দিতেই খুলে গেল। প্রশস্ত একটা কক্ষ। মাঝখানে একটা টেবিলকে কেন্দ্র করে চারজন লোক বসে তাস খেলছে। চারটে তক্তপোশ। তাতে মলিন বিছানা। সিগারেটের টুকরো, দেশলাই-এর কাঠি, ছেঁড়া কাগজে মেঝেটা নোংরা।

ওদের দু'জনকে ঢুকতে দেখে কামরার চার বাসিন্দা চোখ তুলে তাকাল। তারপর আবার খেলায় মন দিল। দু'জন এগিয়ে গেলেন ওদের দিকে।

কাছে যেতেই একজন বলল, 'আসুন, বখত সাহেব।'

বখত সাহেব পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'নসু মিয়া, বন্দে আলী, সাহেবুদ্দিন, রজব শেখ। আর ইনি হচ্ছেন, হাসিবুল হাসান সাহেব। জানে আলমের জায়গায় এসেছেন ইনি।'

'জানে আলম সাহেব কোথায় গেলেন?' জানতে চাইল নসু মিয়া।

'হংকং গেছে। ফিরতে দেরি হবে।'

কুয়াশার দৃষ্টি পড়ল একটা সংবাদপত্রের উপর। ব্যানার হেড, হেড-লাইনে লেখা আছে, 'কুয়াশা কর্তৃক একটি হেলিকপ্টার অপহরণ।'

কুয়াশার এতক্ষণে খেয়াল হল, নতুন নিয়োগ-কর্তার নামটা এখন পর্যন্ত তার জানা হয়নি।

সে প্রশ্ন করল, 'আপনিই কি কুয়াশা?'

বখত সাহেব বিনীত হাসি উপহার দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ।'

কুয়াশা কক্ষটিতে আঠার ঘন্টা কাটিয়ে দিল। যদিও তার মনে হচ্ছিল সেখানটায় সে রয়েছে আঠার দিন ধরে। ঘুমোল আর তাস খেলল কক্ষের অন্য বাসিন্দাদের সাথে।

নসু মিয়া জিজ্ঞেস করল, 'হবে নাকি একহাত?'

'আপত্তি নেই?' খালি একটা চেয়ার টেনে বসল কুয়াশা। যস্মিন দেশে যদাচার তস্মিনও কুরু। তাস, বিশেষ করে বাজি রেখে তাস খেলা সে পছন্দ করে না। কিন্তু রূমের অন্য বাসিন্দারা তাস খেলার প্রতি তার অনীহাকে ভিন্নতর ব্যাখ্যা দিতে পারে। তাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হওয়াও বিচিত্র নয়, সুতরাং ওদের একজন বলে নিজেকে পরিচিত করাই বাঞ্ছনীয়।

রজব শেখ ব্ল্যাক-জ্যাক খেলার প্রস্তাব করল কুয়াশা বসতেই। কুয়াশা বলল, 'আপত্তি নেই।'

এক নাগাড়ে কয়েক ঘন্টা খেলল ব্ল্যাক-জ্যাক। হারল দু'হাজার টাকার মত। জিততে পারত কিন্তু তাহলে হয়ত মারপিট হয়ে যেত। ওরা সবাই, কুয়াশা লক্ষ্য করল, খেলায় কারচুপি করছে। মনে মনে হাসল কুয়াশা। জিতলেও খুশি অখুশির কোন চিহ্ন ধরা পড়ল না ওদের ভাবলেশহীন চেহারায়। কথা বলল শুধু নসু মিয়া।

দেহটা বিরাট কিন্তু গলার আওয়াজটা মেয়েলী। সে মেয়েলী গলায় প্রশ্ন করল, 'কত গেল?'

'দু'হাজার। আর খেলব না আমি, আর মাত্র তিরিশ টাকা আছে আমার কাছে।'

'ধার দিচ্ছি, পরে শুধলেও চলবে'।'

দু'হাজার টাকা ধার নিল কুয়াশা। সেগুলোও হারল। খেলতে খেলতে লোকগুলোর চরিত্র নির্ণয় করছিল কুয়াশা। প্রত্যেকটা লোকের চেহারাতেই অপরাধের ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট। দৃষ্টি ঠাণ্ডা অথচ তীক্ষ্ণ। অতি সামান্য কারণে খুন খারাবি করতে এদের বাধে না। বেদার বখত এই লোকগুলোকে কোথা থেকে, কিভাবে সংগ্রহ করেছে, একমাত্র বিধাতাই বলতে পারে।

ওদের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, কুয়াশাকে ওরা নিজেদের একজন বলে মনে করেছে। তাকে ওরা কোন প্রশ্ন করেনি। কুয়াশার মনে হল, সে যদি ওদেরকে কোন প্রশ্ন করত তাহলে ওরা হয়ত বিস্মিত হত, হয়ত চটেও যেতে পারত। মারপিট হওয়াও বিচিত্র নয়। যে উদ্দেশ্যে বেদার বখত তাদেরকে সংগ্রহ করেছে তা নিয়ে একবারও কথা ওঠেনি। ঘুণাক্ষরেও কেউ ব্যাপারটার উল্লেখ করেনি। ব্যাপারটা বোধহয় বহুল আলোচিত হওয়ায় আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। অথচ জানবার জন্যে ঔৎসুক্য ছিল কুয়াশার।

খেলা চলতেই থাকল। কুয়াশা খেলা শেষ করে সংবাদপত্রটা আবার টেনে নিল, কাল্পনিক কুয়াশার কার্যকলাপের পূর্ণ বিবরণ পাঠের জন্য। বিবরণ যা লেখা থাকবে বলে তার ধারণা ছিল মোটামুটি সেই রকমই লিখেছে স্টাফ রিপোর্টার। নতুন কিছু নেই। এমন কি প্রখ্যাত ডিটেকটিভ শহীদ খান যে এই কেস তদন্ত করতে চট্টগ্রাম এসেছেন তাও বলা হয়েছে। ভাবটা এই, এবার আর কুয়াশার রক্ষা নেই।

মাটির নিচের সেই আলোকিত কক্ষে দিন-রাতের কোন প্রভেদ নেই। কিন্তু ঘড়ি অনুযায়ী এখন রাত বারটা বাজে। শুয়ে পড়ল কুয়াশা। কিছুক্ষণ পরেই ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙতেই দেখতে পেল রুমের অন্য বাসিন্দারা উঠে পড়েছে। কাপড়-চোপড় পরছে। বন্দে আলী টেলিফোনে কথা বলছে, সাহেব এখনও ঘুমুচ্ছে। না, এই তো উঠে পড়েছে।

রিসিভারটা রেখে বন্দে আলী বলল, 'কাপড়-চোপড় পরে নাও, মিয়া, এখুনি বেরোতে হবে।' কুয়াশা দেখল ঘড়িতে সাড়ে চারটে বাজে। দিন না রাত বুঝতে পারল না। পারবার কথাও নয়।

মিনিট দশেক পরে নসু মিয়ার নেতৃত্বে ওদের মিছিলটা সরু প্যাসেজ দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল।

যে রুমটাতে গিয়ে ওরা পৌঁছুল এর আগে কুয়াশা সেটাতে যায়নি। অফিস-কক্ষের মত রুমটা। দেয়ালে পাশাপাশি দুটো সেফ। পাশে লম্বা একটা র‍্যাকে বইপত্র ঠাসা।

বখত সাহেব সেখানেই অপেক্ষা করছিলেন। কুয়াশাকে দেখে বললেন, 'আসুন। কেমন ছিলেন?'

'ওহ্, চমৎকার!'

কুয়াশার উত্তর শোনবার জন্যে বোধহয় বখত সাহেবের আগ্রহ ছিল না। তিনি বললেন, 'আপনাকে আমাদের ব্যবস্থার সাথে আরও কিছুটা পরিচয় করিয়ে দিই। চলুন।' একটা সেফ খুললেন বখত সাহেব। তাকগুলো শূন্য। উপরের তাকে ছোট একটা বাক্স। বেদার বখত বাক্সটার ডালা খুলে ভিতরটাতে কিছু একটা টিপলেন বলে মনে হল। সেফের ভিতরের সবক'টা তাক ডান পাশে সরে গেল। একটা সিঁড়ি ভেসে উঠল ঠিক ওদের সামনে।

বখত সাহেব ইশারা করলেন ওদের। প্রথমে ঢুকল বন্দে আলী মিয়া, তারপর তার সঙ্গীরা, ওদের পিছনে কুয়াশা। বখত সাহেব রইলেন ওদের সকলের শেষে।

ওরা নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে। কুয়াশা মুখ ফিরিয়ে দেখল দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সামনে একটা দীর্ঘ সুড়ঙ্গ। আবছা আলো। মিনিট দুয়েক এগোতেই সামনে আর একটা সিঁড়ি পাওয়া গেল। সিঁড়ি বেয়ে ওরা উঠে গেল একের পর এক। সিঁড়ির উপরে একজন দাঁড়িয়ে ছিল।

ওরা উঠে যেতেই লোকটা বলল, 'সব ঠিক আছে, হুজুর। লোকটাকে অন্ধকারে চিনতে পারল না কুয়াশা।

শেষ রাতের হাওয়া ঠাণ্ডা পরশ বুলিয়ে দিল কুয়াশার ললাটে, মুখে। খোলা হাওয়ায় বুক ভরে শ্বাস নিল সে। অন্ধকার একটু একটু করে কেটে যাচ্ছে।

ওরা সবাই সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে আছে। ঢেউ-এর শব্দ এসে পৌঁছুল কুয়াশার কানে। চাঁদের আলো আদিগন্ত সমুদ্রের উপরে চিক্‌চিক্ করে এক মায়াময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

দশফুট নিচে সমুদ্র। তীরটা ঢালু। সামনে একটা জাহাজের পিঠ দেখা যাচ্ছে তীর থেকে হাত পনের দূরে। তীরে একটা রো-বোট।

'ওটা হচ্ছে আমার ইউ-বোট।' আঙুল দিয়ে জাহাজটা দেখিয়ে বললেন বখত সাহেব।

'কোত্থেকে সংগ্রহ করলেন?'

অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে হাসলেন বখত সাহেব। সোনাবাঁধানো দাঁত দুটো দেখা গেল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'নসু মিয়া, তোমরা যাও। দেরি করছ কেন?'

ঢালু তীর বেয়ে নেমে গেল ওরা। রো-বোটে চড়ল একে একে।

কুয়াশা প্রশ্ন করল, 'কে চালাবে, সাবমেরিনটা?'

'নসু মিয়া চালাবে। এখন ব্যবস্থাটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন? বোটটা এখুনি চলে যাবে। এখান থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে গিয়ে অপেক্ষা করবে। ওদেরকে আগেই দ্রাঘিমা-অক্ষাংশ দেখিয়ে দিয়েছি। চলুন এবার আপনাকে বুঝিয়ে দেব।'

সুড়ঙ্গ বেয়ে আবার ফিরে এল ওরা। তৃতীয় ব্যক্তি দবীর খাঁ। সুড়ঙ্গের দেয়ালে একটা ইস্পাতের প্যানেল দেখিয়ে বখত সাহেব বললেন, 'সমুদ্রে যাবার পথ আর একটা আছে। এই দরজা দিয়ে যেতে হয়। কিন্তু এখন জোয়ারের সময় তা সম্ভব নয়।'

'আপনার সমস্ত ব্যবস্থাই অত্যন্ত চমৎকার। যাকে বলে সায়েন্টিফিক। কোথাও কোন ফাঁক নেই। কিন্তু এত সোনা রাখবেন কোথায়?'

'রাখব কেন? ইউ-বোট সোজা চলে যাবে দক্ষিণ আমেরিকায়। সেখানে খদ্দের অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে।

যে রূম থেকে ওরা যাত্রা শুরু করেছিল সেই রূমেই ফিরে এল এবার। সেফের দরজায় চাবি লাগাতে লাগাতে বখত সাহেব বললেন, 'আপনি আপনার হেলিকপ্টার চেক করতে যেতে পারেন ইচ্ছা করলে। আমি ততক্ষণে জরুরী কতকগুলো কাজ সেরে আসি। খবর পেয়েছি, সকাল আটটায় সোনাভর্তি প্লেন ছাড়বে চট্টগ্রাম থেকে। তার আগেই হাতের কাজগুলো সারতে হবে।'

'না, দরকার নেই হেলিকপ্টার চেক করার।'

'তাহলে আপনি পাশের রূমে গিয়ে বসুন।' পাশের রূমটার দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি, 'দরজাটা ভেজানো আছে। ধাক্কা দিলেই খুলে যাবে। চল, দবীর।'

কুয়াশা পাশের রূমের দিকে এগোল। ছোটখাট একটা লাইব্রেরি। মাঝখানে চেয়ার-টেবিল। একপাশে একটা ইজি-চেয়ার। ঠিক তার পিছনেই ছোট একটা সেফ।

সেফটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল কুয়াশা। সময় নেই। এখুনি কাজ শুরু করতে হবে। উঁচু হয়ে বসল কুয়াশা সেফটার সামনে। পকেট থেকে একটা ওয়ালেট বের করল। সেটা খুলতেই ছোট কয়েকটা যন্ত্র বেরিয়ে পড়ল। সেফটা নতুন, মজবুত। তালাটার পদ্ধতিও নতুন। কিন্তু কুয়াশার আক্রমণের কাছে পরাস্ত হতে বেশিক্ষণ লাগল না। ডালাটা খুলে ভিতরের জিনিসপত্র পরীক্ষা করতে লাগল। উপরের তাকে হাতীর দাঁতের বাক্সটাই আগে হাতে নিল সে। ভিতরে কিছু টাকা। কয়েকটা আকাটা হীরা আর একটা কাগজ। ভাঁজ খুলে দেখল, একটা চিঠি। জানে আলম চৌধুরী লিখেছে বেদার বখতকে। চিঠিটা পড়া শুরু করতেই পাশের রূম থেকে পদশব্দ ভেসে এল। শব্দটা এদিকেই আসছে।

দ্রুত চিঠিটা পকেটে চালান করল কুয়াশা। কিছু ব্যাংক-নোট আর কয়েক খণ্ড আকাটা হীরা পকেটে পুরে হাতীর দাঁতের বাক্সটা বন্ধ করে সেফের ডালাটা আটকে পাশের ইজি-চেয়ারটায় অর্ধ-শায়িত হয়ে চোখ বন্ধ করল সে। ওয়ালেটটা

গুছিয়ে পকেটে রাখতে ভুলল না।

রুমে ঢুকলেন বখত সাহেব। সোজা এগিয়ে গেলেন সেফের দিকে। পকেট থেকে চাবি বের করলেন। কিন্তু হাতল স্পর্শ করতেই খুলে গেল সেফের ডালা। চিত্রার্পিতের মত মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। তারপর নতজানু হয়ে হাতীর দাঁতের বাক্সটা বের করলেন।

উঠে দাঁড়াল কুয়াশা। তার হাতে পিস্তল। পায়ের শব্দে মুখ ফেরালেন বখত সাহেব। মুখটা মুহূর্তের মধ্যে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তিনি ভীতকণ্ঠে বললেন, 'ওহ্, তাহলে তুমি?'

'হ্যাঁ, আমিই। চাবিটা আমায় দাও।'

চাবিটা বখত সাহেব কুয়াশার হাতে তুলে দিলেন নীরবে।

'সেই লোকগুলো কোথায়?'

'কা'রা?'

'সেই টিকটিকি দু'জন, আর মিসেস চৌধুরীই বা কোথায়?'

'ওরা তাহলে তোমার লোক! তুমি, তুমি পুলিসের লোক, মানে সি. আই. ডি র লোক!' দাঁতে দাঁত পিষলেন বখত সাহেব। বিস্ময় আর ভয়ের ভাবটা কেটে গেছে তাঁর। এখন হিংস্র হয়ে উঠেছে তিমি। নেকড়ের মত দেখাচ্ছে তাঁকে।

'সে পরিচয় পরে হবে।'

'তুমি তাহলে মি. সিম্পসন?'

'বলেছি তো, ঢের সময় পাওয়া যাবে পরিচয়ের। এখন চল, আগে ওদেরকে বের করে দাও।'

'ওরা মারা গেছে।'

'তাহলে তোমাকেও মরতে হবে এবং এই দণ্ডেই। এখন সত্যি কথা বল। আর ওদেরকে বের করে দাও। নিয়ে চল আমাকে ওদের কাছে।'

'আমি দুঃখিত। ওরা মারা গেছে।'

'আমি ওদের মৃতদেহ দেখতে চাই।'

'সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছি।' কুয়াশার চোখে চোখ রেখে বললেন বখত সাহেব।

পিছনে অতি মৃদু পদশব্দ শোনা গেল। কিন্তু কুয়াশা সেদিকে তাকাবার আগেই তার ঘাড়ের উপর দিয়ে একটা হাত এসে পিস্তলটা স্পর্শ করল। পিস্তলটা ছিনিয়ে নিতে পারল না সেই অপরিচিত হাতটা, কিন্তু মুহূর্তের অসাবধানতায় সেটা ছিটকে পড়ল হাত থেকে। মাটিতে পড়ার আগেই সেটা বলের মত লুফে নিলেন বখত সাহেব। মুখ ফিরিয়েই প্রচণ্ড একটা ঘুসি বসাল কুয়াশা লোকটার চোয়ালের নিচে। একটা শব্দ করে লোকটা চিত হয়ে সোফার উপরে পড়ে গেল। লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই বখত সাহেবের নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'ব্যাস ব্যাস, আর নয়। থাম এবার।' তার হাতের পিস্তলটা কুয়াশার দিকে উদ্যত।

কুয়াশা আত্মসংবরণ করল। সোফার উপর থেকে উঠে দাঁড়াল লোকটা। হিংস্র দুটো চোখ মেলে কুয়াশার দিকে তাকিয়ে রইল। লোকটা দবীর খাঁ।

'এবারে বল, তুমি কে? তোমার আসল পরিচয় কি?'

'পরিচয় জেনে আর কি হবে, হুজুর। শেষ করে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায় আমার হাতে ছেড়ে দিন। দু'পায়ে লোহার রড বেঁধে সমুদ্রের নিচে রেখে আসি।' দবীর খাঁ বলল।

'মানে নতুন ধরনের একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে চাস? মন্দ না তোর আইডিয়াটা। কিন্তু এখন সম্ভব নয়। যাই করিস কেউ যেন জানতে না পারে। তার পরিণাম হবে মারাত্মক। আপাতত ওকে নসু মিয়াদের রুমে নিয়ে যা। পরে তোর প্রাণে যা চায় করিস। জ্ঞানে আলমের মত ওকেও শেষ করে দেওয়া ছাড়া পথ নেই।'

'অপরাধ বুঝি দু'জনের একই?' কুয়াশা ঠাট্টা করল।

'পরিমাণ বিবেচনা করলে তো তাই দাঁড়ায়।' পাল্টা রসিকতা করলেন বখত সাহেব। আরও বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু টেলিফোনটা বেজে উঠল। দবীরের হাতে পিস্তল দিয়ে রিসিভার তুললেন বখত সাহেব, 'হ্যালো, হ্যালো···হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছি।' প্যাড ও পেন্সিল টেনে নিলেন, 'হ্যাঁ, জি-জি. এফ. এক্স. কিউ.। সাতটায়! হঠাৎ···? আচ্ছা, ঠিক আছে।' রিসিভারটা রেখে দিয়ে নীরবে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। দাড়ি চুলকালেন। চেহারায় চিন্তার আভাস। তারপর টেবিলের উপরে রাখা মাইক্রোফোনের সুইচটা টিপে দিয়ে বললেন, 'আজমল? হ্যাঁ···শোন,সময়টা বদলে গেছে। কন্টারটা বের করে আন আর এঞ্জিনটা চালু করে দাও।' তারপর দবীর খাঁর দিকে ফিরে বললেন, 'প্লেন একঘন্টা আগে রওয়ানা হচ্ছে। আমাদের হাতে সময় নেই।'

দবীর খাঁ জিজ্ঞেস করল, 'আপনি নিজেই চালাবেন, হুজুর?'

'হ্যাঁ, আমিই চালাব। যা ওকে রেখে আয়। তোকেও থাকতে হবে আমাদের সাথে। ওকে নসু মিয়াদের রুমে নেবার দরকার নেই। ওই টিকটিকি দুটোর কাছেই রেখে আয়। জীবনের শেষ সাধ পূর্ণ হোক। যা, দেরি করিস্‌নে। আমি এখানেই আছি।'

আবার সেই সিঁড়ি, সরু প্যাসেজ ধরে একটা রুমের সামনে এল দু'জন। সামনে কুয়াশা। পিছনে পিস্তল হাতে দবীর খাঁ। সুইচ টিপে দরজা খুলে ভিতরে যেতে ইঙ্গিত করল লোকটা কুয়াশাকে। কুয়াশা ঢুকতেই দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

ভাঙা একটা তক্তপোষের উপর পাশাপাশি শুয়ে আছে কামাল ও ডি. কস্টা। কুয়াশার পদশব্দে দু'জনই দ্রুত উঠে বসল। ওদের দৃষ্টিতে আতঙ্ক। কিন্তু কুয়াশাকে দেখে আতঙ্ক মিলিয়ে গেল। দু'জনের চোখেই ভেসে উঠল আবার আশার আলো। কামাল কি যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ডি. কস্টার কণ্ঠ শোনা গেল

'বস্!' ভাঙা গলায় চিৎকার করে উঠল ডি. কস্টা। তারপর ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল। ডান হাতটা দেখাল কাঁদতে কাঁদতে। ফুলে গেছে ডান হাতটা। কামালের কপালেও বড় একটা কাটা দাগ। চোখের পাশে কালশিরা পড়েছে। মুখেও আঁচড়ের চিহ্ন।

ডি.কস্টাকে ঠাণ্ডা করতে বেগ পেতে হল কুয়াশাকে। তাকে যতই বোঝাবার চেষ্টা করে তার আবেগ ততই প্রবল হয়ে ওঠে। শেষটায় রণে ভঙ্গ দিয়ে কামালের দিকে তাকাল কুয়াশা, 'তারপর কেমন লাগছে?'

'রাজকীয় সম্বর্ধনা,' ম্লান হাসি হাসল কামাল। 'ভীষণ মেরেছে। বিশেষ করে ওকে। কান্নাকাটি করাতেই মারটা বেশি খেয়েছে। তারপর তুমি কিভাবে?'

'একই ইতিহাস। মানে, ধরা পড়েছি।'

সিগারেটের প্যাকেট বের করল কুয়াশা। লোলুপ হয়ে উঠল কামালের দৃষ্টি। বলল, 'দেখি সিগারেট দাও আগে। মরবার আগে শেষ সুখটানটা দিয়েই মরি।'

মুহূর্তে কান্না থামিয়ে হাত বাড়াল ডি. কস্টাও। কামালের দিকে বাড়িয়ে দেওয়া প্যাকেট থেকে ছোঁ মেরে একটা সিগারেট নিয়ে বলল, 'বস্, পকেটে মাল আছে?'

ডি. কস্টার জন্যে সহানুভূতিতে মনটা পূর্ণ হয়ে গেল কুয়াশার। ইশারায় জানাল, নেই।

নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে উঠে পড়ল কুয়াশা। বলল, 'কামাল, সময় নেই। আমাকে এক্ষুণি শুরু করতে হবে কাজ।'

পকেট থেকে ওয়ালেটটা আবার বের করল কুয়াশা। তাড়াহুড়োর জন্যেই হোক আর যে কারণেই হোক বেদার বখত বা তাঁর স্যাঙ্গাৎ কুয়াশার পকেট সার্চ করেনি। তার পরিণামটা অবশ্যই ভোগ করতে হবে ওদের। সোনাবাহী বিমানে হামলা ওরা চালাবেই যদি কুয়াশা যথাসময়ে মুক্ত হতে না পারে।

সোয়া ছ'টার সময় সে কাজ শুরু করল। দরজা ভাঙবার চেষ্টা করা বৃথা। ওতে ইলেকট্রিক কারেন্ট আছে। সুতরাং দেয়াল ভাঙতে মনস্থ করল সে। ক্ষুদ্র স্ক্রু-ড্রাইভার একাজের উপযুক্ত নয়। কিন্তু উপায় নেই।

ডি. কস্টা আর কামাল নীরবে কর্মরত কুয়াশার দিকে তাকিয়ে বসে রইল। প্রথম ইটটা যখন খুলে গেল ডি.কস্টা লাফ দিয়ে এসে উবু হয়ে কুয়াশার পাশে বসল। বার ইঞ্চি কঠিন দেয়াল ভেঙে সে যখন একটা মানুষের বেরোবার উপযুক্ত পথ করতে পারল তখন সাতটা বেজে গেছে। সোৎসাহে কামাল বলল, 'বাইরে বোধহয় সুইচ আছে। টিপলেই দরজা খুলে যাবে।'

কুয়াশা তখন ক্লান্ত। সমস্ত শরীর বেয়ে দরদর করে ঘাম বইছে। প্রথমে বেরোল কুয়াশাই। বাইরে এসে সুইচটা খুঁজে বের করল। সেটা টিপতেই দরজা খুলে গেল। ডি. কস্টা ও কামাল বেরিয়ে এল।

প্যাসেজের মধ্যে কাউকে দেখা গেল না। কামাল বলল, 'মিসেস চৌধুরীও কাছে-পিঠেই একটা রুমে বন্দী হয়ে আছেন।'

'কোন রুমে জান তুমি?'

'মোটামুটি একটা আইডিয়া আছে। আগে আমাদের তার পাশের রুমেই আটকে রাখা হয়েছিল। দবীর খাঁ, মানে বেদার বখতের স্যাঙ্গাতের মুখে শুনেছি।'

'কিন্তু এখন সময় হবে না। এদিকে অনেক কাজ। চল, আগে উপরে যাই।'

তিনজন প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে এগোল। সিঁড়ির কাছে এসে কুয়াশা বলল, 'আস্তে, কোন শব্দ কোরো না। মি. কস্টা, পায়ের শব্দ না হয় যেন।'

সিঁড়ির দরজাটা খোলা। নির্বিঘ্নে উপরে উঠে এল ওরা। সোজা চলে এল লাইব্রেরিতে। কেউ কোথাও নেই। লাইব্রেরির পুব দিকের একটা জানালা খোলা। টেবিলের উপরে রাখা মাইক্রোফোনটার উপর আলো এসে পড়েছে।

আর একটা সিগারেট ধরাল কুয়াশা। ডি. কস্টা বোধহয় মদের খোঁজ করতে গেল পাশের রুমে। কামাল একটা সোফায় বসল।

সিগারেটে একটা টান দিয়ে কুয়াশা রিসিভারটা তুলল। অনেকক্ষণ ডায়াল করল। টেলিফোন ডেড নয় কিন্তু লাইন পাওয়া গেল না। এনগেজ-সাউণ্ড হচ্ছে।

শেষটায় রিসিভার রেখে দিয়ে আপন মনে বলল, 'তাই তো, আমারই ভুল হয়েছে। এক্সচেঞ্জে নিশ্চয়ই বখতের লোক আছে। প্রয়োজনীয় নম্বরগুলোর এখন কানেকশন পাওয়া যেতেই পারে না।'

দ্রুত চিন্তা করতে লাগল কুয়াশা। প্রতিটি সেকেণ্ড মূল্যবান। একটিই পথ দেখতে পেল সে। কিন্তু অত্যন্ত ঝুঁকি আছে তাতে। অন্য পথও আছে, কিন্তু এই মুহূর্তে তা কার্যকরী হবে না। একটা কথা তার মনে পড়ল। বখত বলেছিল, 'অন্য কাউকেই জানানো চলবে না। তাহলে পরিণাম হবে মারাত্মক।' সেই কথাটাই কুয়াশাকে তার কার্যধারা স্থির করতে সাহায্য করল। টেবল্-মাইক্রোফোনের সুইচটা ঘুরিয়ে ডাকল, 'আজমল?'

'জ্বি, স্যার।'

'হাসিব বলছি। আমার কন্টারটা তাড়াতাড়ি চালু করে ফেল।'

'করছি, স্যার,' লোকটা জবাব দিল। একটা ভারি বোঝা নেমে গেল কুয়াশার মাথা থেকে। লোকটা অবাক হয়নি মোটেও।

হয়ত এখনও কোন আশা নেই। হয়ত সে নিশ্চিত মৃত্যুর পথে এগোচ্ছে কিন্তু একথাও ঠিক যে অসহায়ের মত সে নীরবে বসে হাত কচলাতে পারে না। সোনাভর্তি বিমানের নিরপরাধ পাইলটকে বাঁচাবার শেষ চেষ্টা তাকে করতেই হবে। এই বাড়িটার কোথাও একটা রেডিও ট্র্যান্সমিশন স্টেশন আছে। কিন্তু তা খুঁজে বের করতেও অন্তত আধ ঘন্টা সময় লাগবে সুতরাং এই পথ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

হেলিকপ্টারের ককপিটে বসে যখন কামালের দিকে তাকাল কুয়াশা তখন দেখল তার পাশে আরও কয়েকজন লোক এসে দাঁড়িয়েছে। শহীদকে দেখা গেল। মি. সিম্পসনও দাঁড়িয়ে আছেন। ওদের দিকে হাত নেড়ে বিদায় জানাল কুয়াশা।

একরাশ ধুলো উড়িয়ে গর্জন করে উর্ধ্বমুখে ধাবিত হল কুয়াশার হেলিকপ্টার। অনেকটা দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু বাতাস ছিল অনুকূল। দু'হাজার ফুট উঠতেই তার চোখে পড়ল একটা বিমান উত্তর দিক থেকে দক্ষিণের দিকে এগোচ্ছে। নিশ্চয়ই এটা সেই স্বর্ণবাহী বিমান। এ ছাড়া আর কোন বিমান আকাশে নেই। বেদার বখতের খোঁজ করল। বেশ অনেকটা দূরে বেদার বখতের হেলিকপ্টার দেখা গেল। প্রায় তিন হাজার ফুট উপরে রয়েছে বেদার বখত।

বিমানটা এগিয়ে আসছে। অতি ধীর গতিতে। ঘন্টায় বোধহয় মাত্র একশ' মাইল গতিতে। এত ধীরে চলবার মানে বুঝতে পারল না কুয়াশা। হয়ত নিরাপত্তার জন্যে। কুয়াশার হেলিকপ্টারের কাছে এসে পড়েছে বিমানটা। বডিতে বড় বড় হরফে লেখা আছে, 'জি-জি. এফ. এক্স. কিউ'। কুয়াশার হঠাৎ খেয়াল হল, বেদার বখতও নিশ্চয়ই তাকে দেখেছে। এমন কি তার হেলিকপ্টারটা উঠতেও দেখেছে। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে যে কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। তার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে। আগে তাই তার মোকাবেলায় লাগবে বেদার বখত।

কখন বখত সাহেব আক্রমণ করবে, তাই ভাবছিল কুয়াশা। আর সেই মুহূর্তেই শুরু হল আক্রমণ। নিজের এঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে প্রচণ্ড শব্দ শোনা গেল। মেশিনগান চার্জ করছে বেদার বখত। ডাইভ দিল কুয়াশা। বখতের কপ্টার উন্মত্ত কুকুরের মত এগিয়ে আসছে অনেকটা উপর দিয়ে। কমলা রংয়ের হালকা আগুনের আভা বেরোচ্ছে ককপিটের পাশ থেকে। আবার গোলা ছুঁড়ছে বখত। সোজা উপরের দিকে উঠে গেল কুয়াশা। বখতের কপ্টারের খুব কাছে দিয়ে উঠে গেল উর্ধ্বতর আকাশে। বাঁ দিকে ঘোরাল। বখত ডাইনে ঘুরে উপরের দিকে আর একবার চার্জ করল। ততক্ষণে কুয়াশা বখতের পাশে এসে পড়েছে। বখত ঘুরে তাকে চার্জ করতেই কুয়াশার কপ্টারটা ঘুরে গেল। দুটো কপ্টার এখন সামনাসামনি। পরস্পরের সাথে ধাক্কা লাগাটা বিচিত্র নয়। কিন্তু ঘুরল বখতই। সাঁ করে কপ্টারটাকে ডান দিকে ঘুরিয়ে আবার চার্জ করল। কুয়াশাও ততক্ষণে ঘুরে গেছে।

এতক্ষণ পর্যন্ত কুয়াশা একবারও গুলি করেনি। কারণ তার কাছে যেটুকু রসদ আছে তা এই মুহূর্তে ব্যয় করলে পরে বখত তাকে বেকায়দায় ফেলতে পারে। সুতরাং সে চাইছে বখত তার রসদ শেষ করে ফেলুক। তারপর দেখা যাবে।

বখত চার্জ করে চলেছে অবিরামভাবে। কিন্তু কুয়াশার কপ্টারকে একবার স্পর্শও করতে পারেনি। সম্ভবত তাতে আরও খেপে গিয়ে বিপুলতর উদ্যমে চার্জ করছে সে। গগলস্-পরা বেদার বখতকে দেখতে পাচ্ছে সে। ওর দিকেই তাকিয়ে

আছে। আর একবার চার্জ করল বখত। কুয়াশা সরে গেল। পুরোপুরি ঘুরে বখতের কপ্টারের পিছনের দিকে গেল। মেশিনগানটা এই প্রথম সে স্পর্শ করল। আগুনের আভা দেখা দিল একবার। কিন্তু সরে গেছে বখতের কপ্টার। ডাইভ দিয়ে অনেকটা নেমে আবার উঠে পড়ল বখতের কপ্টারটা।

স্বর্ণবাহী বিমানটা চোখে পড়ল কুয়াশার। কাছে এসে পড়েছে নিশ্চয়ই বখত সাহের। দেখতে পেয়েছে বিমানটাকে। কিন্তু বখতকে সুযোগ দেয়া চলবে না। এতক্ষণে কুয়াশার খেয়াল হল যে দুটো হেলিকপ্টারই তীর থেকে কয়েক মাইল দূরে চলে এসেছে। স্বর্ণবাহী বিমানটাও ওদের অনেকটা কাছে এসে গেছে। সাঁ করে দিক পরিবর্তন করল বিমানটা। অনেকটা জায়গা ঘুরে এবাউট-টার্ন করল। নিশ্চয়ই ওদের লড়াই দেখে সন্দেহ করেছে কিছু একটা। পাইলট বুদ্ধিমান সন্দেহ নেই।

বিমানটা ঘুরে যেতেই কুয়াশাকে অগ্রাহ্য করে বেদার বখত তার কপ্টারটা নিয়ে ছুটে চলল পলায়নপর বিমানটার দিকে। বুম-বুম-বুম করে এক নাগাড়ে গোলা বর্ষণের আওয়াজ কানে এল কুয়াশার। কিন্তু স্বর্ণবাহী বিমানটা গতি বাড়িয়ে দিয়েছে এবং এঁকে বেঁকে এগোচ্ছে। আবার কখনও উপরে উঠছে, কখনও নিচে নামছে। তবু একটা গোলা বিমানটার দক্ষিণ পাখায় আঘাত হানল। কুয়াশা দেখতে পেল ঝাঁকুনি খেল বিমানটা। পাখায় আগুন ধরে গেছে। কিন্তু গতি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে পাইলট। ছুটে চলেছে পতেঙ্গা বিমান বন্দরের দিকে। তাকে অনুসরণ করছে বেদার বখত। গোলাবর্ষণ করেই চলেছে সে। কুয়াশাও ছুটে চলেছে বেদার বখতের পিছন পিছন। খুব কাছে এসে পড়েছে কুয়াশা বেদার বখতের। তার হাতটা চলে গেল মেশিনগানের ট্রিগারের দিকে। নির্ভুল লক্ষ্যে আঘাত হানল। বেদার বখতের হেলিকপ্টারের লেজ গোলাবিদ্ধ হল—একবার দু'বার, তিনবার।

কেঁপে উঠল বেদার বখতের হেলিকপ্টার। উল্টে-পাল্টে মোচড় খেয়ে আবার সোজা হয়ে গেল। কিন্তু আগুন ধরে গেছে পিছন দিকটায়। আরও কয়েকবার গুলি চালাল কুয়াশা। আবার ডিগবাজি খেল হেলিকপ্টারটা, কিন্তু সোজা হয়ে উঠল না।

জ্বলন্ত হেলিকপ্টারটা নামছে। ধীরে ধীরে নামছে। আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পাচ্ছে কুয়াশা। দাউ দাউ করে জ্বলছে। হেলিকপ্টারটার সর্বাঙ্গে আগুন ধরে গেছে।

নামছে এখনও ওটা—এখনও নামছে। নিচে নীল সমুদ্র আহবান করছে বেদার বখতকে। স্বর্ণবাহী বিমানটা চোখের আড়ালে চলে গেছে। এতক্ষণে হয়ত গিয়ে ল্যাণ্ড করেছে বিমান বন্দরে।

কুয়াশা ২১

প্রথম প্রকাশঃ নভেম্বর, ১৯৬৯

এক

এখন রাত প্রায় বারটা। শ্রাবণের বর্ষণক্লান্ত অমাবস্যার তিমিরাবৃত রাত।

সন্ধে থেকে শুরু হয়েছে বৃষ্টি। আসলে চলছে বিকেল থেকেই। শ্রাবণের আকাশের ঘন-কালো মেঘে অনেকটা বেলা থাকতেই ঘনিয়ে এসেছিল সন্ধ্যার ছায়া-ছায়া অন্ধকার। তখন থেকেই নেমেছে বৃষ্টি—অবিরাম ঝরেই চলেছে। মাঝে মাঝে বর্ষণের প্রচণ্ডতা কমেছে বটে কিন্তু ছাড়েনি—ছাড়বার লক্ষণ নেই। তার সাথে আছে তীক্ষ্ণ ও সুচোল হিমেল হাওয়া।

মিরপুর রোড জনশূন্য। মাঝে মধ্যে দু'একটা বাস বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে পানি ছিটিয়ে অন্ধকারের বুক চিরে ছুটে যাচ্ছিল। কিন্তু এক সময় তাও বন্ধ হয়ে গেছে। শেষ বাসটাও চলে গেছে গন্তব্যস্থানে।

অন্ধকারে ঝিমুচ্ছে পথের দু'পাশের বাড়িগুলো। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের অন্ধকার পটভূমিতে বাড়িগুলোকে মনে হচ্ছে প্রেতপুরীর মত। আর অমাবস্যার প্রতি পরমভক্তির প্রমাণস্বরূপ শহরের বিদ্যুৎ যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে।

এই দুর্যোগের রাতে স্যানন ডি. কস্টা আসছিল সাভার থেকে। সকালে মান্নানকে একটা জরুরি কাজে পাঠিয়েছিল কুয়াশা সেখানে। মান্নানের বিঘোষিত প্রতিবাদ উপেক্ষা করেই ডি. কস্টা তার সঙ্গ নিয়েছিল। পরে দেখা গেল ডি. কস্টা সঙ্গে আসাতেই সুবিধে হয়েছে। যে কাজে সে গিয়েছিল তার প্রয়োজনেই তার রাতে সেখানে থাকা দরকার, অথচ আজকের রাতের মধ্যেই সে সম্পর্কে কুয়াশার কাছে খবর দেয়াটাও দরকার। সুতরাং সাঙ্কেতিক ভাষায় চিঠি লিখে মান্নান ডি. কস্টাকে ফেরত পাঠাল এবং জানিয়ে দিল, যে ভাবেই হোক রাতের মধ্যেই চিঠি কুয়াশার হাতে পৌঁছে দিতে হবে। অন্যথায় ক্ষতি হতে পারে।

গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজের দায়িত্বভার পেয়ে এবং বসের উপকার করার একটা সুযোগ পেয়ে মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যেই রওনা দিল সে ঢাকার দিকে। একটা ট্যাক্সি নিয়ে সে চলে এল মিরপুরে। রাত তখন প্রায় এগারটা। যানবাহন চলাচল ইতিমধ্যেই প্রায় বন্ধ।

ট্যাক্সিওয়ালার নিবাস মিরপুর। সে আর এগোবে না। অন্য ট্যাক্সি পাওয়া

গেল না। স্ট্যাণ্ড শূন্য। বেবীট্যাক্সি পাওয়া গেল একটা। সে রাজি হল না। কথাই বলল না ডি. কস্টার সাথে।

শীত-শীত লাগছিল ডি. কস্টার। শরীরটা একটু গরম করা দরকার। কাছেই একটা বে-আইনী তাড়িখানার সন্ধান জানা ছিল ডি. কস্টার। সেদিকেই এ.গোল। শরীরটা একটু গরম করে তারপর নাহয় আবার খোঁজ করা যাবে গাড়ির। কিন্তু নসীব মন্দ। অনেকক্ষণ ধাক্কা-ধাক্কি করল দরজায়। কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। দরজা খুলতে এল না কেউ। বিড়বিড় করে গাল দিল ডি. কস্টা, 'ব্যাটারা পেট পুরে টেনে নিশ্চয়ই মাটাল হয়ে আছে।' রাগে, বিরক্তিতে 'ডুট্টোরী ছাই' বলে পথে নামল আবার। কিছুক্ষণ গাড়ির চেষ্টা করে অবশেষে ব্যর্থমনোরথ হয়ে হেঁটেই রওনা দিল মোহাম্মদপুরের দিকে।

বৃষ্টিটা মাঝখানে একটু কমে এসেছিল। এখন আবার চেপে
অন্ধকারে পিচ্ছিল পথে এগোতে কষ্ট হচ্ছিল ডি. কস্টার। কিন্তু ওর দৃষ্টিশ
এখনও রাতে চোখ দুটো তার বিড়ালের মত জ্বলে। পুরানো অভ্যাসের জোরে এখনও অন্ধকারে সে বেশ দেখতে পায়। কিন্তু পথটা ভাঙাচোরা। খানাখন্দ ভর্তি। কো৹ ও কোথাও আবার প্যাচপ্যাচে কাঁদা। কয়েকবার হোঁচট খেল ডি. কস্টা। প্রায় আধ মা৹ ' পথ পেরিয়ে এসেছে সে। এদিকটায় বাড়িঘর বড় একটা নেই। যে ক'টা আ৹ তা৹ কাছাকাছি নয়। একটা থেকে অন্যটা অনেকটা দূরে।

হাওয়ার গতি আবার বেড়েছে। পশ্চিম দিক থেকে হিমেল হাওয়া যেন সূচ বেঁধাচ্ছে সর্বাঙ্গে। বর্ষাতি থাকা সত্ত্বেও সমস্ত শরীরটা ভিজে গেছে। ভেতরের শার্ট-প্যান্ট ভিজে জবজবে। তবু এগিয়ে চলেছে ডি. কস্টা। রাতেই তাকে বসের কাছে পৌঁছুতে হবে। বসের কাজে লাগার এই অপূর্ব সুযোগ সে ছাড়তে পারে না।

রাস্তার প্রান্ত ঘেঁষে হাঁটছিল ডি. কস্টা। সামনে একটা বিরাট গাছ। তার পাশাপাশি যেতেই পা পিছলে গেল হঠাৎ। চিত হয়ে পড়ে রাস্তার ঢালু পাড় বেয়ে কয়েক হাত নিচু ঝোপঝাড়ে গিয়ে ঠেকে গেল পা দুটো। অতি কষ্টে আর অতি সাবধানে উঠে বসতেই কপালে লাগল খোঁচা। মাথাটা সামান্য পেছনে সরিয়ে দেহটা ঘুরিয়ে উবু হয়ে হাতড়ে হাতড়ে জন্তুর মত সে ঢালু পাড় বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। সর্বাঙ্গ ব্যথায় ঝিমঝিম করছে। কোমরে আর ডান হাতের কব্জিতে চোট লেগেছে জোরে।

দূরে, বহুদূরে একটা আলো দেখা গে৹। এগিয়ে আসছে আলোটা—একটা নয়, দুটো আলো। গাড়ি আসছে একটা। মি৹ পুরের দিকেই এগোচ্ছে গাড়িটা। একটু আশার আলো যেন দেখতে পেল ডি. কস্টা। গাড়িওয়ালাকে যদি হাতে-পায়ে ধরে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে এই কষ্ট লাঘব হতে পারে। কে জানে, ওর দুর্দশা দেখে হয়ত রাজিও হয়ে যেতে পারে গাড়িওয়ালা। অবশ্য

এমনও তো হতে পারে, বস্ নিজেই আসছেন তার খোঁজ করতে। তাছাড়া এই দুর্যোগের রাতে বেরোবার সাহসই বা কার আছে? এই নির্জন পথে, এই ভয়ঙ্কর রাতে চলায় যে বিপদ আছে তা কে না জানে? আর হতে পারে পুলিস। কিন্তু এই বৃষ্টির রাতে পুলিস যে নাকে তেল না দিয়েও সুখে নিদ্রা যায় তা তার চাইতে ভাল করে জানে কে?

কিন্তু গাড়িটা প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে এসে থেমে গেল। নিভে গেল গাড়ির আলো। উল্লসিত হল ডি. কস্টা।

পথের উপর উঠে পড়েছে ডি. কস্টা। উঠে দাঁড়াল সে। কোমরে কট্ করে একটা শব্দ হল। অস্ফুট একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল মুখ থেকে। কয়েক পা এগোল সে অতি কষ্টে।

হঠাৎ জ্বলে উঠল পথের বাতিগুলো। আর সেই আলোতে ডি. কস্টা দেখল, গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে একটা লোক কি যেন টেনে বের করছে। ডি. কস্টার মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুতের মত প্রবাহিত হয়ে গেল। গাছটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল ডি. কস্টা সড়াৎ করে। মুখটা বাড়িয়ে দিল সামান্য। নিঃশ্বাস বন্ধ করে আতঙ্কভরা দৃষ্টিতে ডি. কস্টা দেখল লোকটা ভারি কি যেন একটা পাঁজাকোলা করে নামিয়ে ছুঁড়ে দিল পথের পাশে। ডি. কস্টা দেখল বস্তুটা আর কিছুই নয়, একটা মানুষ। তার জুতোপরা পা দু'টো মুহূর্তের জন্যে দেখতে পেয়েছিল সে। ধড়াস করে উঠল ডি. কস্টার বুকের ভিতরটা। মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে ঠাণ্ডা একটা স্রোত শিরশির করে বয়ে গেল। কণ্ঠতালু শুকিয়ে গেল। বিস্ফারিত চোখে সে চেয়ে রইল। লোকটা বেশ লম্বা-চওড়া। প্যান্ট-শার্ট পরা। মাথায় ফেল্ট হ্যাট। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল লোকটা। তারপর গাড়ির পিছনের দরজাটা বন্ধ করে সামনের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল। গাড়ির আলোটা জ্বলে উঠবার আগেই মুখ লুকোল ডি. কস্টা। এখনও তার বুকের মধ্যে ভয়ের হাতুড়িটা অবিরাম আঘাত হেনে চলেছে।

গাড়িটা এদিকে আসছে। লোকটা কি তাহলে দেখে ফেলেছে তাকে? গাছের সাথে দেহটাকে মিশিয়ে দিল ডি. কস্টা। হাঁটু দুটো প্রবল ভাবে কাঁপতে লাগল। আর ডি. কস্টার ঠিক সামনে এসেই গাড়িটা টার্ন নিল। ধরা পড়ে গেছে ডি. কস্টা। সে যে গোপনে লোকটার গোপন কার্যকলাপ দেখছিল সে তা জানতে পেরেছে। আর রক্ষা নেই। কিন্তু না, গাড়িটা থামল না। তার কয়েক হাত দূর দিয়ে ঘুরে চলে গেল। স্পীড দিয়েছে গাড়িটাতে। পিছনের লাল আলোটা মিলিয়ে যাচ্ছে।

আত্মস্থ হতে অনেকক্ষণ সময় লাগল ডি. কস্টার। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল সে। হাঁটতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু যন্ত্রণাকে ছাড়িয়ে ভীতিমিশ্রিত কৌতূহলটাই এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

বৃষ্টিটা ধরে এসেছে। এখুনি থেমেও যেতে পারে।

গাড়িটা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছিল সেখানে গিয়ে দাঁড়াল ডি. কস্টা। ইলেকট্রিসিটির একটা পোল কাছে থাকায় আলোটা এখানে উজ্জ্বল। সেই আলোয় ডি. কস্টা দেখল, ঢালু জায়গায়, হাত দু'য়েক নিচে উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটা মানুষের দেহ। লোকটার পরনে একটা কালো ফুলপ্যান্ট। উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। স্থান-কাল ভুলে গিয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল ডি. কস্টা তা সে বলতে পারে না, কিন্তু সংবিৎ ফিরে পেতেই উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে লাগল সে।

ঘন্টা দেড়েক পরের কথা। ইতিমধ্যে দুটো বোতল শেষ করে ডি. কস্টা তৃতীয় বোতলটার অর্ধেকটা প্রায় সাবাড় করে এনেছে। এর মধ্যেই সে বার পঞ্চাশ 'বাপ্‌স্, কি ভয়ঙ্কর' বলে ফেলেছে। কিন্তু বসকে কৌতূহলী দেখতে না পেয়ে বেচারা একটু অসন্তুষ্ট ও নিরাশই হয়ে পড়েছে।

কুয়াশা মান্নানের দেয়া চিঠি পড়া শেষ করে কি যেন ভাবছিল গভীর ভাবে। উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'বেশ, মি. ডি. কস্টা, এবারে তাহলে শুয়ে পড়ুনগে। অনেক তো ঝড়-ঝাপটা গেছে আপনার উপর দিয়ে। এবারে একটু ঘুম দিন, রাত তো প্রায় আড়াইটে বাজে।'

'কিন্‌টু বস্, কি ভয়ঙ্কর!'

'ওসব খুনোখুনির ব্যাপার তো ভয়ঙ্কর হবেই।'

'না, মানে হ্যাঁ, টা টো হোবেই। মাগার ঐ খুনেটা কে? লোকটাকে টো ঢরটে হোবে? মানে, আমাকে যডি ফলো করে ঠাকে?' ডি. কস্টার গলায় কান্নার আভাস।

'আপনাকে ফলো করবে!' বিস্ময় চাপতে পারল না কুয়াশা। 'ফলো করবে কেন? কি করেই বা করবে?'

'না মানে,' আর একটা ঢোক গিলে ডি. কস্টা বলল। 'কিন্‌টু লোকটাকে টো ঢরটে হবে? আবার যডি খুন করে?'

'বেশ, তাহলে পুলিসে খবর দিয়ে আসুন,' নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল কুয়াশা।

'অ্যাঁ! পুলিসে? মাঠা খারাপ, টাহলে ওরা যা মাঠা মোটা; আমাকেই অ্যারেস্ট করবে। ঢরে জিজ্ঞেস করবেঃ মি. ডি. কস্টা, অটো রাটে আপনি ওখানে গিয়েছিলেন কেন? টো হামি কিয়া কৈফিয়ত ডেয়েগা?'

'তাহলে তো ভাল বিপদ হল দেখছি! আচ্ছা এক কাজ করলেই তো হয়, আপাতত আপনার হাতে কোন কাজ নেই একথা তো ঠিক?'

'না, কোন কাজ নেই,' স্বীকার করল ডি. কস্টা।

'তাহলে আপনিই লেগে পড়ুন না মি. ডি. কস্টা, লোকটার খোঁজ করতে?'

'আমি? মাঠা খারাপ!' আর্তনাদ করল ডি কস্টা।

'না না, মাথা খারাপ হবে কেন? আপনার মাথা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। মানে, আপনি বেশ বুদ্ধিমান, চালাক-চতুর মানুষ। একবার চেষ্টা করেই দেখুন না? লোকটাকে ধরে পুলিসের হাতে তুলে দিতে পারেন কিনা?'

ডি. কস্টার চোখ দু'টো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে খুশি হয়ে বোতল থেকে ঢকঢক করে এক সঙ্গে অনেকটা পান করে জামার হাতায় ঠোঁট মুছে বলল, 'ডি আইডিয়া।'

বোতলটা রেখে কপালে টোকা দিয়ে বলল, 'অঠচ কঠাটা এতক্ষণ আমার মাঠায় ঢোকেনি।' মাথাটা দোলাতে লাগল সে।

'লোকটাকে আবার দেখলে নিশ্চয়ই চিনতে অসুবিধে হবে না, কি বলেন?'

'না না, অসুবিঢা কিসের? বেশ লম্বা-চওড়া লোকটা। রঙটা মনে হচ্ছে আমার মট ফর্সাই। অবশ্য মুখটা ডেখতে পাইনি। ফেল্ট হ্যাট ছিল টো মাঠায়? মুখটায় ছায়া পড়েছিল। চিনটে পারব টবু অবশ্য। টাছাড়া গাড়িটা দেখলেই চিনটে পারব।'

'কি গাড়ি ছিল ওটা?'

'টাইটো, কি যেন নামটা...আজকাল গাড়ির যে কি বিশ্রী নাম হচ্ছে মনেই ঠাকটে চায় না। টাইটো কি যেন নাম গাড়িটার...বস্ কি নাম যেন—?'

'রোলস রয়েস, ফোর্ড, টয়ো—'

'উঁহু, ওসব নয়। রোলস রয়েস পাবে কোঠায়। ওটো এডেশে শুঢ্ আমার মামার শ্বশুরের ভইয়ের শালার ছিল।'

'তাহলে?'

'যাকগে, ওটা আমি বের করে নিটে পারব। নম্বরটা আমার মনে আছে—ঢাকা-ক...। কটো যেন ঠিক মনে পড়ছে না। সে যা হোক। বাছাঢন একবার যডি আমার পাল্লায় পড়ে টাহলেই, হুঁম।' বোতলটা ঠকাশ করে টেবিলের উপর রাখল ডি. কস্টা। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি টাহলে একটু ঘুমিয়েই নিই। কাল ঠেকে লেগে যাব।'

কুয়াশা হেসে বলল, 'আপনাকে সাতাশ দিন সময় দিলুম, মি. কস্টা। এর মধ্যেই লোকটাকে খুঁজে বের করতে হবে।'

'সাটাশ ডিন! ইউ মীন টুয়েন্টি সেভেন ডেজ! হাঃ হাঃ, টুয়েন্টি সেভেন আওয়ার্স উড বি এনাফ। ঠ্যাংক ইউ।' চলে গেল ডি. কস্টা।

উঠে দাঁড়াল কুয়াশাও। কাপড়-চোপড় বদলে প্রস্তুত হয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে। বৃষ্টিটা থেমে গেছে। আকাশটা এখনও থমথমে। আবার নামতে পারে বৃষ্টি যে কোন মুহূর্তে।

দুই

সকালে চায়ের টেবিলে সংবাদপত্র পড়ছিল শহীদ। লীনা ও শহীদের বাবা ইসলাম খাঁ সাহেব নীরবে নাস্তা করছিলেন। মহুয়া পরিবেশন করছিল। এমন সময় কামাল এসে উপস্থিত হল। বেফাঁস কি একটা উচ্চারণ করতে যাচ্ছিল কামাল, শহীদের আব্বাকে দেখে দ্রুত রসনা সংবরণ করল।

শহীদ সংবাদপত্র থেকে মুখটা তুলে নিরাসক্ত ভাবে দেখল একবার কামালকে, তারপর আবার কাগজের মধ্যে ডুব দিল। অভ্যর্থনা জানাল মহুয়া, সহাস্যে। বলল, 'বোস, ভাই। তাই তো বলি, ডাইনিংরুমটা এত খালি-খালি লাগছিল কেন এতক্ষণ। আর খাবারগুলোই বা কেন অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে। ওকি, আব্বা, কলাটা রেখে দিচ্ছেন কেন, আপেলের টুকরো না হয় একটু মুখে দিন।'

ইসলাম খাঁ সাহেব মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালেন। বললেন, 'না, অনেকটা খেয়ে ফেলেছি। বুড়ো পাকস্থলী এতটা ভার সইতে পারবে কেন?'

'অন্তত আপেল দু-এক টুকরো মুখে দিতেই হবে,' প্লেট এগিয়ে দিতে দিতে বলল মহুয়া।

'তুমি আমায় না খাইয়েই ছাড়বে না, মা। জান, কামাল, আমার এই মা'টি আমাকে খাইয়ে-দাইয়ে বেশ রেখেছে। আর এক জন্মে বোধহয় ও আমার নিজের মা ছিল।'

'আর আগের জন্মে সাক্ষাৎ আমার নিজের দিদি ছিল।' সহাস্যে যোগ দিল কামাল।

'থাক থাক, তোমার আর ব্যাখ্যা করতে হবে না। নাও তুমিও শুরু কর।' মাথার ঘোমটা ঠিক করতে করতে বলল মহুয়া। তার কণ্ঠে লজ্জার আভাস।

লীনার দিকে একবার অপাঙ্গে তাকিয়ে কামাল টোস্টের পাহাড়টা নিজের দিকে টেনে নিল।

এক টুকরো আপেল মুখে দিয়ে হরলিক্সের কাপ হাতে নিলেন ইসলাম সাহেব। হরলিক্স শেষ করে বললেন, 'শহীদ, লীনার ইলেকট্রো-কার্ডিওগ্রাফ করাবার কথাটা মনে আছে তোর, না ভুলে গিয়েছিস? আমিই বরং ওকে নিয়ে যাই কোন স্পেশালিস্টের কাছে।'

শহীদ সংবাদপত্র সরিয়ে দিয়ে বলল, 'না, তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আমিই নিয়ে যাব এখন। তুমি বরং ইচ্ছে করলে গাড়িটা নিয়ে এমনিতেই ঘুরে এস।'

চলে গেলেন ইসলাম সাহেব।

কামাল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'কিরে, অমন ধারা মেঘাচ্ছন্ন মুখ করে আছিস কেন? কি হয়েছে? মহুয়াদি, তুমি বকেছ বোধহয়?'

হাসল শহীদ, 'সে সৌভাগ্য কি আমার কোনদিন হবে? ভাবছি অন্য কথা।'

'খবরের কাগজে সেই ভাবনার কথাটা লেখা আছে বুঝি? ভাবনার বিষয়টা কি? ভিয়েতনাম, না দেশীয় রাজনীতি? শেখ, না খান, না কোন অগ্নিবর্ষী মওলানার বক্তৃতা?'

'ওসব কিছুই নয়। আসলে যে সংবাদটার জন্যে কাগজটা তন্ন তন্ন করে খুঁজছিলাম সেটা দেখছিনে।'

'কি সংবাদ রে? খুন-টুন কেউ হবে বলে আগে থেকে জানতিস বুঝি? তোকে বুঝি আগিই বলে রেখেছে?'

'অনেকটা তাই। গতরাতটা অমাবস্যা গেছে, তাই না?'

'ওসব বাংলা পত্রিকার হিসেব আমি রাখি না। তিথি, নক্ষত্র, শুভ দিনের নির্ঘন্ট, রাশিচক্র, আজকের দিনটি কেমন যাবে এসব নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনে।' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল কামাল। ওর কথা বলার ভঙ্গিতে হেসে উঠল লীনা আর মহুয়া।

'তা তো রাখবিই না। ভাল কথা, তোর বয়স কত রে এখন? তিরিশ পেরিয়েছে?'

কামাল চোখ দু'টো কুঁচকে শহীদকে ভাল করে পরখ করে বলল, 'হয়েছে কি তোর, বল তো? রাতে ঘুম হয়নি ভাল? অমাবস্যা থেকে বয়স। কিছুই বুঝতে পারছিনে।'

সেটা তো খুবই স্বাভাবিক। সহজ কথাটা কবে তুই সহজে বুঝতে পেরেছিস, বল তো? সেই জন্যেই তো বয়স জানতে চাইছি। মেন্টাল এজটা বের করতে হবে।'

চটে গেল কামাল। কিন্তু মুখের ভিতরে আস্ত একটা সিদ্ধ ডিম থাকায় সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারল না।

লীনা বলল, 'তুমি মিছেমিছি কামাল ভাইকে চটিয়ে দিচ্ছ, দাদামণি। আসলে আমিও তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছিনে। বৌদিও না, তাই না, বৌদি?'

'তোমার দাদা আর কামাল বাবুর ওসব উদ্ভট কথাবার্তা বোঝবার চেষ্টা করে লাভ নেই, লীনা। চল বরং আমার সাথে। তোমাকে একটা প্রেমের গল্প বলব।'

'আহ্, রাখ না, বৌদি। অমাবস্যার সাথে কামাল ভাইয়ের বয়সের সম্পর্কটা জেনেই যাই। বল না, দাদামণি।' আবদার করল লীনা।

'হ্যাঁ দাদা, ঝেড়ে কাশ,' দাবি জানাল কামালও।

'তোদের হয়ত খেয়াল আছে, প্রায় আট মাস হল প্রত্যেক অমাবস্যায় একজন করে লোক খুন হচ্ছে।'

'খুন তো হর-হামেশাই হচ্ছে। পূর্ণিমাতেও হচ্ছে, অমাবস্যাতেও হচ্ছে। তা না হলে পুলিসরা যে বেকার হয়ে যাবে।' কামাল ফোড়ন কাটল। 'তাতে হয়েছে কি?'

'কিন্তু এই অমাবস্যার রাতের খুনটার একটা বৈশিষ্ট্য আছে।'

'যথা?' নাস্তা শেষ করে চায়ের কাপটা টেনে নিতে নিতে প্রশ্ন করল কামাল।

'বৈশিষ্ট্য হল, ঐ রাতে নিহত লোকগুলোর কোন হৃৎপিণ্ড পাওয়া যায়নি। বাঁ দিকে বুকের অস্থির ঠিক নিচ দিয়ে ছুরি চালিয়ে হৃৎপিণ্ডটা কে যেন নিখুঁতভাবে কেটে বের করে নিয়েছে করোনা আর্টারি পর্যন্ত। আর সবকিছুই ঠিক আছে। আর যারা এইভাবে মারা গেছে তাদের প্রত্যেকেরই বয়স পঁচিশ থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে। পুরুষও আছে মহিলাও আছে।'

কামাল, লীনা ও মহুয়া তিনজনই স্তব্ধ হয়ে শুনল। লীনা ও মহুয়ার মুখটা শুকিয়ে গেছে।

লীনা কি যেন বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই কামাল বলল, 'দুর্ভাগ্য, আমার বয়সটা হঠাৎ কয়েকদিন আগেই কোন ফাঁকে তিরিশ পেরিয়ে গেছে। আহা, বেচারা খুনী! ও, এর জন্যেই বুঝি আমার বয়সের খোঁজ করা হচ্ছিল?'

কামালের বাচালতায় মহুয়া বিরক্ত হয়ে বলল, 'এ পর্যন্ত ক'জন মারা গেছে বললে?'

'দশজন গেছে এর আগের অমাবস্যা পর্যন্ত। গতরাতে একাদশ ব্যক্তির পালা ছিল। নতুন কেউ মারা গেল কি না তাই দেখছিলাম কাগজে।'

'কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার? কিন্তু এতদিন একথা আমাদের বলনি কেন?' মহুয়া ভীতস্বরে অনুযোগ করল।

শহীদ বলল, 'আমিও কি জানতাম? কাল মি. সিম্পসন ডেকে পাঠিয়েছিলেন। উনিই ব্যাপারটা জানালেন আমাকে। ওঁর উপরেই ভার পড়েছে তদন্তের।'

কামাল মনে মনে হিসেব করে বলল, 'দশটা অমাবস্যা, মানে, নয় মাস চলে গেছে। এই নয় মাস কি অপরাধদমন বিভাগ নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিল?'

'ঠিক ঘুমোচ্ছিল না। ভিতরে ভিতরে জোরে-শোরে তদন্ত চলছিল। পরিণামে অবশ্য নিরপরাধ কয়েকজন লোক ধরা পড়েছিল। তাদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে। শেষটায় তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে মি. সিম্পসনের উপর। দায়িত্ব পেয়েই আমাকে উনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন।'

'কোন হদিস পেলি?' সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল কামাল।

'বিন্দুমাত্র না। যে খুন করছে সে অত্যন্ত হুঁশিয়ার। সামান্য সূত্রও সে রেখে যায়নি। লাশগুলো পাওয়া গেছে হয়ত হোটেলের কামরায়, নাহয় পথের পাশে,

নদীতে বা নির্জন কোন বাড়িতে। আর জানা গেছে, প্রত্যেকটি নিহত লোকই অতীতে হার্টের কোন না কোন একটা রোগে ভুগত। পরে অবশ্য সেরে গিয়েছিল প্রত্যেকের রোগ।'

কামাল চিন্তা জড়িত গলায় বলল, 'এমনও তো হতে পারে, কোন গবেষণা-কারী হয়ত হৃদযন্ত্রের রোগ গবেষণার জন্যে এই কাণ্ডটা করে বেড়াচ্ছে?'

'না, তা হতে পারে না।' মাথা নাড়ল শহীদ, 'এমন ঝুঁকি নিয়ে আজকাল কেউ এমনধারা বিজ্ঞানের সেবা করতে যায় না। দরকারও হয় না।'

'হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্টেশানের ব্যাপার নয় তো?'

'সে রকম একটা সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। কিন্তু এমন একটা বিরাট কাজ এমন গোপনে করা সম্ভব বলে আমার মনে হয় না,' শহীদ জবাব দিল।

কামাল জোর দিয়ে বলল, 'তাহলে আর কি হতে পারে? কোন সন্দেহ নেই, এটা হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্টেশানের ব্যাপার। দেশের আইনে হয়ত কোন নিষেধাজ্ঞা আছে, তাই গোপনেই কেউ এই গবেষণা চালাচ্ছে।'

'কিন্তু তার জন্যে বেছে বেছে অমাবস্যার রাত কেন? ও কাজটা তো অন্য দিনও হতে পারে?'

'তাই তো। তাই তো···।' আমতা আমতা করতে লাগল কামাল। তারপর বলল, 'এমনও তো হতে পারে যে, অমাবস্যার রাতে মানুষের হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত ভালভাবে ফাংশন করে?'

'অ্যাঁ, কি বললি!' শহীদ হো হো করে হেসে উঠল। লীনা আর মহুয়াও যোগ দিল হাসিতে। অনেকক্ষণ একটানা হাসি আর থামতেই চায় না।

বিব্রত, লজ্জিত কামাল ওদের থামাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। লীনা উঠে পালিয়ে গেল। মহুয়াও চলে গেল তার পিছনে পিছনে।

টেলিফোনটা বেজে উঠল। হাসি থামিয়ে রিসিভার তুলল শহীদ। 'হ্যালো,···হ্যাঁ বলছি। মি. সিম্পসন, বলুন···কোথায়? লাশটা কোথায়?···বেশ, তাহলে আপনিই চলে আসুন না। হ্যাঁ···, আমি রেডি হয়ে নিচ্ছি···শ্রীমান কামাল চন্দ্র আহমেদ সাহেব এখানেই বসে আছেন।···আচ্ছা।' রিসিভার নামিয়ে রাখল শহীদ।

বিব্রত কামাল ইতিমধ্যেই সংবাদপত্রের মধ্যে আত্মগোপন করেছে। কিন্তু দৃষ্টিটা সংবাদপত্রে সীমাবদ্ধ থাকলেও মনযোগটা তার শহীদের দূরভাষণে আলাপনের দিকেই নিবদ্ধ। আলাপনের ধরন শুনেই বুঝল, এ সেই অমাবস্যার কাহিনীর সর্বশেষ অধ্যায় চলছে। নিশ্চয় নতুন কেউ হৃৎপিণ্ড-চোরের পাল্লায় পড়ে হৃদযন্ত্র হারিয়েছে। খবর জানাচ্ছেন সিম্পসন। এখুনি ছুটতে হবে অকুস্থলে।

'কিরে. তুই যাবি নাকি হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্টেশান দেখতে?'

'আপত্তি নেই,' মাথা না তুলেই বলল কামাল।

'তাহলে তুই বোস্, আমি কাপড়টা বদলে আসি।' বেরিয়ে গেল শহীদ।

একটু পরেই মহুয়া আর লীনা এসে ঢুকল। কামাল গভীর মনযোগের ভান করে কাগজটা পড়তে লাগল। আর এক দফা এল চায়ের সরঞ্জাম মহুয়ার হাতের ট্রেতে।

মহুয়া একটা চেয়ারে বসে কাপে চা ঢালতে ঢালতে বলল, 'কামাল ভাই, হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্টেশানের বাংলা কি, বল তো? লীনা জিজ্ঞেস করছিল।'

লীনা তারস্বরে প্রতিবাদ জানাল, 'না কামাল ভাই, আমি কক্ষণো জিজ্ঞেস করিনি।'

'আহা নাইবা করলে, লীনা। নাহয় আমিই জিজ্ঞেস করছি। বল না তুমি?'

'ওসব বাংলা কাগজের সাব-এডিটরদের জিজ্ঞেস কর।'

'আপাতত তাদের কাউকে তো হাতের কাছে পাচ্ছিনে। কে যেন বলছিল, হৃদযন্ত্র পরিবর্তন, না কি সব বাংলা শব্দ লেখা হচ্ছে। আবার কোন কাগজে যেন দেখলাম লিখেছে, হৃদয় বদল।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিও দেখেছিলাম।' সোৎসাহে বলল কামাল।

'ওমা, দেখেছিলে বুঝি! তাই এত আগ্রহ এই হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্টেশানের ব্যাপারে। লীনারও উৎসাহের কারণটা যেন এখন বোঝা যাচ্ছে।'

'আহ্ বৌদি, তুমি কি শুরু করলে? আমি আবার কখন উৎসাহ দেখালাম।' ফ্লাশ করল লীনা।

কান দু'টো উত্তপ্ত হল কামালের। লীনার দিকে তাকাতে গিয়েও তাকাতে পারল না সে। মুখে কথাও ফুটল না।

মহুয়া সেদিকে কান না দিয়ে বলল, 'জান, লীনার নাকি হার্টে কিসব ট্রাবল দেখা দিয়েছে। আল্লাই জানে কি হয়েছে। বোধহয় ওর হার্টটাও বদলাতে হবে। একটা উপযুক্ত হৃদয়দাতা পেলেই।'

'বৌদি, প্লীজ। আমি এখুনি চলে যাব এখান থেকে।'

'তোমার আর যেতে হবে না, ভাই। আমিই যাচ্ছি।'

'তোমাকেও যেতে হবে না। আমি আর কামাল যাচ্ছি।' শহীদ ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'চল কামাল, মি. সিম্পসন এসে পড়েছেন। বাইরে গাড়িতে আছেন।'

'সে কি! ওঁকে আসতে বল, অন্তত একটু চা-টা...।' মহুয়া বলল।

'পরে হবেখণ। এখন উনি চা খেতে রাজি হবেন না। চলরে, কামাল।'

'কিন্তু যাচ্ছটা কোথায়?' জানতে চাইল মহুয়া।

'এই ঢাকা শহরেই। আপাতত মিরপুর রোডে। সেখানে একটা লাশ পাওয়া

গেছে। তার পেট চেরা। সম্ভবত এটাও সেই অমাবস্যার রাতের শিকারীর কীর্তি।' ফ্যাকাসে হয়ে গেল মহুয়ার মুখটা। 'তাহলে তুমি যা ভেবেছিলে শেষটায় তাই হল! সাবধানে থেক,' ক্ষীণ কণ্ঠে বলল মহুয়া।

'ভয় পেলে নাকি?'

'না না, ভয় পাব কেন? তবে কিনা সাবধানের মার নেই।'

'আচ্ছা আচ্ছা, সাবধানেই থাকব। চলি এবার।'

কিন্তু টেলিফোনটা বেজে উঠল আবার। কামাল এগিয়ে গিয়ে রিসিভারটা তুলল, 'হ্যালো,... শহীদ সাহেবকে চান? ধরুন আপনি।' শহীদকে টেলিফোন ধরতে ইঙ্গিত করল কামাল।

শহীদ এগিয়ে গিয়ে রিসিভারটা ধরল। 'হ্যালো...হ্যাঁ, আমি শহীদ খান বলছি। কে? সাফাকাৎ হোসেন সাহেব...দুঃখিত, আমি ঠিক চিনতে পারছিনে।...ও, আচ্ছা আচ্ছা বলুন।...আপনার ছেলে নাজাকাৎ হোসেন...হ্যালো, হ্যাঁ, খুন হয়েছে কোথায়... মিরপুর রোডে? আমাকে তদন্ত করতে বলছেন? বেশ তো...হ্যাঁ, আমি রাজি আছি। না না, মামার বাসায় আসবার দরকার নেই। আপনি মিরপুর রোডে যেখানে লাশ আছে সেখানেই যান। মি. সিম্পসন আর আমি সেখানেই যাচ্ছি। হ্যাঁ, নিশ্চিন্ত থাকুন আপনি, টাকা? না. টাকা পয়সার দরকার নেই।...লাগলে সে দেখা যাবে পরে। হ্যাঁ, চলে আসুন।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে শহীদ বলল, 'নিহত ভদ্রলোকের বাবা ফোন করেছিলেন। তিনি আমাকে তদন্তে নিয়োগ করতে চান। চিনিস তো ভদ্রলোককে? সাফাকাৎ হোসেন। বিজনেস ম্যাগনেট। তারই ছেলে নাজাকাৎ হোসেন। চল যাই এবারে, মি. সিম্পসন বোধহয় অধৈর্য হয়ে উঠেছেন।'

তিন

পথের ধারে ভিড় জমেছে। কৌতূহলী জনতা একটা খাটিয়াকে ঘিরে ধরে গুঞ্জন করছে। কনস্টেবল ভিড় সামলাচ্ছিল। মি. সিম্পসন, শহীদ ও কামাল গাড়ি থেকে নামতেই তাদের জন্য পথ করে দিল ভিড় ঠেলে।

খাটিয়ার উপরে চাদর দিয়ে লাশটা ঢাকা। পাশেই মাটিতে বসে আছেন এক শোকাতুরা বৃদ্ধা। তাঁর রেখাবহুল গাল বেয়ে অবিরাম অশ্রু ঝরছে। নিঃশব্দে কাঁদছেন তিনি।

মি. সিম্পসন লাশের মাথার দিকের চাদরের প্রান্তটা তুললেন। চোখে পড়ল পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সের যুবকের মুখ। সুদর্শন চেহারা। তামাটে রঙ। কালো কোঁকড়া চুল। চওড়া কপাল। খাড়া নাক। চোখ দু'টো অর্ধমুদ্রিত। নীলচে রঙ

ধরেছে মুখে। তাতে আতঙ্ক ও যন্ত্রণার ছাপ। মুখে, কপালে শুকনো কাদা লেগে আছে।

শহীদ এক নজর দেখে বলল, 'আঘাতটা এসেছিল নিতান্তই আকস্মিক ভাবে।'

তদন্তকারী অফিসার গোলাম মওলা দাঁড়িয়েছিলেন পাশেই। তিনি বললেন, 'স্যার, ভিড় ক্রমেই বাড়ছে। লাশটা সরিয়ে ফেলি?'

মি. সিম্পসন চাদর নামিয়ে দিয়ে বললেন, 'তদন্ত হয়ে গিয়ে থাকলে সরিয়ে ফেলতে পারেন। মর্গেও পাঠাতে পারেন ইচ্ছা করলে।'

শহীদ বলল, 'সেই ভাল। মিছামিছি ভিড় বাড়িয়ে লাভ কি? আপনি লাশ পাঠিয়ে দিন মর্গে, আর কোথায় লাশটা পড়েছিল সেই জায়গাটা দয়া করে আমাকে একবার দেখিয়ে দিন। চলুন, আমরা বাইরে গিয়ে দাঁড়াই।'

শহীদ, কামাল ও সিম্পসন ভিড় ঠেলে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। মওলা সাহেব পিছনে পিছনে এলেন। তিনি বললেন, 'স্যার, লাশটা পড়েছিল ঐখানে।' আঙুল দিয়ে রাস্তার পাশের ঢালু জায়গাটা দেখালেন তিনি। 'উপুড় হয়ে পড়ে ছিল লাশটা।'

শহীদ নেমে গেল পায়ে পায়ে। জায়গাটা পিচ্ছিল। দু-তিন হাত নিচে নেমে মাথা নুইয়ে কি যেন দেখল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর উঠে এল। গোলাম মওলা সাহেব লাশ তোলার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত ছিলেন। শহীদ জনতার দিকে আনমনে তাকিয়ে ছিলএক দৃষ্টিতে। ভিড়ের মধ্যে থেকে নানা রকম গুঞ্জন ভেসে আসছে। মানুষগুলোর চোখে-মুখে শুধু কৌতূহলই নয় উৎকণ্ঠার ভাবও প্রবল।

লাশটা গাড়িতে তুলতেই ভিড় ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। দু-একটা গাড়িও দাঁড়িয়েছিল। আরোহীরাও নেমেছিল কৌতূহল নিরসন করতে। সেই রকম একটা গাড়ির দিকে দৃষ্টি পড়তেই চমকে উঠল শহীদ। ড্রাইভিং সিটে বসা লোকটাকে চেনা বলে মনে হল তার। কুয়াশা? হ্যাঁ, কুয়াশাই বসে আছে গাড়িতে। দৃষ্টি বিনিময় হল দু'জনের মধ্যে। দু'জনই হাসল। কামালেরও দৃষ্টি পড়েছিল কুয়াশার দিকে। সে উল্লাসে চিৎকার করে উঠতে যেতেই বোধহয় নিজের নির্বুদ্ধিতা অনুধাবন করে উৎসাহ দমন করল।

শহীদ দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতেই গোলাম মওলা বলল, 'সাফাকাৎ সাহেব, মানে নিহত যুবকের বাবা এসেছেন। আপনার খোঁজ করছেন তিনি।'

শহীদ বলল, 'ওঁকেও থানায় যেতে বলে দিন। সেখানেই কথা হবে। আসুন, মি. সিম্পসন।'

গাড়িতে চাপল কামাল, শহীদ ও মি. সিম্পসন। মিনিট পনের পরে পৌছুল থানায়। পথে কেউ কোন কথা বলল না। ওরা বসল অফিসার-ইন চার্জ কমরুদ্দিন শেখের কামরায়। শেখ সাহেব তখন অন্য এক তদন্তের কাজে বাইরে

গিয়েছিলেন।

তদন্তকারী অফিসার গোলাম মওলা সাফাকাৎ সাহেবকে নিয়ে থানায় পৌঁছুলেন আরও কয়েক মিনিট পরে। সাফাকাৎ সাহেবের সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি।

বৃদ্ধ সাফাকাৎ সাহেব শহীদের হাত দু'টো ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। কি যেন বলতে গিয়েছিলেন তিনি কিন্তু কান্নার আবেগে কণ্ঠ তাঁর রুদ্ধ হয়ে গেল। শহীদ তাঁকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বলল, 'আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব আপনার ছেলের খুনীকে খুঁজে বের করবার। কিন্তু আমার সাথে সহযোগিতা করতে হবে আপনাকে, আর গোপন রাখতে চেষ্টা করবেন না কোন কথা।'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন তিনি। রুমালে চোখ-মুখ মুছলেন।

মি. সিম্পসন সিগারেট ধরালেন। ধোঁয়া ছেড়ে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি খবরটা কখন শুনেছেন, সাফাকাৎ সাহেব?'

কান্না ও শ্লেষ্মাজড়িত কণ্ঠে সাফাকাৎ সাহেব জবাব দিলেন, 'সকাল সাতটার দিকে।'

'খবরটা কে দিয়েছিল?'

'আমাদের চাকরটা। রাতে নাজু বাসায় ফেরেনি। তাই স্বভাবতই আমরা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। এমনটা তো কখনও এর আগে হয়নি। প্রায় সারা রাত ধরেই জেগে ছিলাম আমরা। আর বিভিন্ন জায়গায় টেলিফোন করেছি। অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কিনা তা জানতে থানায় আর হাসপাতালে ফোন করেছি। সকাল বেলা নিজেই বেরিয়ে পড়েছিলাম খোঁজ নিতে। আমাদের ড্রাইভার, চাকর, বাবুর্চি সবাই বেরিয়েছিল খুঁজতে। একদফা খুঁজে গিয়ে বাসায় ফিরেই কান্নার রোল শুনে বুঝলাম, সর্বনাশ হয়ে গেছে।'

'গতরাতে কোথায় গিয়েছিল? মানে কোথায় যাবার কথা ছিল, বলতে পারেন?'

'সন্ধ্যায় ওর মাকে বলে গিয়েছিল, ক্লাবে যাচ্ছে।'

'গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ। ওর বন্ধুদের কাছে জেনেছি। সেখান থেকে সাড়ে ন'টায় বেরিয়ে যায়। কোথায় গিয়েছিল, কাউকে বলেনি কিছু। ড্রাইভারকে দিয়ে গাড়িটা ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিল আগেই।'

'নাজাকাৎ কি আপনার একমাত্র সন্তান?'

'জ্বি, না। ওর ছোট আর এক ভাই আছে। লণ্ডনে পড়াশোনা করছে। মেয়েটাও লণ্ডনে।'

'নাজাকাৎ কি করত?'

'আমার বিজনেস দেখত। আজকাল সে-ই ব্যবসা দেখত। আমি বলতে গেলে রিটায়ার করেছিলাম। বয়স তো হয়েছে।'

'বিবাহিত?'

'জ্বি, না। দু'এক জায়গায় কথাবার্তা হচ্ছিল। তবে এগোয়নি বেশিদূর।'

'কোনরকম বদভ্যাস? বাজে নেশাটেশা?'

'সিগারেট খেত খুব। অন্য কোন নেশাটেশা বা বদভ্যাস ছিল কিনা জানি না। মাঝে-মধ্যে মদটদ খেত। কিন্তু সে-ও কালে ভদ্রে।'

শহীদ প্রশ্ন করল, 'আপনার ছেলের কখনও হার্টট্রাবল দেখা দিয়েছিল কি?'

'হ্যাঁ। লণ্ডনে পড়াশোনা করার সময় হঠাৎ ওর এনজিনাল পেকটোরিসের অ্যাটাক হয়েছিল। ভাল হয়ে গিয়েছিল অবশ্য। তবু মাঝে মাঝে ই. সি. জি. করে দেখত। কোন ট্রাবল ইদানীং ধরা পড়েনি। ডাক্তারের মতে ওর হৃদযন্ত্র ছিল সম্পূর্ণ সুস্থ। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন, মি. খান? আপনার কি মনে হয়…?'

'পোস্টমর্টেমের রেজাল্ট জানবার আগে কিছুই বলা যায় না। তবে গতকাল অমাবস্যা গেছে। তাই আমার ঐ রকম একটা কিছু আশঙ্কা হচ্ছে। যাক আপনার বোধহয় এখন বাসায় ফিরে যাওয়া দরকার। আপনাকে আর আটকে রাখব না।'

'সেই ভাল। পরে আমরা আপনার সাথে যোগাযোগ করব।' সায় দিলেন মি. সিম্পসন।

ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন সাফাকাৎ সাহেব।

গোলাম মওলা সাহেব বললেন, 'আমারও ধারণা এটা সেই ম্যানিয়াকেরই কীর্তি। এ খুনটাও হয়েছে অমাবস্যার রাতে। স্যার, আমাদের এই থানাতেই এই নিয়ে তিনবার এরকম ঘটনা ঘটল। ঠিক একই রকম কাটার দাগ। রিবের ঠিক নিচ বরাবর। ভুঁড়ি বেরিয়ে গেছে তিনজনেরই। তিনজনেরই ঊর্ধ্বাঙ্গ ছিল অনাবৃত। আর তিনজনেরই বয়স পঁচিশ থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে। সত্যি বলতে কি, স্যার, অমাবস্যা কাছাকাছি এলে আমাদের নিজেদেরই কেমন ভয় ভয় করে। কে জানে, কাকে কখন অ্যাটাক করে বসে।'

'ভয় তো হবারই কথা,' কামাল এতক্ষণে মুখ খুলল.

'আমরা তো, স্যার, এতদিন ব্যাপারটা কোন রকমে বাইরে চাপা দিয়ে রেখেছি। কিন্তু এখন বোধহয় আর তা সম্ভব নয়।'

সবাই চুপ করে রইল অনেকক্ষণ।

মি. সিম্পসন যেন কি বলতে যাচ্ছিলেন। মওলা সাহেবের কণ্ঠ আবার শোনা গেল, 'অ্যাণ্ড ডু ইউ নো, স্যার, মাই ব্রাদার ওয়াজ এ ভিকটিম অব দিস ডেভিল?'

'আপনার ভাই!' বিস্মিত হলেন মি. সিম্পসন।

করুণ হাসি হাসলেন গোলাম মওলা সাহেব, 'হ্যাঁ স্যার, আমার সহোদর। হি

ওয়াজ দা ফার্স্ট ভিকটিম। অথচ কিছুই করতে পারলাম না।' উঠে দাঁড়ালেন তিনি, 'যাই, জরুরি কাজগুলো সেরে ফেলি।' টলতে টলতে বেরিয়ে গেলেন মওলা সাহেব।

বাইরে পদশব্দ শোনা গেল। অফিসার-ইন-চার্জ শেখ সাহেব ঢুকলেন, সঙ্গে মধ্য বয়সী এক ভদ্রলোক।

মি. সিম্পসন বললেন, 'আসুন শেখ সাহেব. আপনার বিনানুমতিতে ঢুকে পড়েছি আপনার কামরায়।'

'নিশ্চয়ই আসবেন, স্যার; নিশ্চয়ই আসবেন। বসুন, ডাক্তার সাহেব। আলাপ করিয়ে দিই। ইনি ড. কুদসী, হার্ট স্পেশালিস্ট। উনি মি. সিম্পসন, শহীদ খান সাহেব আর কামাল আহমেদ সাহেব।'

ড. কুদসী অভিবাদন জানিয়ে বসতে বসতে সহাস্যে বললেন 'কি সৌভাগ্য আমার। একসঙ্গে এতগুলো বিখ্যাত লোকের সাথে আলাপ হল। ভাগ্যিস, গাড়িটা চুরি হয়েছিল।'

'আপনার নামটাও তো আমাদের যথেষ্ট শোনা আছে। বেশ বড় গোছের নাম। হার্ট স্পেশালিস্ট হিসেবে আপনার খ্যাতি তো দেশ-জোড়া।' শহীদ জবাব দিল।

'একটু বোধহয় বাড়াবাড়ি করছেন, প্রশংসা করতে গিয়ে। আসলে আমি তথাকথিত স্পেশালিস্ট বই কিছু নই। এখানে স্পেশালিস্ট সংখ্যা হাতে গোণা যায় বলেই লোকে আমাকে এত চেনে। জানেন তো, নেই দেশে ভেরেণ্ডা গাছও মহীরুহের কদর পায়।' বিনয়ে জানালেন ড. কুদসী।

কামাল বিস্মিত দৃষ্টি মেলে ড. কুদসীকে দেখছিল। ভদ্রলোকের বয়স পঁয়তাল্লিশের মত হবে. দীর্ঘ দেহ। মজবুত স্বাস্থ্য। ঐ দেহে আছে বিপুল শক্তি। ব্যক্তিত্ব-ব্যঞ্জক চেহারা। উজ্জ্বল দু'টি চোখ—শুধু উজ্জ্বল নয়, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। দেখলে ভক্তির ভাব আসে, আবার ভয়ও হয়।

'মহৎ লোক অবশ্যই বিনয়ী হয়। আপনি তার আর একটা প্রমাণ।' ড. কুদসীর দিকে সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিতে দিতে শহীদ বলল।

ড. কুদসী মাফ চেয়ে বললেন, 'আমি ধূমপান করি না।' ঘড়ি দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি। শেখ সাহেবকে বললেন, 'আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, শেখ সাহেব।'

'এই যে লিখছি, ড. সাহেব। কোত্থেকে চুরি হয়েছে গাড়ি?' ডায়েরী লিখতে লিখতে প্রশ্ন করলেন শেখ সাহেব, 'খবরটা বলুন।'

'চুরি হয়েছে আমার গ্যারেজ থেকেই। রাত নয়টায় নিজেই গ্যারেজে গাড়ি রেখেছি। সকালে বেরোবার সময় দেখি গাড়িটা নেই। অথচ তালা দেওয়া আছে পরে অবশ্য দেখলাম. ওটা অন্য একটা তালা।'

'কি গাড়ি ডাক্তার সাহেব?' কামাল জানতে চাইল।

'মার্সিডিস।'

শেখ সাহেব মুখ তুলে বললেন, 'শুধু একটা টেলিফোন করলেই হত।'

'তা হয়ত হত। তবু ভাবলাম, একবার নিজে আসাই ভাল।'

কথাবার্তার ফাঁকে কখন শেখ সাহেব চায়ের অর্ডার দিয়েছিলেন কেউ খেয়াল করেনি। একটা ট্রেতে করে চায়ের দোকানের এক ছোকরা ভাঙা কাপে কয়েক কাপ মালাই ভাসানো চা এনে হাজির করল।

পরিবেশন করলেন শেখ সাহেব নিজেই। কামাল ও শহীদের চায়ের তেষ্টা পেয়েছিল, কিন্তু চায়ের রং আর কাপের সৌন্দর্য দেখে ইচ্ছেটা উবে গিয়েছিল। কি করে এড়ানো যাবে, অথচ শেখ সাহেব ক্ষুব্ধ হবেন না, তাই ভাবছিল দু'জন।

ড. কুদসী পরিষ্কার বললেন, অসময়ে তিনি চা খান না।

শহীদ তার কাপটা তুলে প্রায় সবটাই কামালের কাপে ঢেলে দিয়ে বলল, 'নে খা। সেই কখন থেকে চায়ের তেষ্টা পেয়েছে তোর। আমার বন্ধুটি, বুঝলেন শেখ সাহেব সারাদিন চা খায়। কিরে, আর এক কাপ দিতে বলব, কামাল?'

শেখ সাহেব ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'তাহলে আর এক কাপ আনিয়ে দিই? রহমত আলী।'

'না না, আর লাগবে না।' কামাল হি-হি-হি করে হেসে উঠল। মনে মনে সে শহীদের পিণ্ডি চটকাতে লাগল।

মি. সিম্পসন কামালের দুরবস্থা কল্পনা করে অতিকষ্টে হাসি চাপলেন। গম্ভীর হয়ে চায়ের কাপটা টেনে নিলেন তিনি।

চা'টা শেষ হতেই কামাল উঠে দাঁড়াল। বলল, 'জরুরি কাজ আছে আমার, আমি চলি এবার।'

শহীদ বলল, 'আমিও যাব। মি. সিম্পসন, আপনি বরং বসুন।'

'হ্যাঁ, তোমরা যাও।'

শহীদ ড. কুদসীকে বলল, 'ভাল কথা ড. কুদসী, আপনার চেম্বারে কি ই. সি. জি.-র ব্যবস্থা আছে?'

'আছে, একটা ই. সি. জি. প্ল্যান্ট,' ড. কুদসী জানালেন।

'আমার ছোট বোনের একটা ই. সি. জি. করানো দরকার।

'বেশ তো, সময় করে নিয়ে আসবেন আমার চেম্বারে।'

'আমি না। আমার এই বন্ধুটি যাবে বোনটিকে নিয়ে।'

'বেশ।'

চার

বারান্দায় পা দিয়েই কামাল নিচু গলায় শহীদকে প্রশ্ন করল, 'এই ড. কুদসীকেই কিছুদিন আগে তার এক অ্যাসিস্ট্যান্ট খুন করার জন্যে সার্জিক্যাল-নাইফ নিয়ে তাড়া করেছিল, তাই না?'

'তোরও মনে আছে দেখছি। হ্যাঁ, ইনিই সেই ড. কুদসী। ওঁর এক আধ-পাগলা অ্যাসিস্ট্যান্ট ওকে সার্জিক্যাল-নাইফ নিয়ে খুন করতে গিয়েছিল। ওঁর স্টাফরা অনেক কষ্টে ওঁর প্রাণরক্ষা করে,' শহীদ বলল।

'সেই পাগলটা কি এখনও ওঁর ওখানটায় চাকরি করছে?'

'যতদূর জানি, লোকটাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন ড. কুদসী।'

'পুলিসে দেননি?'

'না বোধহয়! কেন, ভয় করছে নাকি ড. কুদসীর ওখানটায় যেতে?'

'আরে না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল ঘটনাটা, তাই।'

গাড়ির কাছে গিয়ে হঠাৎ শহীদ দাঁড়িয়ে পড়ল। কামালকে বলল, 'তুই যা, আমি মওলা সাহেবের সাথে আলাপ করে আসি।'

পরদিন সন্ধ্যায় ড. কুদসীর চেম্বারে আবার প্রসঙ্গটা উঠল।

ড. কুদসীর চেম্বার ইস্কাটনে। সকাল, বিকাল দু'বেলা চেম্বারে আসেন। ছোট একটা দোতলা বাড়ি। একটা গলির মধ্যে। নিরালয়। দোতলায় ই. সি. জি. প্ল্যান্ট ও ছোট-খাট একটা ল্যাবরেটরি। নিচ তলায় সামনের কামরায় বসেন তাঁর দুই অ্যাসিস্টান্ট—ড. তালেব আহমেদ ও ড. মিনুত সরকার। স্টাফের মধ্যে আর যারা আছে তারা হল, প্ল্যান্ট-অপারেটর সুজাউদ্দৌলা ও নার্স রূপালী বড়ুয়া। দারোয়ান আছে একজন।

লীনাকে নিয়ে সকালেই গিয়েছিল কামাল। তখন রোগীর ভিড় ছিল। ড. কুদসী অত্যন্ত সিরিয়াস ও মেথডিক্যাল চিকিৎসক। অপর দশটা তথাকথিত স্পেশালিস্টদের মত অর্থোপার্জনটাই তাঁর কাছে বড় নয়। পেশাটাকে তিনি সাধনার মত করে গ্রহণ করেছেন। প্রত্যেকটি রোগীকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করেন। ড. তালেব প্রাথমিক উপসর্গগুলো লিখে স্লিপসহ রোগীকে পাঠিয়ে দেন ড. কুদসীর কাছে। সেখানে কম করে হলেও আধ ঘন্টা নানারকম প্রশ্ন করেন ড. কুদসী। তারপর শুরু হয় পরীক্ষা।

সকালের দিকেই রোগী দেখেন তিনি। বিকেলে ঢোকেন ল্যাবরেটরিতে।

কামাল বিকেলে আবার রিপোর্ট আনতে গেল। লীনা আর গেল না। সম্ভবত

কামালের অতি আগ্রহের ফলেই। ড. কুদসী এবেলা এখনও এসে পৌছুননি। কাছেই এক মরণাপন্ন রোগীকে দেখতে গেছেন। সিনিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট ড. তালেবও গেছেন তাঁর সাথে।

মাঝখানের কামরায় বসেছিল জুনিয়'র অ্যাসিস্ট্যান্ট মিন্নত আলী। সুদর্শন হাসি-খুশি তরুণ। সদালাপী। সকাল বেলা প্রথম দর্শনেই তরুণ ডাক্তারকে ভাল লেগেছিল কামালের। সে-ই হেসে অভ্যর্থনা জানাল। বলল, 'বসুন, ডাক্তার সাহেব নেই। রোগী দেখতে গেছেন। এখুনি ফিরবেন।'

মামার রোগীর খবর কি?'

'ভাল, খুব ভাল। অ্যাজ এ ম্যাটার অব ফ্যাক্ট, শী নেভার হ্যাজ হ্যাড অ্যানি ট্রাবল। মিস লীনা খানের হার্টের রোগ আছে, এ ধারণাটা হল কি করে তা বুঝতে পারলাম না। সুস্থ ও সবল হৃৎপিণ্ড। ওর গ্রাফটা পড়া হয়ে গেছে। শুধু স্যারের সই বাকি। তাছাড়া উনিই তো ফাইনাল রিডিং দেবেন।'

'ডাক্তার সাহেবের গাড়ির হদিস পাওয়া গেল কিছু?'

'পাওয়া গেছে। গুলশান ছাড়িয়ে একটা জঙ্গলের মধ্যে।'

'কোন ক্ষতি-টতি?'

'না, একেবারে অক্ষত অবস্থায়। স্যারের কপালটা ভালই বলতে হবে। পুলিস অবশ্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। ভাল কথা, আপনাদের সেই হৃৎপিণ্ড-চোরের খবর কি? আজকের কাগজে দেখলাম, নাজাকাৎ হোসেনও সেই পিশাচটার কবলে পড়েই মারা গেছে। ওরও হৃৎপিণ্ডটাই কেটে নিয়ে গেছে। উঃ, সত্যি কি বর্বর কাণ্ড বলুন তো! মানুষ, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব এমন নিষ্ঠুর হতে পারে! হতে পারে এমন নৃশংস? আমার মনে হয় কি জানেন, কামাল সাহেব, লোকটা, মানে, যে এই হৃৎপিণ্ড চুরি করে বেড়াচ্ছে, সে মারাত্মক কোন ম্যানিয়ায় ভুগছে। জানেন, আমার তো আজকাল রাতে একা একা পথ চলতে ভয় লাগে। বাসায়ও মাঝে মাঝে ভয় করে। একা একা থাকি কিনা?গায়ে কাঁটা দেয়। এই দেখুন, লোমগুলো কেমন কাঁটা দিয়ে উঠেছে।' হাতটা এগিয়ে দেখাল মিন্নত আলী কামালকে। 'অথচ জানেন, আমি মোটেও ভীতু লোক নই। অমাবস্যার অন্ধকারে বাজি রেখে শ্মশানে গিয়েছিলাম। ভূতের পাত্তা পাইনি, কিন্তু এটা যে বাস্তব!'

ভয় পাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। শুধু আপনার কেন, চারদিকে সবখানেই কেমন একটা আতঙ্কের ভাব দেখা দিয়েছে। যে ভয়ঙ্কর কাণ্ড চলছে তাতে দেশ সুদ্ধ লোকও যদি সন্ধ্যার পর দরজা বন্ধ করে দেয় তাহলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। পিশাচটা কখন, কার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কে জানে?' কামাল বলল।

'ঠিক তাই। নাজাকাতের কথাই ধরুন। এই তো সেদিন এসেছিল এই চেম্বারে। ই. সি. জি. করিয়ে নিয়ে গেছে। একদা ওর হার্ট ট্রাবল ছিল। এনজিনাল

পেকটোরসে ভুগত। এখন রীতিমত সুস্থ। হাসি-খুশি লোকটা। দেখা হলেই একগাল হাসি উপহার দিত। অথচ কে জানত, পিশাচটা তার ওপর চড়াও হবে?'

'নাজাকাৎকে তাহলে চেনেন আপনি?'

'নিশ্চয়ই। বললুম তো, আমাদের রোগী ছিল সে।'

'শেষ কবে এসেছিল, বলতে পারেন?'

'এই তো পাঁচ-ছয় দিন আগে,' মনে মনে হিসাব করে বলল মিন্নত আলী। 'আশ্চর্য, ব্যাপারটা কি জানেন, কামাল সাহেব, ম্যানিয়্যাকটার চারজন শিকারকে আমি চিনি। চারজনই আমাদের পেশেন্ট ছিল।'

'বলেন কি!' স্তম্ভিত হল কামাল।

'তবে আর বলছি কি, এই চেম্বারেই আমি ওদের দেখেছি। অ— সেই চারজনের মধ্যে তিনজনই শয়তানটার শেষ তিন ভিকটিম। সর্বশেষ হল নাজাকাৎ।'

একটা সিগারেট ধরাল কামাল। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, 'ড. কুদসী জানেন একথা?'

'ওঁর এসব খেয়াল কম। রোগীদের নাম, চেহারা, পরিচয় ভুলে যেতে ওঁর একটুও সময় লাগে না। বলেছিলাম তাঁকে, উনিও বিস্মিত হয়েছেন খুবই।'

'কতদিন আছেন আপনি এখানে?' কামাল সিগারেটে টান দিয়ে প্রশ্ন করল।

'প্রায় এক বছর হল। মেডিক্যাল কলেজ থেকে বেরিয়েই এখানে শিক্ষানবিশী করছিলাম। তবে মাস তিনেক আগে পাকা পোস্ট হয়েছে চাকরিটা। আমাদের এখানেও এক ম্যানিয়াগ্রস্ত ডাক্তার ছিলেন। অবশ্য ঠিক ম্যানিয়াক বলা যায় না, তবে হিংস্র প্রকৃতির লোক ছিলেন তিনি। কিছুটা ছিটগ্রস্তও। তিনি চলে যাওয়ায় চাকরিটা পাকা হল আমার।'

'হ্যাঁ, কি একটা ইনসিডেন্ট হয়েছিল শুনেছিলাম মাস কয়েক আগে।'

'হ্যাঁ, মাস তিনেক আগে, উনি মানে ড. তোগলক ছুরি নিয়ে তাড়া করেছিলেন ড. কুদসীকে। আমরা অনেক কষ্টে ওঁকে রক্ষা করি। মিস রূপালী বড়ুয়া তো চেতনাই হারিয়ে ফেলেছিল, ভয়ে।'

'তা, হঠাৎ ঐ রকম তাড়া করার কারণটি কি?

'এমনিতেই ভদ্রলোক মাঝে মাঝে স্রেফ অকারণে খেপে যেতেন। তবে সেদিন কি নিয়ে যেন দু'জনের মধ্যে বচসা হয়েছিল। ঠিক বলতে পারব না। জানেন, কামাল সাহেব, ড. তোগলক ছিলেন যাকে বলে রিয়্যাল জিনিয়াস। যদিও সামান্য এল, এম. এফ. ডাক্তার। তবু আমরা যারা এম. বি. বি. এস. পাস করেছি এমন কি যারা বিদেশ থেকে বড় বড় ডিগ্রি নিয়ে এসেছি তারাও ড. তোগলকের নখের যোগ্যতাটুকুও রাখে না। পরিবেশ অনুকূল পেলে তিনি পৃথিবীর একজন সেরা

চিকিৎসক-বিজ্ঞানী হতে পারতেন। উপরে যে ল্যাবরেটরিটা আছে সেটাও তাঁরই সৃষ্টি। আগে প্রধানত উনিই গবেষণা করতেন ল্যাবরেটরিতে। ড. কুদসীও ওঁকে সমীহ করতেন। কিন্তু মাঝে মাঝে খেপে গিয়ে গোলমাল করতেন ড. তোগলক। মাঝে মাঝে কিছুদিনের জন্যে গায়েবও হয়ে যেতেন। শেষের দিকে পাগলামীটা বেড়ে গিয়েছিল। হিংস্রতাও যেন বাড়ছিল। একদিন তো এক রোগীকেই গলা টিপে মারতে গিয়েছিলেন তিনি। অথচ কেন জানি না, ড. কুদসী ওকে ঘাঁটাতেন না। কিন্তু ওঁর সহ্যের সীমা পেরিয়ে গিয়েছিল। মাস চারেক আগে হঠাৎ আগের মতই একদিন গায়েব হয়ে গেলেন ড. তোগলক। ফিরলেন মাস খানেক পরে। সেইদিনই ঘটল সেই ইনসিডেন্টটা। আমি ও ড. তালেব এই রুমে ছিলাম। চিৎকার শুনে দু'জন দৌড়ে গেলাম দোতলায়। ড. তোগলক বাঘের মত গর্জন করছিলেন আর ড. কুদসীকে তাড়া করছিলেন। প্রাণভয়ে দৌড়ুচ্ছিলেন তিনি। ড. তালেব গিয়ে পিছন থেকে ড. তোগলককে ধরে ফেললেন। আমি ছুরিটা কেড়ে নিলাম। ড. তোগলকের কি প্রচণ্ড হুঙ্কার! পারলে উনি আমাদেরই খুন করেন!' থামলেন ড. মিন্নত।

'তারপর?'

'ছেড়ে দিতেই উনি চলে গেলেন। বোধহয় শক্তি ফুরিয়ে এসেছিল। তেমন সবল লোক ছিলেন না অবশ্য। তাছাড়া স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম-কানুনও কখনও মানেননি তিনি। অনিয়ম করেছেন সারাজীবন। ব্যাচেলার মানুষ। দেখা-শোনার কেউ ছিল না।'

'পুলিসে দিলেন না?'

'ড. কুদসী রাজি হলেন না। যাবার সময় আমাদের তিনজনের দিকেই অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ড. তোগলক বললেন, 'সব ক'টাকে আমি দেখে নেব।' তারপর থেকে আর ড. তোগলকের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। হয়ত আবার আগের মতই নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন, এবং মারমুখো হয়ে ফিরে আসছেন।'

বাইরে গাড়ি থামাবার শব্দ পাওয়া গেল। ড. মিন্নত বলল, 'স্যার আসছেন বোধহয়।'

একটু পরেই ড. কুদসী রুমের মধ্যে ঢুকলেন। পিছনে ড. তালেব।

কামালকে ডেকে বললেন, 'হ্যালো, ইয়ং ডিটেকটিভ, কি খবর?'

'খবর তো আপনার কাছে।'

'আমার কাছে?' বিস্মিত হলেন ড. কুদসী। তারপর কি যেন মনে পড়ে যাওয়ায় বললেন, 'আই সী। শহীদ খানের বোনের ই. সি. জি. রিপোর্ট নিতে এসেছেন বুঝি?'

'জ্বি, হ্যাঁ।'

'ই. সি. জি.-র কোন দরকারই ছিল না। হার হার্ট ইজ অলরাইট। মিন্নত, রিপোর্টটা তৈরি হয়েছে? গ্রাফটা দেখি?'

টেবিলের উপর রাখা কাগজের স্তূপ থেকে পিনে আঁটা একগুচ্ছ কাগজ বের করে দিল ড. মিন্নত। ড. কুদসীর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'এই যে, স্যার।'

গ্রাফটার ভাঁজ খুলে আলোতে ধরলেন ড. কুদসী। তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছুরির ফলার চাইতেও তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠল। পুরো এক মিনিট দেখে বললেন, ওয়াণ্ডারফুল। না, কোন গোলমাল নেই। বীটস্ অলরাইট। আর্টারিগুলো ক্লিয়ার। হার্টের মাসলও চমৎকার। আগে সামান্য কনজেস্টেড ছিল। পাতা উল্টিয়ে পরের কাগজটা পড়ে পকেট থেকে কলম বের করে সই করে দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'হৃদরোগ বলতে যা বোঝায় তা নেই, তবে কিনা হৃদয়ে নানারকম রোগ বাসা বাঁধে। ফার্মাকোপিয়ায় তার ওষুধ লেখা নেই। যন্ত্রেও ধরা পড়ে না সে রোগ। তেমন রোগ হলে অবশ্য আমরা অসহায়।'

কামালও হেসে ফেলল। ড. তালেব ও ড. মিন্নত মুখ ফেরাল অন্যদিকে।

ড. কুদসীর চেম্বার থেকে কামাল বেরোল সাড়ে আটটায়।

নিউ মার্কেটে কেনা-কাটার দরকার ছিল কামালের। এলিফ্যান্ট রোড দিয়ে নিউ মার্কেটের দিকে এগোল কামাল। ট্রাফিক-সিগন্যাল পড়েছে। গাড়ি থামিয়ে সবুজ বাতি জ্বলে ওঠার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল সে। ডানদিকে আনমনে মুখ ফেরাতেই দেখল, আধা-অন্ধকারে স্যুট পরা, ফেল্টহ্যাট মাথায় ঢ্যাঙ্গা-পাতলা একটা লোক রাস্তার দিকে বারবার তাকাচ্ছে আর হাতে ধরা কাগজে কি যেন লিখছে। কৌতূহল হল কামালের। সবুজ বাতি জ্বলে উঠতেই কামাল মোড় পেরিয়ে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে গাড়িটা পার্ক করল। তারপর ফিরে এল সেই অন্ধকার জায়গাটায়।

যা ভাবা গিয়েছিল তাই। লোকটা আর কেউ নয়, আদি ও অকৃত্রিম শ্রীমান স্যানন ডি. কস্টা। তখনও সে চলমান গাড়িগুলোর দিকে তাকাচ্ছে আর হাতে ধরা একটা নোট-বইয়ে কি সব লিখছে। গাড়ির নম্বর নয় তো? সন্দেহ হল কামালের।

ডি. কস্টার একদম কাছে গিয়ে দাঁড়াল কামাল। ডি. কস্টার দৃষ্টি তখন কালো একটা পুরানো মরিস মাইনরের দিকে।

কৌতুক ও কৌতূহল মেশানো গলায় কামাল বলল, 'আরে, মি. ডি. কস্টা যে, কি করছেন এখানে?'

আচমকা নিজের নাম শুনে চমকে লাফিয়ে উঠল ডি. কস্টা। তারপর মুখ তুলে বলল, 'আরে, কামাল আমেড সাহেব যে!'

কামাল দেখল, ডি. কস্টা নোট-বই আর পেন্সিলটা দ্রুত পকেটে ঢোকাল।

'কি হচ্ছে এখানে দাঁড়িয়ে?' শুধোল কামাল।

‘কই, নাটো।’ দুর্বল গলায় বলল ডি. কস্টা, ‘কিছুই না। কুছ নেহী।’

‘কি যেন লিখছেন বলে মনে হল?’

‘ওহ্ ইয়েস, নো। কিছুই না। নাথিং। সিম্পলি নাথিং।’

‘মনে হল যেন চলমান জনস্রোতের ছবি আঁকছেন।’

‘ছবি? ইউ মিন পেইন্টিং। ওসব আমার আসে না। টবে আমার আংকল আনর্ল্ড ডি. কস্টা ওয়াজ এ গ্রেট পেইন্টার। ক্যালকাটায় মিনার্ভা হলের চীফ আর্টিস্ট ছিলেন। চেষ্টা করলে অবশ্য আমিও পেইন্টার হটে পারটাম। কিন্তু আংকল বলল, ড্যাখ স্যানন, ইটস্ আ ফিলদি প্রফেশান। খাটবে, বাট নো মানি। গ্রেট পেইন্টারস্ লাইক ভ্যানগগ, গগাঁ অল ডায়েড অব স্টার্ভেশান। আমার আংকল অবশ্য মরেছে লিভার পচিয়ে। সারাদিন মড খেট আর মাটাল হয়ে পড়ে থাকট।’ নাক সিটকাল ডি. কস্টা।

‘তাই বুঝি আপনি আর্টের চর্চা পছন্দ করেন না? কিন্তু আপনাকে দেখলেই আমার মনে হয়, আপনি পাকা আর্টিস্ট। মনে হয় সৃষ্টির আবেগে সব সময় তন্ময় হয়ে আছেন।’

সব ক'টা দাঁত বের করে হাসল ডি. কস্টা। তারপর সহজ কণ্ঠে বলল, ‘কি যে বলেন, মি. আমেড। আসলে আমি কি করছিলাম, জানেন?’

‘না।’

কামালের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল ডি. কস্টা, ‘গাড়ির নম্বর টুকছি।’

‘কেন? হঠাৎ এই প্রফেশান?’ কামালও জবাবে ফিসফিসিয়ে প্রশ্ন করল।

‘উঁহু উঁহু, প্রফেশান নয়। আই অ্যাম সার্চিং এ মার্ডারার।’

‘মার্ডারার!’ চোখ দু'টো বড় বড় করল কামাল।

গলা আরও খাট করে ডি. কস্টা বলল, মিরপুর রোডে পরশু রাটে একটা লোকের লাশ পাওয়া গেছে। ডু ইউ নো? আমি সেই হট্যাকারীকে খুঁজছি। বসকে বললাম। হি শোড কোল্ড শোল্ডার।’

‘তা গাড়ির নম্বরে কি হবে? হত্যাকারীর গাড়ির নম্বরটা আপনি জানেন বুঝি?’

আর এক গাল হাসল ডি. কস্টা। ‘ড্যাটি ইজ মাই বিজনেস সিক্রেট। আই মাস্ট ফাইণ্ড হিম আউট উইডিন টুয়েন্টি ফাইভ ডেজ।’

‘এতদিন কেন?’

‘আই ডোন্ট নো ড্যাট। কিন্তু বস্ গটকাল আমাকে টুয়েন্টি সেভেন ডেজ টাইম দিয়েছেন। এই যা, চলে গেল!’

‘কি গেল?’

‘ড্যাট কার। ইয়েস ইটস ড্যাট কার।’ দ্রুত অপসৃয়মান একটা গাড়ির দিকে

আঙুল দিয়ে দেখাল ডি. কস্টা। তারপর ছুটতে লাগল গাড়িটার পিছনে। বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল কামাল।

পাঁচ

ড. মিন্নত সরকার চেম্বার থেকে যখন বেরোল তখ। রাত সাড়ে ন'টা। ড. কুদসী ও ড. তালেব বেরিয়ে গেছেন আধ ঘন্টা আগেই। কয়েকটা পুরানো ফাইল ঘেঁটে একটা কাগজে কি যেন লিখছিল সে। কাগজটা পকেটে ফেলে উঠে দাঁড়াল। অনেক দেরি হয়ে গেছে। কেমন একটা অস্বস্তি ক্রমেই যেন দানা বেঁধে উঠছিল তার মনের মধ্যে।

দারোয়ানকে ফটক বন্ধ করতে বলে পথে নামল সে। একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে কখন টের পায়নি ড. মিন্নত। পথটা তখনও ভেজা। পানি জমে আছে মাঝে মাঝে। আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন। এই অভিজাত পাড়ার পথে গাড়ি চলে অনেক, কিন্তু ফুটপাথে পথচারী বিরল। বিশেষ করে এই বৃষ্টিসিক্ত রাতে।

বেবীট্যাক্সির খোঁজ করে নিরাশ হল ড. মিন্নত। হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলল প্রায় নির্জন ফুটপাথ ধরে। দু'একটা বেবীট্যাক্সি আসতে-যেতে দেখা গেল কিন্তু কাছে আসতেই বোঝা গেল সেগুলো যাত্রীশূন্য নয়। যাত্রীহীন বেবীট্যাক্সিওয়ালারা আরও এক কাঠি সরেস। ফিরেও তাকাল না তার চিৎকার শুনে।

অস্বস্তিটা ক্রমেই বাড়ছে। আচ্ছন্ন করে ফেলছে তার মনটাকে। একটা অসহায় অব্যক্ত অনুভূতি তার সত্তাকে গ্রাস করছে ধীরে ধীরে। হঠাৎ তার মনে হতে লাগল কে যেন তার পিছনে পিছনে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এগিয়ে আসছে। এখুনি তাকে আঘাত হানবে পিছন থেকে। মেরুদণ্ডের ভিতরটা শিরশির করে উঠছে। সেই…সেই হৃৎপিণ্ড অপহরণকারী নরপিশাচটা নয় তো! না কি ড. তোগলক আসছে ধারাল ছুরি বাগিয়ে, অথবা অশরীরী কোন আত্মা! গা'টা ছমছম করে উঠল ড. মিন্নতের। গায়ের লোমগুলো কাঁটা দিয়ে উঠছে। নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দটা শোনা যাচ্ছে।

হ্যাঁ, স্পষ্ট পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ওর ঠিক পেছনে কে যেন এসে দাঁড়াল। নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঘাড়ের উপর উত্তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলল কে যেন।

ভয়ে ভয়ে পিছনের দিকে চাইল ড. মিন্নত। কই না, কেউ নেই। শুধু অদূরের বৈদ্যুতিক বাতির ম্লান আলোয় একটা ছায়া পড়েছে পথের ধারে। শব্দটাও পায়ের শব্দ নয়। টপ টপ করে বৃষ্টির ফোটা পড়ছে পাতা চুইয়ে। তারই শব্দ। হাওয়ায় শিরশির করে পাতা নড়ছে।

মনের দুর্বলতার জন্যে নিজেকে ধিক্কার দিল ড. মিন্নত। সে জানে, এসব তার

উত্তেজিত স্নায়ুর কল্পনা। এর কোন ভিত্তি নেই, থাকতেও পারে না। নাজাকাতের অস্বাভাবিক মৃত্যু সংক্রান্ত ঘটনা তার মনটাকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে, আর ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছে সে। অনেক আলাপ-আলোচনাও করেছে। সব মিলিয়ে মনটা দুর্বল হয়ে পড়াটাও বিচিত্র নয়। তাছাড়া সেই লোকগুলো? যারা ওদের রোগী ছিল। আর সেই লোমহর্ষক দৃশ্যটা? কাগজটা এখনও পকেটে আছে।

কিন্তু কি বীভৎস, কি ভয়ঙ্কর! আবার ছমছম করে উঠল তার সারা গা। আবার রাজ্যের ভীতি ভয়ঙ্কর মুখ ব্যাদান করে ওকে যেন ঘিরে ফেলতে আসছে। সামনেই মোড়। দ্রুত পা চালিয়ে দিল সে। অনেক মানুষের ভিড়, অনেক আলোর বন্যা তার এই মুহূর্তের কামনা। অনেক মানুষের ভিড়ে সে আত্মগোপন করতে চায়। এই নির্জন পথে আলো-আঁধারির কুহক আর হাওয়ার অস্ফুট কানাকানি তার বিপর্যস্ত স্নায়ুকে যেন কঠোরতম আঘাত হানছে। এ থেকে সে মুক্তি চায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে পরিত্রাণ পাবে কি?

মোড়ে পৌঁছুতেই একটা খালি বেবীট্যাক্সি পাওয়া গেল। মোহাম্মদপুরে যেতে আপত্তি করল না ট্যাক্সিওয়ালা। গাড়িতে বসে একটা সিগারেট ধরাল ড. মিন্নত। একটু স্বস্তিবোধ করল, সাহসটাও ফিরে এল। বাসার কাছাকাছি পৌঁছুতেই বৃষ্টি নামল মুষলধারে।

বস্তুত ঘরে ফিরতে তেমন সাহস পাচ্ছিল না সে। একটা দোতলা বাড়ির উপরের তলায় দুই রুমের একটা বাসা তার। ছোট ভাইটা সঙ্গে থাকে। ছুটিতে বাড়ি গেছে সে। চাকরটা চলে গেছে কয়েকদিন আগে ছুটি নিয়ে। কবে ফিরবে ঠিক নেই। বাসায় এখন দ্বিতীয় কোন প্রাণী নেই। একা একা ভয় করবে ড. মিন্নতের, অন্তত বর্তমান মানসিক অবস্থায়। অথচ বাসায় যাওয়া দরকার। লুকিয়ে রাখতে হবে কাগজটা।

ড. তোগলক চলে যাওয়ার পর থেকেই তার মনটা এমনি অসহায়। ভয়ে মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। অবশ্য এই সত্যটা সে নিজের কাছেও গোপন রাখতে চায়। কিন্তু আজকে যেন ভয়ের বাঘটা উন্মত্ত আক্রোশে হিংস্র নখরাঘাতে তার টুঁটি টিপে ধরছে। আর সেই দৃশ্যটা? উহ, কি ভয়ঙ্কর! কিন্তু কে সেই লোকটা? ড. তোগলক? নিশ্চয়ই সেই। কিন্তু—।

ভিজতে ভিজতে স্কুটার থেকে নামল ড. মিন্নত। অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে টলতে টলতে দোতলায় উঠল সে। কাঁপা কাঁপা হাতে চাবি দিয়ে তালা খুলল, গা-তালা দরজার। চাবিটা খুলে নিয়ে ডান হাত বাড়িয়ে দেয়াল হাতড়ে সুইচ টিপল। আলো জ্বলে উঠতেই মানসিক শক্তিটা ফিরে পেল সে। সিঁড়িতে অস্পষ্ট শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কে যেন উঠে আসছে সিঁড়ি বেয়ে। দরজাটা বন্ধ করে দিল সে। গা-তালায় চাবি দিল। কাঁপা হাতে চাবিটা খুলে রুমের দিকে এগোল। সমস্ত শরীরটা অল্প অল্প

কাঁপছে তার। তবু, তবু যদি সে একবার নিজের রুমের মধ্যে ঢুকতে পারে তাহলে, তাহলে আর আশঙ্কার কিছু নেই।

রুমের তালাটা খুলল সে। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে চাবি লাগিয়ে দিল। যাক, আর ভয়ের কিছু নেই। বাইরের দরজার আর রুমের দরজার তালা খুলে কেউ আর তার কাছে ঘেঁষতে পারবে না। কাপড়-চোপড় বদলে বাথরুমে গেল সে। হাত-মুখ ধুয়ে বেরোতেই বাতি নিভে গেল। মুহূর্তে অন্ধকার নেমে এল ড. মিন্নতের চারদিকে।

শিউরে উঠল ড. মিন্নত। খোলা জানালা দিয়ে দেখল, পাশের বাড়িগুলোতে আলো জ্বলছে। কেউ বোধহয় শুধু এই দোতলার অথবা পুরো বাড়িটার মেইনসুইচ অফ করে দিয়েছে। চিৎকার করে উঠতে গেল সে। কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না।

কিন্তু পরমুহূর্তে জ্বলে উঠল বাতি। আর সেই আলোয় দেখল, চোখে মুখোশ আঁটা বিশাল একটা মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। ডান হাতটা পকেটে। ঠোঁটের কোণে ক্রুর হাসি।

জ্ঞান হারাবার পূর্বমুহূর্তে মনে হল, কে যেন বাইরের দরজায় করাঘাত করছে। আর কে যেন ফিসফিস করে বলল, 'তুমি অনেক কিছু জেনে ফেলেছ, ডাক্তার।'

ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠল টেলিফোন। ঘুম ভেঙে গেল শহীদের। চোখ মেলে হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে বলল, 'হ্যালো, কে··· হ্যাঁ, শহীদ বলছি। ড. কুদসী, কি ব্যাপার?···ড. মিন্নত খুন হয়েছেন! কে তিনি? ও আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট, কোথায়? চেম্বারে? ও বাসায়। মোহাম্মদপুরে···নম্বর বলুন। থানায় খবর দিয়েছেন?···দয়া করে মি. সিম্পসনকে খবর দিন একটু···ওহ্, উনি তাহলে আসছেন। এখুনি যেতে হবে আমাকে?'

রিসিভার রেখে উঠে বসল শহীদ। ঘড়িটা দেখল একটা বেজে বিশ মিনিট।

মহুয়া জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার? কোথায় চললে এত রাতে?'

'ড. কুদসীর এক অ্যাসিস্ট্যান্ট ড. মিন্নত খুন হয়েছেন। যেতে হবে সেখানে। বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেছেন ড. কুদসী।'

'কে, তিনি?'

'লীনার ডাক্তার। কার্ডিওলজিস্ট। কাল যে ডাক্তারের কাছে লীনাকে নিয়ে গিয়েছিল কামাল। আমার সাথে সবে গত পরশু আলাপ হয়েছে ড. কুদসীর। আর মিন্নতের সাথে তো রীতিমত ঘনিষ্ঠতাই হয়ে গিয়েছিল কামালের।'

'ভাল।'

'মানে?'

'আলাপ-পরিচয় হল সবেমাত্র, একটু ঘনিষ্ঠতাও হল। আর সঙ্গে সঙ্গে খুনোখুনি শুরু হয়ে গেল। খুনী যেই জানতে পারল, শহীদ সাহেব বা কামাল সাহেবের সাথে ড. মিন্নতের আলাপ হয়ে গেছে ঠিক তখুনি এল খুন করতে। যেন এর জন্যেই অপেক্ষা করছিল সে।'

'তোমার ব্যাখ্যাটা বিচিত্র।' শয্যা ত্যাগ করতে করতে বলল শহীদ। 'আর এই রকম জানা-শোনার পর খুনোখুনি হয় বলেই তো আমি সহজে নাক গলাতে পারি আর কালপ্রিটটাকে চিনতে পারি আরও সহজে, এই কথাই বলতে চাচ্ছ বুঝি?' সিগারেট ধরাল শহীদ।

সে কথার জবাব দিল না মহুয়া। হঠাৎ সে বিছানায় ধড়মড় করে উঠে বসে বলল, 'কিন্তু তুমি যেতে পারবে না এই খুনোখুনির মধ্যে।'

'হঠাৎ একথা!' বিস্মিত হল শহীদ।

'আমার যেন কেমন ভয় করছে। মনে হচ্ছে কি জান, অমাবস্যার রাতের খুনের সাথে, মানে সেই ক্লিওয়া...র সাথে এই খুনের সম্পর্ক আছে। লোকটা যে কত বড় পাষণ্ড আর ভয়ঙ্কর তা তো বুঝতেই পারছ। যদি সে একবার জানতে পারে, কেউ তার পিছনে লেগেছে তাহলে তাকে রেহাই দেবে না।'

'কিন্তু কথা দিয়েছি যে, যাব। তাছাড়া দুটো ঘটনার মধ্যে যোগাযোগ নাও থাকতে পারে। থাকলেও এখন সরে আসা কাপুরুষতা। লোকে তোমার স্বামীকে কাপুরুষ বলুক, এটাই কি তুমি চাও?'

মহুয়া চটে গিয়ে বলল, 'তা চাইব কেন? কিন্তু মাথার উপর বিপদ যে ঘনিয়ে আসছে, সেটাও কি তোমাকে বলতে নিষেধ নাকি?'

শহীদ হেসে বলল, 'না না, তা নিষেধ হবে কেন? তবে তুমি তো জানই, আমি সব সবয় সাবধান থাকি। তাছাড়া এতদিন কম ক্রিমিন্যালও ঠেঙাইনি। আমার শক্তির ওপর তোমার কি আস্থা নেই?'

মহুয়া লজ্জিত হল। বলল, 'তা আছে বই কি?'

শহীদ বলল, 'লক্ষ্মীটি, ভয়ের কিছু নেই। যত বড় ক্রিমিন্যালই হোক না কেন তাকে একদিন না একদিন ধরা পড়তেই হবে। কিন্তু তার জন্যে চাই চেষ্টা, চাই পরিকল্পনা। এই ক্রিমিন্যালটাকে ধরতে না পারলে হয়ত অনন্তকাল ধরে প্রতি অমাবস্যায় একজন করে নিরীহ লোক মারা যাবে তার হাতে। সুতরাং আমাকে তার খোঁজ করতেই হবে, যদিও এখন যে হত্যাকাণ্ড তদন্ত করতে যাচ্ছি তার সাথে অমাবস্যার রাতের হত্যাকাণ্ডের সম্পর্ক আছে কিনা সেটা এখন পর্যন্ত জানি না। তুমি আমাকে বাধা দিয়ো না, লক্ষ্মীটি।'

মহুয়া আর কিছু বলল না। শহীদ তাকে আদর করে উঠে পড়ল

বেশভূষা পাল্টে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল শহীদ।

গন্তব্যস্থানে পৌঁছুতে লাগল মিনিট দশেক। একটা জীপের পাশে দুইজন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গাড়ি থামাল শহীদ।

গাড়ি দেখে একজন কনস্টেবল এগিয়ে এল। দরজা খুলে বেরোতেই কনস্টেবলটি বলল, 'স্যার, ওঁরা সব উপরে আছেন। আপনাকে উপরে যেতে বলেছেন। আসুন, আমার সাথে।'

'মি. সিম্পসন এসেছেন?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

সরু সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠল শহীদ কনস্টেবলের সাথে। সেখানে মি. সিম্পসন, ইন্সপেক্টর গোলাম মওলা ও ড. কুদসী বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। ড. কুদসী শহীদকে দেখে বললেন, 'আসুন, মি. খান। দেখুন তো, কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! এই যে এই রূমটার মধ্যে।'

কামরার মধ্যে আলো জ্বলছে। মাটিতে চিত হয়ে পড়ে আছে একটা মানুষ। সেদিকে এগিয়ে গেল শহীদ। লুঙ্গি-গেঞ্জি পরা এক যুবক। চোখ দু'টো তার ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। জিভ বেরিয়ে পড়েছে। সব মিলিয়ে মুখটা একটা বীভৎস আকার ধারণ করেছে।

ড. কুদসী বললেন, 'গলা টিপে মারা হয়েছে লোকটাকে।'

শহীদ 'হুঁ' জাতীয় একটা শব্দ করে মি. সিম্পসনের দিকে তাকালেন। তিনি বললেন, 'খুব সহজ ব্যাপার। বাইরের ও রূমের দরজায় গা-তালা ছিল। আমি এসে দুটো গা-তালাতেই চাবি পেয়েছি। হত্যাকারী ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দরজা খুলেছে।'

'একসঙ্গে আসেনি তো? মানে, পরিচিত লোক নয় তো?' মি. সিম্পসনের চোখের দিকে চোখ রেখে শহীদ প্রশ্ন করল।

মি. সিম্পসন বললেন, 'পরিচিত লোক নিশ্চয়ই। কিন্তু একসঙ্গে আসেনি। ডুপ্লিকেট চাবি ব্যবহার করেছে লোকটা। ড. মিন্নতের চাবির গোছা পাওয়া গেছে ঐ টেবিলটার উপরে। পরীক্ষা করে দেখেছি, ওখানে গা-তালা দরজার চাবি আছে। তালাতে ঢুকিয়েও দেখেছি। ডুপ্লিকেট চাবিগুলো মওলা সাহেবের কাছে আছে। ইচ্ছে করলে দেখতে পার তুমি।'

'পরে দেখব'ক্ষণ। ড. কুদসী, আপনি কখন খবর পেলেন?'

ড. কুদসী ঘুম থেকে উঠে এসেছেন বোঝা যাচ্ছিল। চোখে-মুখে কাঁচা-ঘুমের চিহ্ন। চুল উস্কো-খুস্কো। পাজামা-পাঞ্জাবী পরা। বিষণ্ন দৃষ্টি। তিনি বললেন, 'আমি খবর পেয়েছি সাড়ে বারটার দিকে। মিন্নতের বাড়িওয়ালা ফোনে খবর দিয়েছেন। উনি নিচে থাকেন। ওঁকে জানিয়েছে মিন্নতের চাকর সাকের আলী। চাকরটা দেশে গিয়েছিল। রাতেই ফিরেছে। বাসায় ফিরে দেখে, মিন্নত মেঝেতে পড়ে আছে।

কাছে গিয়ে অবস্থা দেখে নিচে বাড়িওয়ালাকে খবর দেয়। তিনি আমাকে জানান। বাসায় জানান। আমি আবার জানাই আপনাকে আর মি. সিম্পসনকে।'

লাশটা দেখে আবার বারান্দায় ফিরে এল শহীদ। গোলাম মওলাকে জিজ্ঞেস করল, 'সেই চাকরটা কোথায়?'

'কিচেনে বসে আছে বোধহয়। ওখানেই থাকতে বলেছি ওকে,' গোলাম মওলা বললেন।

'আসতে বলুন ওকে। কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে হবে।'

গোলাম মওলা কিচেন থেকে ডেকে আনলেন চাকরটাকে। মধ্য-বয়সী লোকটা। বোকা-বোকা চেহারা। মুখভর্তি দাড়ি গোঁফ। চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ। কাঁপতে কাঁপতে এল লোকটা। এসেই ভেঙে পড়ল, 'আঁই কিছু ন জানি, হুজুর। আঁই কিছু ন জানি । আঁই আয়ি দেই, সাব পড়ি আছে। আঁই কিছু ন জানি।'

শহীদ তাকে অভয় দিল। বলল, 'তোমার ভয়ের কিছু নেই। আমরা তোমাকে সন্দেহ করছিনে। তুমি শুধু বল, তুমি এসে কি দেখেছ।'

লোকটা গামছা দিয়ে চোখ দু'টো ডলে বলল, 'হুজুর, আঁই আইজা বাড়িথনে আইছি, হুজুর। আঁই দেই, দরজা হাট করি খোলা। বারের দরজাও খোলা, ঘরের দরজাও খোলা।'

'বাতি জ্বলছিল?'

'জ্বে।'

'তারপর?'

'বাইরা পোটলা রাখি সাবের ঘরে ঢুইকলাম। ঐ যে আঁর পোটলা, হুজুর। দেখি, সাব মাটিতে পড়ি আছে। ছোৎ করি সাবের থনে যাই দেহি, চোখ-মুখ সাবের উল্টা! জিব বারাইয়া রইছে। আঁই এক চিক্কুর দিয়া সোজা নিচে বাড়িয়ালারে খবর দিতাম যাই।'

'তারপর?'

'তাইনরা হক্কলেই ঘুমাইতেছিলেন। অনেক চিক্কুর পাড়ি নজীর সাবরে তুললাম।'

'নজীর সাহেব কে?'

'বাড়িয়ালার বড় ছেইলা, হুজুর। তাইনরে কইলাম। তাইন আঁর লগে উপরে উড়ি আইয়া ছাইলেন। পরে নিচে নামি যাই থানায় ফোন করি দিলেন। বড় ডাক্তার সাবরেও খবর দিলেন।'

'তুমি ফিরেছ কখন?'

'ঠিক কইতাম পারুম না, হুজুর। তয় এগারটায় ত্যাজগাও ইস্টিশনে টেন থামছে।'

'হেঁটে এসেছ, না গাড়িতে এসেছ?'
'হাঁইটা আইছি, হুজুর। তখন হুজুর, খুব বৃষ্টি।
'কাউকে বেরিয়ে যেতে দেখেছ, এই বাসা থেকে?'
'জ্বে, না।'
'সিঁড়িতে?'
'জ্বে, না।'
'তোমার সাহেবের আত্মীয়-স্বজন কোথায় সব?'
'সব দ্যাশের বাড়িতে, হুজুর। তাইনের ছুডু ভাই এই বাসায় সাবের লগে থাকতেন। তাইনও ছুডিতে বাড়ি গ্যাছেন।'
'তোমার সাহেব লোক ছিলেন কেমন?'
'খুব ভালা মানুষ, হুজুর। ফেরেশতার লাহান মানুষ,' ভেজা গলায় বলল সে।
'সেই নজীর সাহেবকে ডেকে আনতে পার?'
'জ্বে। তাইনে বলছেন, দরকার হলি আঁরে ডাকি আইন, সাকের আলী।'
'যাও, ডেকে নিয়ে এস।'
সাকের আলি চলে গেল। শহীদ একটা সিগারেট ধরাল। লম্বা একটা টান দিয়ে এক-গাল ধোঁয়া ছাড়ল। নীরবে চিন্তা করতে লাগল সে। তারপর মি. সিম্পসনকে জিজ্ঞেস করল, 'খুলে রাখা শার্ট-প্যান্টের পকেটে কিছু পাওয়া গেছে?'
'একটা পার্সে কিছু টাকা পয়সা ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায়নি,' জবাব দিলেন মি. সিম্পসন।
সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গেল। একটু পরেই সাকের আলীর পিছনে এক যুবক এসে দাঁড়াল। সালাম জানাল ওদেরকে।
শহীদ বলল, 'আপনিই নজীর সাহেব?'
'জ্বি হ্যাঁ, নজীর কোরেশী।'
'নিচ তলায় থাকেন?'
'জ্বি, হ্যাঁ, এটা আমাদের বাড়ি। ডাক্তার সাহেব আমাদের ভাড়াটে ছিলেন।'
'কতদিন হল?'
'মাস তিনেক।'
'সাকের আলীর সাথে আপনিই ডাক্তারকে দেখতে এসেছিলেন?'
'জ্বি, হ্যাঁ। সে গিয়ে হাউমাউ করে কি সব বলল। প্রথমটাতে তো বুঝতেই পারলাম না। তবে যখন বুঝলাম তখন ওর সাথে চলে এসে দেখলাম—।'
'তারপর?'
'থানায় খবর দিলাম আর,' ড. কুদসীকে দেখিয়ে বলল। 'ওঁকে খবর দিলাম। ডাক্তার সাহেব যে ওঁর ওখানে চাকরি করেন, তা আমরা জানতাম।'

'ড. মিন্নতের সাথে আলাপ ছিল আপনার?'

'সামান্য। উনি তো সারাদিনই প্রায় বাইরে থাকতেন। দুপুরে যখন বাসায় থাকতেন আমি তখন অফিসে। রোববার বা অন্য ছুটির দিনে দেখা সাক্ষাৎ হত।'

'উনি লোক ছিলেন কেমন?'

'ভালই। বেশ ভাল মানুষ। নিরিবিলি। কোন হৈ-চৈ নেই। ঝামেলা নেই। ব্যবহারও ভাল ছিল। সদালাপী ছিলেন।'

'এই খুনের ব্যাপারে আপনার কাউকে সন্দেহ হয়?'

নজীর বলল, 'সন্দেহ? না, কা'কে সন্দেহ করব আমি? ওঁর সম্পর্কে আমি জানিই বা কতটুকু?'

'শেষ কবে ড. মিন্নতের সাথে দেখা হয়েছিল আপনার?'

'দিন তিনেক আগে। রাতে। দশটার দিকে। উনি বাসায় ফিরছিলেন। আমি একটু দোকানে গিয়েছিলাম। পথে দেখা।'

'আলাপ হয়েছিল কিছু?'

'তেমন কিছু না। "কেমন আছেন" টুকু পর্যন্ত। তখন খুব ক্লান্ত ছিলেন তিনি।'

'আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম। রাতও হয়েছে অনেক। এবার আপনি বিশ্রাম নিন গে। পরে দরকার হলে আপনাকে খবর দেব। আর যদি আপনি প্রয়োজন বোধ করেন তাহলে যোগাযোগ করবেন আমার সাথে অথবা মি. সিম্পসনের সাথে।'

মাথা নেড়ে চলে গেল নজীর।

সিগারেটের শেষাংশটা মাটিতে ফেলে জুতো দিয়ে পিষে শহীদ বলল, 'ড. কুদসী, আপনি এ ব্যাপারে কোন আলোকপাত করতে পারেন?'

ড. কুদসীকে খুব বিষণ্ন দেখাচ্ছিল। তিনি মাথাটা নেড়ে বললেন, 'কিছুই বুঝতে পারছিনে, মি. খান। কর্মঠ, সচ্চরিত্র, প্রাণোচ্ছল, হাসি-খুশি মিন্নতের কোন শত্রু থাকতে পারে, তা আমি কোনদিন ভাবতে পারিনি। ছেলেটা ছিল খুব কাজের, আমি ওকে তাই স্নেহ করতাম খুব। আমাকেও সে খুব শ্রদ্ধা করত। বোধহয় কিছুটা ভয়ও পেত। তাই কথা বড় বেশি বলত না আমার সামনে। ওর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে তাই আমার কোন আইডিয়া নেই। তবে ওর শত্রু থাকতে পারে, বিশেষ করে ওকে খুন করার মত শত্রু থাকতে পারে সেটা আমি কখনোই কল্পনা করিনি।'

'আজকেও তো চেম্বারে গিয়েছিল শুনলাম, কামালের, মানে আমার বন্ধুর কাছে। আমার বোনের ই.সি.জি, রিপোর্ট আনতে গিয়েছিল কামাল।'

'হ্যাঁ, গিয়েছিলেন আপনার বন্ধু। আমি আর তালেব গিয়েছিলাম এক রোগী

দেখতে। ফিরে এসে দেখি, মিন্নত ও কামাল সাহেব গল্প করছেন।'

'কামালের কাছেই শুনলাম, কয়েক মাস আগে আপনার চেম্বারে একটা ইনসিডেন্ট হয়েছিল?'

'হ্যাঁ, ঘটেছিল একটা ঘটনা,' নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বললেন ড. কুদসী।

'এমনও তো হতে পারে, এই হত্যাকাণ্ডের সাথে সে ঘটনার যোগাযোগ আছে?'

ড. কুদসী চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'সন্দেহটা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। ড. তোগলক সত্যিই অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির লোক ছিলেন। তবে এত হিসেব করে চাবি চুরি করে কিংবা ডুপ্লিকেট তৈরি করে খুন করতে আসবার মত চাতুর্য তার আছে বলে মনে হয় না। তোগলক হচ্ছে আবেগপ্রবণ মানুষ। মুহূর্তের আবেগ দ্বারা পরিচালিত হয় সে। আর এই খুনটা হয়েছে ঠাণ্ডা মাথায়। তবু একেবারে উড়িয়ে দিই কি করে সন্দেহটা? বিশেষ করে, গোড়া থেকেই ড. তোগলক মিন্নতকে দু'চোখে দেখতে পারত না। আমার কাছে অনেকদিন অনেক নালিশ করেছে। তারপর ঐ ঘটনা। সেদিনও ড. তোগলক ওর বিরুদ্ধেই নালিশ করতে গিয়েছিল আমার কাছে। তাই নিয়েই ঝগড়া হয় আমার সাথে ড. তোগলকের। খেপে গিয়ে আমাকে তাড়া করে।'

'ড. তোগলক এখন কোথায়, বলতে পারেন? আপনার চেম্বারের চাকরি ছেড়ে দেবার পর তার সাথে আর আপনার দেখা হয়েছে?'

'কোথায় থাকে বলতে পারব না। আগে যেখানে থাকত সেখানে এখন থাকে না। বলতে গেলে, সে নিরুদ্দেশ হয়েছে। অবশ্য গত তিনমাসে তাকে আমি তিনবার দেখেছি।'

'সর্বশেষ কবে দেখা হয়েছে?'

ডাক্তার একটু ইতস্তত করে বললেন, 'গতকাল।'

'কোথায়?'

'গুলশানে। আমার বাসার কাছেই।'

'আচ্ছা, ডাক্তার সাহেব, এই হত্যাকাণ্ডের সাথে সেই হৃৎপিণ্ড চুরি ঘটিত হত্যাকাণ্ডের কোন যোগাযোগ আছে বলে কি আপনার মনে হয়?'

ড. কুদসী চমকে উঠলেন। তারপর অনেকক্ষণ ভেবে বললেন, 'আপনি বলতে চাইছেন, যে লোকটা মানুষের হৃৎপিণ্ড খেয়ে বেড়াচ্ছে অমাবস্যার রাতে সেই লোকটাই মিন্নতকে খুন করেছে কিনা, অর্থাৎ ড. তোগলকই মানুষের হৃৎপিণ্ড খেয়ে বেড়াচ্ছে কিনা? অ্যাবসার্ড!' মাথা নাড়লেন তিনি, 'অ্যাবসার্ড! আমার মতে, এই খুনের সাথে কোন যোগ নেই হৃৎপিণ্ড-অপহরণ রহস্যের।'

শহীদ আর একটা সিগারেট ধরিয়ে নীরবে টানল অনেকক্ষণ।

ইন্সপেক্টর গোলাম মওলা খুকখুক করে কেশে উঠলেন। শহীদ তার দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, 'লাশটা আর এখানে রেখে কি হবে? পাঠিয়ে দিই মর্গে।'

মি. সিম্পসন জবাব দিলেন তাঁর প্রশ্নের। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, লাশ পাঠিয়ে দিন। আর এখানে পাহারার ব্যবস্থা করুন।'

'পাহারার ব্যবস্থা করেছি, স্যার,' এগোতে এগোতে বললেন মওলা সাহেব।

'চলুন, আমরাও যাই। এখানে এখন আর থাকবার দরকার নেই। চলুন, ড. কুদসী,' শহীদ বলল।

ড. কুদসী একটু ইতস্তত করলেন। কি যে বলতে চাইলেন। তারপর বোধহয় মনস্থির করে বললেন, 'চলুন যাই।'

তিনজন নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। ড. কুদসী গিয়ে গাড়িতে উঠলেন। তাঁর গাড়ি দৃষ্টির আড়ালে যেতেই শহীদ বলল, 'মি. সিম্পসন, আসুন, রুমগুলো আবার ভাল করে সার্চ করতে হবে, যদি কিছু পাওয়া যায়।'

'চল,' মি. সিম্পসন বললেন।

আবার দু'জন উঠে এল। কয়েকজন কনস্টেবল তখন চাদরে মোড়া লাশটা নিয়ে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। ওদের পাশ কাটিয়ে দু'জন উঠে এল।

শহীদ ডাকল, 'সাকের আলী?'

'জ্বে।' কিচেন থেকে বেরিয়ে এল সাকের আলী।

'তুমি রাতে কোথায় থাকবে?'

'হুজুর, রাইত আর বেশি নাই। এটু ফরেই আজান দিবে। পুলিস সাবরা তো এহানে থাকব। আঁইও থাকুম রাইড্ডা। ব্যানে আঁর বাতিজার বাসায় যামু রায়ের বাজার।'

'হ্যাঁ, যেয়ো। কিন্তু ঠিকানাটা দিয়ে যেয়ো। ভাল কথা, সাকের আলী, তোমার সাহেবের কারও সাথে ঝগড়াঝাঁটি ছিল নাকি?'

'আঁই তো তেমুন কিছু ন জানি। তয় সাব বড় ভাল মানুষ। তাইনের তো শত্রু থাহনের কথা না।'

'কোন বদভ্যাস ছিল নাকি? এই ধর, জুয়ো-টুয়ো কিংবা মদ?'

'জ্বে, না।'

'আচ্ছা, তুমি তাহলে যাও শুয়ে পড়গে। আমরা ওর ঘরটা একবার সার্চ করব। আসুন, মি. সিম্পসন।'

সমস্ত ঘর দু'জনে তন্ন তন্ন করে সার্চ করল। সন্দেহজনক কিছু পাওয়া গেল না। কোন রকম সূত্রও মিলল না। পাশের রুমটা সার্চ করেছিলেন মি. সিম্পসন। শহীদ অনেক খুঁজে ট্রাঙ্কের তলায় পড়ে থাকা একটা ময়লা কাগজ আবিষ্কার করল।

কাগজটা পড়ে চমকে উঠল সে। টোকা দিয়ে আলগা ময়লা ঝেড়ে কাগজটা পকেটে ফেলল শহীদ।

মি. সিম্পসন ফিরে এসে বললেন, 'পাশের রুমটায় কোন ছাত্র, সম্ভবত ড. মিন্নতের ভাই থাকত। এঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কিত গাদা খানেক বই ছাড়া আর কিছু নেই।'

'তাহলে চলুন যাই এবারে,' শহীদ বলল। 'সকাল হতে আর দেরি নেই। রাত সাড়ে চারটে এখন। অন্তত ঘন্টা খানেক ঘুমিয়ে নিতে পারলে মন্দ কি?'

বাইরের দরজায় একজন কনস্টেবল একটা টুলের উপর বসে ঝিমুচ্ছিল। ওরা দু'জন বেরিয়ে আসতেই সে দরজা বন্ধ করে দিল।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে মি. সিম্পসন প্রশ্ন করলেন, 'কিছু বুঝলে, শহীদ?'

শহীদ কি যেন ভাবছিল, সে আনমনে জবাব দিল, 'তেমন কিছু না। আপনি?'

'আমার অবস্থাও তথৈবচ। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই হত্যাকাণ্ডের সাথে হৃৎপিণ্ড অপহরণ সংক্রান্ত হত্যারহস্যের নিবিড় যোগাযোগ আছে।'

'ধারণার কারণ?' গাড়ির পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল শহীদ।

'ড. তোগলকের সঙ্গে ড. কুদসীর যে একটা সংঘর্ষ ঘটেছিল সে খোঁজটা আমিও করেছি। তোগলক সাহেব সেই থেকে গা-ঢাকা দিয়েছেন। ভদ্রলোকের অতীত অনুসন্ধান করেছি আমি। এমনিতে রেকর্ড খারাপ কিছু নেই। পাগলাটে উদ্ভট ধরনের। সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র, শুধু হিংস্র নয়, ভয়ঙ্কর হিংস্র। ঐ ধরনের লোকের পক্ষে খুন করা বিচিত্র ব্যাপার নয়। একবার এক রোগীকে গলা টিপে মারতে গিয়েছিলেন তিনি। ড. কুদসীর ল্যাবরেটরিতে উনি কাজ করতেন। হৃৎপিণ্ড নিয়ে নানারকম গবেষণা করতেন তিনি। মানুষের নয়, প্রধানত ভেড়ার। কিন্তু তাঁর পক্ষে মানুষ খুন করে তার হৃৎপিণ্ড নিয়ে গবেষণার কথা চিন্তা করা অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া শুধু মেডিসিনে নয় সার্জারীতেও তাঁর হাত ছিল পাকা। যে ক'টা লোককে হত্যা করে হৃৎপিণ্ড কেটে নেয়া হয়েছে বিশেষজ্ঞদের মতে তার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই পাকা হাতের কাজ ছিল। মানতেই হবে যে লোকটা দক্ষ সার্জন। সাধারণ খুনী নয়।'

'সুতরাং—?'

'হয়ত ড. মিন্নত সেটা জানতে পেরেছিল। হয়ত তাই তাকে সরিয়ে দেয়ার দরকার হয়েছিল।'

'কিন্তু ব্যাপারটা তাহলে ড. কুদসীরও জানবার কথা।'

'না। কারণ গবেষণার কাজে ড. কুদসী বড় একটা সময় দিতে পারতেন না। যদিও তিনি উৎসাহ দিতেন ড. তোগলককে।'

'কিন্তু ড. কুদসী তো বললেন, দুটো ঘটনার মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে বলে

তিনি মনে করেন না।'

'আমি তার কথা বিশ্বাস করি না। এমনও তো হতে পারে, তিনি জেনে-শুনেও ব্যাপারটা চেপে আছেন।'

'কিন্তু ড. কুদসী একজন হীন নরঘাতককে, একজন ম্যানিয়াককে কোন কারণে প্রশ্রয় দিচ্ছেন, এটাও কি খুব যুক্তিসঙ্গত কথা হল, মি. সিম্পসন?'

'এমনও তো হতে পারে ড. তোগলককে উনি ভয় করেন বলে প্রাণভয়েই চেপে যাচ্ছেন সব। অন্যথায় তাঁর অবস্থাও ড. মিন্নতের মত হত।'

'তা অবশ্য সম্ভব,' শহীদ স্বীকার করল।

'একথা তাহলে স্বীকার করছ?'

শহীদ মাথা নেড়ে বলল, 'এক'শ বার। কিন্তু প্রমাণ কোথায়?'

'সেইটাই তো সমস্যা,' চিন্তাজড়িত কণ্ঠে বললেন মি. সিম্পসন।

আকাশটা ইতিমধ্যে ফর্সা হয়ে গেছে। দু-চারটে রিকশা বেরিয়েছে। প্রাতঃভ্রমণকারীরাও বেরিয়ে পড়েছে দু-একজন। কয়েকজন মুসল্লিকে দেখা গেল পথে।

পকেট থেকে গাড়ির চাবি বের করতে করতে শহীদ বলল, 'ড. মিন্নত স্রেফ অকারণেই ভ' পাননি। কিছু একটা কারণ ছিল।'

'তার মানে?'

'কামাল বলছিল, ড. মিন্নতকে নাকি সন্ধ্যায় খুব বিচলিত দেখাচ্ছিল। কেমন ভীত বিপর্যস্ত। হয়ত নিশ্চিত একটা আশঙ্কা দানা বেঁধেছিল তার মনে।'

'তাহলে তো মেনে নিতেই হয়, দুটো ঘটনার মধ্যে যোগাযোগ একটা আছেই।'

'সেটা তো আমিও স্বীকার করছি। কিন্তু কথা হল যোগাযোগ কতটা আর কোন ধরনের? তাছাড়া ঐ যে বললাম, নির্দিষ্ট প্রমাণ কোথায়? তবে একটা কথা আমাকে খুব স্ট্রাইক করেছে।'

'কি কথা?'

'ড. মিন্নত কামালকে জানিয়েছিল যে, যারা ম্যানিয়াকটার হাতে মারা পড়েছে তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন নাকি ড. কুদসীর চেম্বারের রোগী ছিলেন। ড. তোগলকের রোগী।'

'তাই নাকি! অবশ্য তাদের সবাই যে একদা হৃদরোগে ভুগত এই তথ্যটা তো আমরা অনেক আগেই আবিষ্কার করেছি।'

'কিন্তু তাদের হত্যাকালীন হৃদযন্ত্রের অবস্থা কেমন ছিল সে তথ্যটা জানবার উপর অনেক কিছুই নির্ভর করছে। আপনি বরং সেই খোঁজটা নেবার চেষ্টা করুন।'

'আর কোন খোঁজ নেবার দরকার হবে না, শহীদ, বুঝলে। আসল কালপ্রিট

যে কে তা বুঝতে আর বাকি নেই। এখন তাকে খুঁজে বের করাটাই একমাত্র কাজ।'

হাসল শহীদ।

মি. সিম্পসন বিব্রত কণ্ঠে বললেন, 'তুমি হাসলে যে বড়?'

'বেশ তো, খুঁজে বের করুন ভদ্রলোককে। আমার মনে হয়, সে কাজটাও অত্যন্ত দুরূহ।'

'ড. কুদসীর কাছে নিশ্চয়ই দু-একটা ছবি পাওয়া যাবে ভদ্রলোকের। অন্তত নিখুঁত একটা বিবরণ পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই। তারপর দেখা যাক।' মি. সিম্পসন বললেন, 'অবশ্য কাজটা যে অত্যন্ত দুরূহ তাতে তো কোনই সন্দেহ নেই।'

শহীদ বলল না কিছু। গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বলল, 'বিকেলে দেখা হবে।'

মি. সিম্পসন নিজের গাড়ির দিকে এগোলেন। গোপন একটা রহস্য ভেদ করার আনন্দে তিনি খুব খুশি হয়ে উঠেছেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে গাড়িতে উঠলেন তিনি।

ছয়

লনেই দাঁড়িয়েছিল মহুয়া। গাড়িটা প্রাঙ্গণের মধ্যে ঢুকতেই মহুয়া পোর্টিকোর দিকে, যেখানে গাড়িটা এসে থামল, এগিয়ে গেল সেখানে।

মহুয়ার চোখ-মুখ শুকনো। চুলগুলো রুক্ষ।

শহীদ দরজা খুলতে খুলতে বলল, 'নিশ্চয়ই ঘুমোতে পারনি আমি যাওয়ার পরে। তোমার চোখ-মুখ তার প্রমাণ।'

'সত্যি জান, আমার কেমন যেন ভয় করছিল। এমনটা এর আগে কোনদিন করেনি। মনে হয়, ভ ঙ্কর একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে আমাদের চারদিকে। যা হোক, সকাল বেলা এসব নিয়ে মাথাব্যথা করার দরকার নেই। পরে ঢের সময় পাওয়া যাবে। চা দেব, না একেবারে গোসল করে নাস্তা করবে? আমি বলি কি, রাত জেগে এসেছ, একেবারে গোসলটা সেরেই নাস্তা কর।'

শহীদের বাবা ইসলাম খাঁ সাহেব লীনার সাথে বেরিয়ে এলেন লনে। তিনি বললেন, 'রাতে নাকি কোথায় গিয়েছিলে? বৌমা বলছিল।'

'জ্বি, আব্বা। কোথাও যাচ্ছেন বুঝি?'

'লীনাকে নিয়ে বেড়িয়ে আসি একটু। আয়, লীনা।'

'বেশি দেরি করবেন না যেন। নাস্তা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।' মহুয়া সতর্ক করে দিল। 'দেখিস, লীনা, ম্যাক্সিমাম আধ ঘন্টা। আর, দূরে যাসনি যেন। গাড়ি-টাড়ির

দিকে খেয়াল রাখিস।'

'আচ্ছা, হবে হবে। তোমার সব ব্যাপারেই বাপু খবরদারী,' লীনা কৃত্রিম রাগ দেখাল।

লীনা আর ইসলাম সাহেব বেরিয়ে গেলেন।

'বেশ, তাহলে আমি গোসলটা সেরেই আসি।'

নিজের রুমে ঢুকল শহীদ মহুয়ার পিছন পিছন। কিন্তু বাথরুমে ঢুকবার আগেই টেলিফোনটা আবার বে-রসিকের মত বেজে উঠল।

এগিয়ে গিয়ে রিসিভারটা তুলতে তুলতে শহীদ বলল, 'না, জ্বালালে দেখছি। হ্যালো···হ্যালো···শহীদ বলছি ওহ···ড. কুদসী। আবার কি হল এইটুকু সময়ের মধ্যে···চুরি··· ল্যাবরেটরিতে···চেম্বারেও। হ্যাঁ, খবরটা আমাকে দিয়ে ভাল করেছেন···হ্যাঁ হ্যাঁ, ড. মিন্নতের খুনের সাথে যোগাযোগ থাকতেও পারে। ··দারোয়ান খবর দিয়েছে?···কি হারিয়েছে···আপনি এখনও যাননি চেম্বারে? পুলিসে খবর দিয়েছেন?···কি হারিয়েছে, জানাবেন আমাকে টেলিফোনে, দরকার হলে নিশ্চয়ই যাব।'

মহুয়া বলল, 'শুধু চুরি কেন, এখন থেকে পকেটমারের তদন্তও শুরু করে দিলে পার।'

শহীদ হেসে বলল, 'ভাবছি গরু চোরই বা বাদ যায় কেন?'

মহুয়া বলল, 'আর এক হাফ-ডিটেকটিভ তো সকালে তিনবার ফোন করেছিল।'

'হাফ-ডিটেকটিভ! সে আবার কে? তোমার ভ্রাতার নতুন পোষ্য সেই মি. স্যানন ডি. কস্টা বুঝি? সেও আবার টেলিফোন করতে শুরু করেছে নাকি? তার আবার কি হয়েছে?'

'আরে, সেই কস্টা সাহেব নয়। তোমার বন্ধুবর কামাল আহমেদ সাহেব। সারারাত বুঝি ঘুমোয়নি। সকাল হতেই টেলিফোন করতে শুরু করেছে। কি নাকি আইডিয়া এসেছে তার মাথায়।'

'তবে তো সেরেছে। আমি বাথরুমে ঢুকলাম। ফোন করলে আসতে বলে দিয়ো। ভাল কথা, আমি কোথায় গিয়েছিলাম রাতে, বলেছ নাকি কামালকে?'

'বলেছিলাম।'

'কি বললে শুনে?'

'প্রথমে তো আঁতকে উঠল। বিশ্বাসই করতে চাইল না। পরে বলল, তার মাথায় ব্রিলিয়ান্ট সব আইডিয়া এসেছে।'

'তারপর?'

'বারবার ফোন করছে আইডিয়াগুলো শোনাবার জন্যে।'

'ওহ। তাহলে সেগুলো নিয়ে আসতে বলে দিও।' বাথরূমে ঢুকল শহীদ। আর সঙ্গে সঙ্গে আবার ফোনটা বেজে উঠল।

ঘন্টা খানেক পরে কামাল এসে পৌঁছুল। শহীদ তখন নাস্তা শেষ করে সবে চায়ে চুমুক দিচ্ছে। ইসলাম সাহেব নাস্তা শেষ করে চলে গেছেন।

'তোর মাথায় কি সব ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া গিজগিজ করছে যেন?' উত্তেজিত কামালকে ডাইনিংরূমে ঢুকতে দেখেই শহীদ প্রশ্ন করল। কিছু একটা আবিষ্কারের আনন্দে কামালের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, লক্ষ্য করল শহীদ।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল কামাল।

'দেখিস, ভাঙবে চেয়ার। সেগুন কাঠের সি. এফ.টি. কত জানিস?'

'কি করে জানব? আমি তো আর কাঠের কারবার করি না।'

'সেই তো, আদার ব্যাপারী কাঠের দর জানবে কি করে? তা, বৎস কামাল, তোমাকে এমন উত্তেজিত দেখাচ্ছে কেন? যেন দিগ্বিজয় করে এসেছ বলে মনে হচ্ছে।'

'সল্‌ভ্ করে ফেলেছি পুরো রহস্যটা।'

'তাই নাকি! হত্যাকারী কে?' সিগারেট ধরিয়ে জিজ্ঞেস করল শহীদ। কামাল সোৎসাহে বলল, 'নিশ্চয়ই হত্যাকারী সেই পাগল ডাক্তারটা, ড. তোগলক। কাল সারারাত ধরে ভেবে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ডগুলো সেই শয়তানটা ছাড়া আর কেউ করছে না। সকালে বৌদি যখন বললেন ড. মিন্নত খুন হয়েছেন, তখন আর সন্দেহের অবকাশটুকুও রইল না।'

'এই বুঝি তোর ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া? নিশ্চয় তোর সিদ্ধান্তের কথা মহুয়াকে বলেছিস?'

'কই, না তো! বৌদি, তোমায় বলেছি নাকি? আমার তো মনে পড়ছে না।'

মহুয়া বলল, 'কই, মনে পড়ছে না তো। তোমাকে আমি তেমন কিছু বলেছি কি?' শেষের কথাটা বলল শহীদের উদ্দেশ্যে।

'বললে না আমাকে, হাফ-ডিটেকটিভ সাহেব ফোন করেছিল? আমি ভাবলুম, তোর এই ওয়াণ্ডারফুল সিদ্ধান্তের জন্যেই মহুয়ার এই এপ্রিসিয়েশান।'

'হো হো করে হেসে উঠল সবাই। লীনা প্লেটের দিকে মুখ নামাল।'

'তোর সব তাতেই ঠাট্টা। আমার সল্যুশনটা নিশ্চয়ই তোর পছন্দ হচ্ছে না?'

'একশ'বার হচ্ছে। মি. সিম্পসনেরও ধারণা, ড. তোগলকই কালপ্রিট। এখন তাকে খুঁজে বের করলেই, ব্যস।'

'আমিও তো তাই বলছি।'

'কিন্তু, বাছা, আমি তা বলছি না।'

থতমত খেয়ে কামাল বলল, 'তাহলে তোর কি ধারণা?'

'স্পষ্ট কোন ধারণা নেই। ড. তোগলকও কালপ্রিট হতে পারেন। কিন্তু এই সন্দেহটাকে প্রমাণ করার মত কোন কনক্লুসিভ এভিডেন্স যতক্ষণ না পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ আমি তোগলকের পশ্চাদ্ধাবন করতে রাজি নই।'

'কিন্তু ঘটনাবলী তো ড. তোগলকের দিকেই ইঙ্গিত করে।'

'তা অস্বীকার করি না। কিন্তু যে কথা আমি বারবার বলছি তা হল, প্রমাণ কোথায়? স্রেফ সন্দেহই কি যথেষ্ট?'

'বেশ, তুমি প্রমাণের অপেক্ষায় থাক। আর এদিকে একটার পর একটা লোককে ড. তোগলক খুন করে তার হৃৎপিণ্ড কেটে নিক। কিন্তু ভায়া, একটা কথার জবাব দেবে?'

'জানা থাকলে অবশ্যই দেব।'

'ডাক্তার তোগলক পালিয়ে গেল কেন? সে গা-ঢাকা দিয়েছে কেন? তিনমাস ধরে তাকে দেখা যাচ্ছে না কেন?'

'এই রহস্যের মীমাংসা হলে তো সমস্তটাই হয়ে গেল,' হেসে বলল শহীদ।

মহুয়া খাবারের প্লেট কামালের সামনে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'যাক, রহস্যভেদের সময় অনেক পাওয়া যাবে। আপাতত এগুলোর সৎকার কর। সকাল বেলা মাথা খারাপ নাইবা করলে।'

শহীদ বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সেইটেই ভাল। পেটে কিছু পড়লে ঘিলুটা খেলবে ভাল।'

'সে তো তোকে দেখেই বুঝতে পারছি,' থালাটা কাছে টেনে নিয়ে বলল কামাল।

টোস্টে মাখন লাগাতে লাগাতে কামাল জিজ্ঞেস করল, 'ড. মিন্নতের মার্ডার সম্পর্কে ড. কুদসী কি বললেন, রে?'

'বিশেষ কোন আলোকপাত করতে পারলেন না, ড. কুদসী। ওদিকে আর এক কাণ্ড হয়েছে। ড. কুদসীর চেম্বারে চোর ঢুকেছিল রাতে তালা ভেঙে।'

'সে কি!' বিস্মিত হল কামাল। 'চুরি গেছে কি কি?'

'তা বলতে পারলেন না ড. কুদসী। শুধু বললেন, আলমারিতে যত কাগজপত্র ছিল সেগুলো তন্ন তন্ন করে কে যেন ঘেঁটেছে। ওর মধ্যে থেকে কিছু হারিয়েছে কিনা তা একমাত্র ড. মিন্নতই বলতে পারত। ফাইল-টাইল তো সে-ই গুছিয়ে রাখত।'

'যাবি নাকি?'

'দরকার নেই!'

'এখন তাহলে কি করবি?'

'ঘুমোব নাকে তেল দিয়ে। রাতের ঘুমটা পেড়ে নিতে হবে না এখন?' শহীদ

বলল।

কামাল চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে বলল, 'আমি তাহলে মি. সিম্পসনের অফিসে চললাম।'

উঠে দাঁড়াল কামাল। একটা সিগারেট ধরাল। কামাল জানে, শহীদ এখন ঘুমোবে না। এখন সে চিন্তা করতে বসবে। সে এখন নিরিবিলিতে সমস্ত ব্যাপারটা ভাববে। সুতরাং ওকে ডিসটার্ব করা উচিত হবে না।

দরজার দিকে এগোতে এগোতে কামাল বলল, 'যতই ভাব না কেন, বৎস, সিদ্ধান্ত ঐ একটাই! আগেই তো তা বলে দিয়েছি।'

সাত

আবার এসেছে অমাবস্যার রাত। পুলিস বাহিনী আজ সতর্ক। সন্ধ্যা থেকেই পুলিস টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে শহরের সর্বত্র। পুলিস বাহিনীর তৎপরতায় অবশ্য ঢাকার বাসিন্দাদের আতঙ্ক বেড়েছে।

বেশি আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছে অবশ্য তারাই যাদের বয়স পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে। প্রচুর গুজব রটছে এবং গুজব পল্লবিত হয়ে শহর জুড়ে একটা বিভীষিকার রাজত্ব সৃষ্টি করে তুলেছে।

পথে আজ লোকজন চলাচল অপেক্ষাকৃত কম। সিনেমায়, বাসে, চায়ের দোকানে স্বাভাবিক ভিড় নেই। যে ক'জন আছে তাদের চোখে-মুখে শঙ্কার আভাস। অপরিচিত লোককে সবাই আড়চোখে দেখছে। সন্দেহের চোখে দেখছে। রাত আটটার মধ্যেই শহরের সব দোকানপাট প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে।

আবাসিক এলাকাগুলোতে যেন নিশুতি রাতের স্তব্ধতা বিরাজ করছে। দু'একটা এলাকায় হাস্যকর ঘটনাও ঘটে গেছে। একটা এলাকায় কয়েকটা ছোকরা মিলে এক আধবুড়ো জোয়ান ভিখিরীকে পিটিয়ে লাশ বানিয়েছে। আবার দু'-এক জায়গায় কয়েকজন পাগল মার খেয়েছে।

গোটা শহরটাই আতঙ্কে ম্রিয়মান। কে জানে, কখন কার পাশে, অমাবস্যা রাতের সেই নিষ্ঠুর শয়তানটা নিশ্চিত মৃত্যুর মত এসে হাজির হবে। তারপর বক্ষ চিরে হৃৎপিণ্ড বের করে নিঃশব্দ পৈশাচিক উল্লাসে কালরাত্রির অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে। কে জানে, কখন শেষ হবে এই ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের রাত।

শুধু সরগরম হয়ে আছে ঢাকা স্টেশন। স্টেশনের বাইরে একটাও যানবাহন নেই। বাইরের যারা এসেছে তারা ধারণা করছে, ঢাকায় বোধহয় যানবাহন ধর্মঘট চলছে। কিন্তু ধর্মঘট তো সাধারণত রাতে থাকে না। তবে কি কারফিউ? কিন্তু কিছু কিছু লোকও চলাচল করছে। স্টেশনের চারদিকে পুলিসও দেখা যাচ্ছে

অনেক। অথচ যাত্রীদের তারা বাধা দিচ্ছে না।

খোঁজ করতে গিয়ে যা তারা শুনছে তাতে তাদের পিলে চমকে উঠছে। কেউ বলছে, শহরে নাকি হায়েনা বেরিয়েছে দলে দলে। কেউ বলছে, মানুষ নাকি মন্ত্র পড়ে হায়েনা হয়ে রক্ত খাচ্ছে। একজন তো বলল, 'আমার চাচা নিজের চোখেই দেখেছে, একটা লোক হঠাৎ হায়েনার মত হয়ে গেল।'

আর একজন বলল, 'তোর চাচার হাড্ডি কড়মড় করে খেয়ে ফেললে বুঝি?'

'না, চাচা তিনতলা বাড়ির ছাদের উপর দাঁড়িয়ে ছিল।'

অন্য একজন বলল, 'পাঁচতলার একটা রুমে উঠে হায়েনাটা এক যুবতীর রক্তপান করেছে বলে কাগজে লিখেছে।'

যাত্রীরা আর শহরের দিকে এগোতে সাহস পেল না।

চট্টগ্রাম মেল ছাড়বার সময় হয়েছে। যাত্রীসংখ্যা আজ কম। ইয়ার্ডে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন।

ইয়ার্ডের বাইরে একটা কার এসে থামল। বলিষ্ঠ এক বৃদ্ধ নামলেন গাড়ি থেকে। স্যুট পরা, মুখে পাইপ, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। কয়েকজন কুলী এগিয়ে এল। বৃদ্ধ ইশারা করলেন গাড়ির বুট থেকে মাল নামাবার জন্যে। মাল বলতে, ছোট একটা স্যুটকেস আর একটা হাল্কা হোল্ডল।

গেট পেরিয়ে ট্রেনের দিকে এগিয়ে গেলেন বৃদ্ধ। একটা ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টের সামনে এসে দাঁড়িয়ে রিজার্ভেশন স্লিপটা পড়তে লাগলেন। কুলীটা পিছনে এসে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে চেকারও এসে দাঁড়িয়েছে। সে বলল, 'ক্যান আই হেল্প ইউ, স্যার?'

বৃদ্ধ চেকারের দিকে তাকালেন। চেকার দেখল, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি মেলে বৃদ্ধ তার দিকে চেয়ে আছেন। চেকারের বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল সেই দৃষ্টির সামনে। বৃদ্ধ রাশভারী গলায় বললেন, 'নো, থ্যাঙ্কস।'

নীরবে সরে পড়ল চেকার। যেন বেঁচে গেল সে।

দরজা খোলাই ছিল। উঠে পড়লেন বৃদ্ধ। চার-বার্থের ছোট কম্পার্টমেন্ট। দুটো আপার আর দুটো লোয়ার বার্থ। একজন এসে গেছে। অবশিষ্ট দু'জন এখনও আসেনি।

কুলীটা পিছনে পিছনে উঠল মাল নিয়ে।

বৃদ্ধ বললেন, 'বিছানাটা পেতে দাও, হে।'

'উপরে, না নিচে?'

বৃদ্ধ এবারে কথা বললেন না, আঙুল দিয়ে ইশারা করে নিচের বার্থটা দেখিয়ে দিলেন। কুলীটা বিছানা পেতে দিয়ে পয়সা নিয়ে চলে গেল।

সামনের বার্থে বসেছিল এক যুবক। রিডার্স ডাইজেস্ট পড়ছিল কামরার ম্লান

আলোয়। বৃদ্ধকে উঠতে দেখে তাঁর দিকে তাকাল। হঠাৎ তার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। তার দিকে ফিরেও তাকালেন না বৃদ্ধ যাত্রী। কিন্তু যুবক তাঁকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। মুখটা পরিচিত বলে মনে হচ্ছে তার। কোথায় যেন তাঁকে দেখেছে সে। এ মুখ তার ভাল করেই চেনা। কে? কে, এই সৌম্যকান্তি বৃদ্ধ? কিন্তু চোখ দুটো কি তীক্ষ্ণ। 'আমি ওকে চিনি? ভাল করেই চিনি। অথচ এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।' স্মৃতির পাতা হাতড়াতে লাগল যুবক।

বৃদ্ধ পোশাক বদলালেন না। সিটের উপর বসে বাইরে ইয়ার্ডের দিকে মুখ ফিরিয়ে ধূমপান করতে লাগলেন নীরবে।

ট্রেন ছাড়বার সময় হয়েছে। ঘন্টা পড়ে গেছে। চেকার এসে দরজা খুলল। বৃদ্ধের দিকে তাকাবার ভরসা না পেয়েই বোধহয় যুবককে জিজ্ঞেস করল 'আসেননি বোধহয় আর দু'জন?' তার কণ্ঠস্বরে বৃদ্ধ ফিরে তাকালেন।

যুবক বলল, 'এখন পর্যন্ত তো দেখছি নে।'

'ওহ্, আচ্ছা। ট্রেন ছাড়লে, ইচ্ছে করলে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিতে পারেন।' চলে গেল চেকার।

একটু পরেই ট্রেনে গতি সঞ্চারিত হল। ধীরে ধীরে ইয়ার্ড অতিক্রম করল ট্রেন। বৃদ্ধ তখনও বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন।

যুবকও তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। সে ভাবছে নিজের কথা। আজ বছর খানেক হল সে বেকার। বিরাট একটা সংসারের বোঝা তাকে বইতে হয়। বৃদ্ধ বাপ-মা, ভাই-বোন নিয়ে অনেকগুলো মুখ। হার্ট ট্রাবল হওয়ায় তার চাকরি চলে গিয়েছিল, ঠিক তা নয়। ছাড়তে হয়েছিল। ডাক্তার বলেছিলেন পূর্ণ বিশ্রাম চাই, আর কোনরকম উত্তেজনার যেন কোন কারণ না ঘটে। চাকরি করত তখন এক মেডিকেল ফার্মে। রিপ্রেজেনটেটিভ ছিল সে। কিছু জমানো টাকা ছিল। বিয়ের জন্যে জমিয়েছিল টাকাটা। বেকারত্বের আমলে সেই টাকায় তার চিকিৎসা করা হয়েছে। সংসারের চাকাটা কোনক্রমে ঘুরেছে এবং সেই টাকাতেই বোনটা ইউনিভার্সিটিতে পড়ত। পড়া শোনা ছেড়ে দিয়ে চাকরি নিয়েছে। কিন্তু কতই বা পায় সে।

এখন সে রীতিমত সুস্থ। একটা চাকরি চাই। কিন্তু চাকরির বাজার এখন মন্দা। আগে যে ফার্মে চাকরি করত সেখানে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। সংবাদপত্র খুলে কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে ইদানীং প্রায়ই দরখাস্ত করত সে। ইন্টারভিউ পেত দু-একটা। কিন্তু চাকরি জুটত না।

হঠাৎ গত পরশু চট্টগ্রাম থেকে একটা ইন্টারভিউ কার্ড এসে হাজির। একটা মেডিকেল ফার্ম পাঠিয়েছে কার্ডটা। ঐ ফার্মে সে দরখাস্ত করেছিল কিনা মনে পড়ছে না তার। কিন্তু ইন্টারভিউ কার্ডের সাথে ট্রেনের টিকেট পাঠিয়েছে।

ফার্স্টক্লাস কম্পার্টমেন্টের টিকেট। রিজার্ভেশনও আছে তার নামে। বাদবাকি খরচ ইন্টারভিউ-এর সময় দেওয়া হবে। খুব বড় ফার্ম হবে হয়ত। তাই মুক্ত হস্তে পয়সা ব্যয় করতে বাধে না। চাকরি ঠিক এখানেই হবে, জানে সে। বাড়িসুদ্ধ সবাই খুশি হয়েছিল সম্ভাবনার আনন্দে। কিন্তু টিকেটের তারিখ দেখে বোনটা কেমন যেন চমকে উঠেছিল। যুবক বলেছিল, 'কিরে চমকে উঠলি যে?' বোন কিছু বলেনি। কিন্তু ব্যাপারটা বোঝা গেল আজ সকালে। আব্বা পঞ্জিকা দেখে বললেন, 'অমাবস্যা আজ রাতে। যাত্রা নাস্তি পঞ্জিকায় লিখেছে।' মায়ের মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

যুবক তার মাকে বলল, 'ওসব পঞ্জিকার কথা। লিখে দিয়েই খালাস। যাত্রা নাস্তির খোঁজ করলে ট্রেনগুলো মাসের মধ্যে পনের দিন বন্ধ থাকত।' আব্বা আর কিছু বললেন না। কিন্তু মা বললেন, 'কিন্তু ঐ যে…ঐ যে সেই…সবাই কী সব বলছে!'

'ওসব গুজব। এই সুযোগ আমি বাজে গুজবের ভয়ে হারাতে পারি না। সংসারের কি হাল দেখছ? বাজে কতকগুলো গুজবের ভয়ে সংসারের আরও অসুবিধা ঘটাতে পারব না আমি।' গুজবে যে তার মায়ের অবিচল আস্থা তা সে জানে।

'সে কথা তো ঠিকই। কিন্তু জীবনটা তো সকলের আগে। তুই যেতে পারবি না, বাবা। মরলে সবাই একসঙ্গে না খেয়ে মরব। আমার বুকের ভেতরটা কাঁপছে। লক্ষ্মী, বাবা।'

'লক্ষ্মী, মা মণি। দেখে নিয়ো, আমার কিছু হবে না। পরশু দেখবে, হাসতে হাসতে ফিরে এসেছি। তুমি বাধা দিয়ো না, সোনা মা।'

সন্ধ্যার আগেই স্টেশনে এল সে। এ প্রস্তাবটা ছিল তার বোনের।

আসবার সময় কাঁদছিলেন মা। আব্বারও চোখ দুটো ভিজে। তাঁর ঠোঁট দুটো কাঁপছিল। কিন্তু কিছু বলতে সাহস পাচ্ছিলেন না। খোকার চাকরি হওয়াটা বড় দরকার। অথচ আজকের এই বিভীষিকার রাতে ছেলেকে একাকী পাঠাতে বুকের ভিতরটা তাঁর ভেঙে আসছিল। বোনটা বলল, 'সাবধানে থাকিস, দাদা।'

ভয় জিনিসটা সংক্রামক। তার নিজেরও ভয় করছিল না এমন নয়, কিন্তু সে একটা চাকরির জন্যে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। সামান্য গুজবের ভয়ে এমন একটা চাকরির সম্ভাবনা নষ্ট করা যে কত বড় বোকামি সে তা জানে। অবশ্য হৃৎপিণ্ড চুরির ঘটনা সে কাগজে পড়েছে। এ নিয়ে আলোচনা শুনেছে। নিজেও অনেক আলোচনায় যোগ দিয়েছে। কিন্তু দুনিয়ায় এত লোক থাকতে বিশেষ করে তার হৃৎপিণ্ডের দিকেই সেই কালপ্রিটটা নজর দেবে এমন সম্ভাবনা সে স্বীকার করে না। তাছাড়া ঐ ঘটনার সবগুলোই ঘটেছে ঢাকা শহরে। অন্তত তাই সে শুনেছে। আর

সে তো থাকবে ঢাকার বাইরে। সুতরাং তার ভয়ের কি আছে। এটুকু রিস্ক নেওয়াতে তার আপত্তি নেই।

ট্রেনের গতি বাড়ছে। তেজগাঁ ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন ছাড়িয়ে এসেছে ট্রেন। পরবর্তী স্পপেজ টঙ্গী।

এখন একটু ঘুমিয়ে নেয়া দরকার। কামরার ভিতর মুখ ফেরাল যুবক। দেখল, সামনের বার্থে বসা বৃদ্ধ এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখ দুটো যেন জ্বলছে বাঘের মত।

যুবকের বুকের ভিতরটা দুরুদুরু করে উঠল এক অজানা আশঙ্কায়। তবে কি, এ সেই! তার মনে হল, বৃদ্ধ যেন নিষ্ঠুর হাসি হাসছে তার দিকে তাকিয়ে। সমস্ত শরীরটা থরথর করে কাঁপতে লাগল তার। কপালে ঘাম দেখা দিল। হৃৎপিণ্ডটা তার লাফাচ্ছে। এখুনি কি সে চেতনা হারাবে? না, চেতনা হারালে চলবে না তার। দরকার হলে রুখে দাঁড়াবে সে। কিন্তু সাহস কোথায়? শক্তিই বা কোথায়? সে যে ইতিমধ্যেই নিঃশেষিত! আর ঐ বিরাট পেশল শক্তিশালী লোকটার কাছে তো সে একটা শিশু! হোক না কেন সে বৃদ্ধ? যুবক জানে, ঐ বৃদ্ধের দেহে আছে অফুরন্ত শক্তি। তার সাথে দৈহিক শক্তিতে সে এঁটে উঠতে পারবে কি? তবু, তবু সে একবার দেখবে। উঃ, কি ভয়ঙ্কর দৃষ্টি!

...লোকটা যে উঠে দাঁড়াল! হ্যাঁ, এগিয়ে আসছে। চিৎকার করে উঠবে যুবক? কিন্তু কে শুনবে? ট্রেনের গর্জনে চাপা পড়ে যাবে তার আর্তনাদ।

ভীত হরিণের মত অসহায় দৃষ্টিতে বৃদ্ধের দিকে চেয়ে রইল সে। লোকটা এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। নিঃশব্দ পৈশাচিক হাসি ফুটে উঠেছে তার সৌম্য-সুন্দর মুখে। এখন সে চিনতে পেরেছে। কিন্তু তাতে লাভ আছে কি?...তোমরা সবাই শোন, এই সেই পিশাচ আমি ওকে চিনি। এ হচ্ছে সেই...।

...লোকটা কি যেন বলছে, 'ভয় পেলে? ভয়ের কি আছে? এতটুকু কষ্ট হবে না।...পরম শান্তিতে ঘুমোবে তুমি। ঘুমোও, মাই চাইল্ড। ঘুমিয়ে পড়।...

চোখ দুটো বুজে এল যুবকের।

আট

পরদিন সকালে শহীদ তীব্র উৎকণ্ঠায় লনে পায়চারি করছিল। মি. সিম্পসনের পরামর্শে গতরাতে সমস্ত শহরটা পুলিস পেট্রল দিয়ে বেড়িয়েছে। এতে লাভ হবে কতটুকু সে সম্পর্কে সন্দেহ ছিল শহীদের। কিন্তু কিছু বলেনি, কারণ সাবধানের মার নেই, হৃৎপিণ্ডলোভী দানবটা যদি সত্যি কোন টহলদার বাহিনীর হাতে পড়ে যায়।

তাছাড়া শহীদ নিজের কাছেই লজ্জিত বোধ করছিল কারণ এই জটিল রহস্যের জট ছাড়াতে এখনও সে পারেনি। কে জানে, হয়ত তার বা তাদের ব্যর্থতার ঋণ আর কাউকে শোধ দিতে হল কিনা।

সকাল আটটার দিকে মোড়ের মুদি-দোকানের ছোকরা একটা চিঠি নিয়ে এল। শহীদকে সালাম জানিয়ে বলল, 'আপনার চিঠি, স্যার।'

চিঠিটা হাতে নিতে নিতে শহীদ বলল, 'কে দিল রে? কোথায় পেলি?'

'একটা দাড়িওয়ালা সাহেব, হুজুর। বুড়ো মানুষ। গাড়িতে এসেছিল। খুব লম্বা-চওড়া।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। তুই যা।'

চিঠিটা খুলল শহীদ। ছোট একটা চিরকুট। খবরের কাগজের কোণা ছিড়ে লেখা, স্পষ্ট গোটা-গোটা অক্ষরে: 'সিদ্ধিলাভের চরম মুহূর্তে আমি কোন বাধা মানব না। আমার পথ থেকে সরে দাঁড়াও। অন্যথায় আমার রোষানলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

বিঃ দ্রঃ—তোমরা এত চেষ্টা করে কি করতে পারলে? আমার শিকার আমি ঠিকই খুঁজে নিয়েছি। পারবে না। পারবে না, আমার পথে বাধা সৃষ্টি করতে। ধ্বংস হয়ে যাবে।'

অভিবাদনহীন, স্বাক্ষরহীন চিঠি। সকাল বেলা যেন মূর্তিমান ব্যঙ্গ আর হুমকি হিসেবে হাজির হয়েছে। ভাল করে পরীক্ষা করে বুঝতে পারল, বাম হাতে লেখা হয়েছে চিঠিটা। ভাঁজ করে পকেটে ফেলল সে কাগজটা।

ঘন্টাখানেক পরে নিরাশার সুরে মি. সিম্পসন জানালেন, সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। চট্টগ্রাম মেলের প্রথম শ্রেণীর কম্পার্টমেন্টে পাওয়া গেছে এক যুবকের মৃতদেহ। তার হৃৎপিণ্ডটা পাওয়া যাচ্ছে না।

পুরো খবরটা শোনা গেল সন্ধ্যায়। কামাল ও শহীদ দু'জনেই গিয়েছিল মি. সিম্পসনের কাছে। তিনিই জানালেন যুবকের নাম, তাজুল ইসলাম। একটা ইন্টারভিউকার্ড পেয়ে চট্টগ্রাম যাচ্ছিল সে। এক মেডিক্যাল ফার্ম থেকে এসেছিল কার্ডটা। তারা বার্থ রিজার্ভ করে টিকেট পাঠিয়েছিল। ফার্মটার নাম 'জনপ্রিয় ফার্মাসিউটিক্যালস'। যুবক বছর খানেক আগে হৃদরোগে ভুগেছিল। ড. কুদসীর নাম তাজুল ইসলামের বাড়ির লোকজন শোনেনি।

এ সম্পর্কে ড. কুদসীও কোন হদিস দিতে পারেননি। তাঁর ফাইল-পত্র সব চুরি হয়ে গেছে গত মাসে। মি. সিম্পসন চট্টগ্রামে খোঁজ-খবর করে দেখেছেন, সেখানে 'জনপ্রিয় ফার্মাসিউটিক্যালস' নামে কোন মেডিক্যাল ফার্ম নেই। যে খামে করে ইন্টারভিউ কার্ড ও ট্রেনের টিকেট এসেছিল সেটা খুঁজে পওয়া যায়নি যুবকের মালপত্রের মধ্যে।

চেকার ও স্টেশন মাস্টারের স্টেটমেন্ট থেকেও তেমন কিছু জানা গেল না। চেকারের কাছে জানা গেল, যে কামরায়, এই ঘটনা ঘটেছে তাতে বার্থ ছিল চারটে। দু'জন যাত্রী শেষ পর্যন্ত আসেনি। নিহত যুবক ছাড়া অন্য যে ভদ্রলোক ঐ কামরাতে চেপেছিলেন তিনি বৃদ্ধ। লম্বা-চওড়া মানুষটা। মুখে দাড়ি আছে। রাসভারী প্রকৃতির মানুষটা। দেখলেই ভয় লাগে। টঙ্গী স্টেশনে সেই চেকারই যুবকটিকে নিহত অবস্থায় দেখতে পায়। দরজা খোলা দেখে কৌতূহলী হয়ে ভিতরের দিকে তাকাতেই তার চোখে পড়ে সেই বীভৎস দৃশ্যটা। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটাকে সে আর দেখতে পায়নি। বিছানাপত্র রেখেই চলে গেছেন তিনি। স্টেশনের এনকোয়্যারীতে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে ঐ কামরায় বার্থগুলোর যাত্রীরা ছিলেন—তাজুল ইসলাম, আবদুস হাশেম, মনোয়ার উদ্দিন আর কুদরত আলী। লোয়ার বার্থটা রিজার্ভ করা ছিল মনোয়ার উদ্দিনের নামে। কিন্তু ঐ বৃদ্ধই মনোয়ার উদ্দিন কিনা তা চেকার বলতে পারল না।

নীরবে সমস্তটা শুনল শহীদ। তারপর বলল, 'জানেন মি. সিম্পসন, ক্রুকটা আমাকে হুমকি দিয়ে চিঠি লিখেছে একটা?' হাসল শহীদ, 'আজ সকালে পেয়েছি।'

'তাই নাকি!' একটু বিস্মিত বোধ করলেন তিনি। 'কই, এনেছ নাকি চিঠিটা?'

'সঙ্গে নেই। দেখবারও কিছু নেই। তাতে শুধু আমাকে ধ্বংস করে দেবার শপথ করা হয়েছে। আর কি দম্ভ!'

'তাহলে এখন কি করতে চাও? তুমি তো আর হুমকিতে পিছিয়ে পড়ার লোক নও?'

শহীদ হাসল, 'কিন্তু আমি কয়েকদিনের জন্যে নিজেকে নিষ্ক্রিয় বলে দেখাতে চাই।'

'কারণ?'

'দেখি আমাদের বন্ধু কি করেন?'

'কিন্তু এখন কি আমাদের ঢিল দেবার সময় আছে?' একটু উদ্বিগ্ন হয়েই বললেন মি. সিম্পসন।

'ঢিল দিচ্ছে কে? শুধু মাত্র নিষ্ক্রিয় থাকার ভাণ করতে চাই। আসলে অতি গোপনে আমি তদন্ত করতে চাই।'

'তাতে কি সেই ধূর্ত লোকটার চোখে ধুলো দিতে পারবে? বুঝতেই পারছ কি ধড়িবাজ আর শয়তান সে।'

'চেষ্টা করতে দোষ কি? তাছাড়া আপাতত আমাদের এখন কিছু করবার নেই। আমাদের আসল ও চূড়ান্ত কাজ হল আগামী অমাবস্যার কয়েকদিন আগে।'

মি. সিম্পসন শহীদের কথাগুলো মেনে নিতে পারলেন না। তিনি সবেগে মাথা

নেড়ে বললেন, 'তার মানে অন্তত আরও একজনকে নিশ্চিত মরণের কবলে সঁপে দেওয়া। দ্যাট ইজ ব্রুটাল। আমরা আর অপেক্ষা করতে পারি না। আগামী অমাবস্যার আগেই আমাদের ধরতে হবে কালপ্রিটটাকে। ইউ মাস্ট, আদারওয়াইজ উই শ্যাল বি ফেইলিং ইন আওয়ার ডিউটিজ।'

'আমি কি আর ইচ্ছে করে দেরি করতে চাই? পারলে তো এখুনি তাকে আদালতে হাজির করি। কিন্তু এত চেষ্টা করেও কি করতে পারলাম আমরা? কিছুই না। অথচ সে ঠিকই তার জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ করে চলেছে।' আফসোস ঝরে পড়ল শহীদের কণ্ঠ থেকে।

মি. সিম্পসন নীরবে চিন্তা করতে লাগলেন। তারপর ঘড়ি দেখে বললেন, 'আমায় উঠতে হবে। ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ডি.আই.জি. ডেকে পাঠিয়েছেন। ঐ কালপ্রিটটাকে যেমন করে হোক আগামী অমাবস্যার আগে রাউণ্ড আপ করতেই হবে, সেটাই আলোচ্য বিষয়। তুমিও ইচ্ছে করলে আসতে পার।'

'মাফ করবেন ওসব কনফারেন্সে কিছু লাভ হবে বলে আমার মনে হয় না। আমারও কাজ আছে, আমি চললুম।'

শুক্লপক্ষ চলে গেছে। পার হয়ে গেছে কৃষ্ণপক্ষেরও কয়েকটা দিন। অমাবস্যা আসন্ন। একটা আতঙ্কের মেঘ ইতিমধ্যেই রাজধানীর মানুষের মনটাকে আচ্ছন্ন করে তুলছে ক্রমে ক্রমে। কে জানে, এবারে কে হবে সেই নর-রাক্ষসের শিকার।

কামালের ধারণা, যথার্থই ব্যর্থ হয়েছে শহীদ। তাই সে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। বিরক্ত হয়েছে কামাল। ক্ষুব্ধ হয়েছেন মি. সিম্পসন। সমালোচনার হুল ফুটিয়েছে কামাল। গা করেনি শহীদ। তবু মাঝে মাঝে শহীদ কিছুক্ষণের জন্যে লাপাত্তা হয়ে যেত। পরে এ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করলে শহীদ এড়িয়ে যেত। তারপর একদিন গাঝাড়া দিয়ে উঠল শহীদ। অমাবস্যার তখন মাত্র তিন দিন বাকি।

সকালে ফোন করে রেখেছিল কামালকে, সন্ধ্যায় যেন সে বাসায় থাকে।

সুতরাং সন্ধে থেকেই বাসায় ছিল কামাল। নিশ্চয়ই কোথাও বেরোতে হবে। পোশাক পরে তৈরি হয়েই রইল সে। একটু যেন উত্তেজনা অনুভব করছিল সে।

কিন্তু সন্ধ্যা তো দূরের কথা, রাত দশটা পর্যন্ত শহীদ এল না। কামাল প্রথমটায় বিরক্ত হল, পরে অবাক হল, এবং শেষে ভীত হল। দুপুর থেকে টেলিফোনটা ডেড হয়ে আছে। সুতরাং যোগাযোগ করাও সম্ভব নয়। কাছেপিঠে কোথাও ফোন করতে যেতে পারে না, পাছে শহীদ এসে তাকে না পেয়ে ফিরে যায়।

বারান্দায় পায়চারি করতে লাগল কামাল অস্থির হয়ে। অবশেষে শহীদ এল রাত পৌনে বারটায়। সে তখন ক্লান্ত অবসন্ন। গাড়ি থেকে নেমেই কামালকে বলল. 'বড্ড খিদে পেয়েছে রে।'

ব্যস্ত হয়ে পড়ল কামাল, 'হোয়াই অফ কোর্স, কিন্তু এতক্ষণ ছিলি কোথায়?'

'পরে শুনবি। এখন চল, খেয়ে নিই আগে।'

কামাল ও শহীদ ভিতরে গিয়ে ঢুকল। আর ঠিক সেই সময় একটা বিরাট ছায়ামূর্তি পাঁচিল ডিঙিয়ে কামালের বাড়ির বাগানের মধ্যে ঢুকল। পাঁচিলের পাশে ঝাঁকড়া কামিনী গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল ছায়ামূর্তিটা অনেকক্ষণ। বারান্দার ম্লান আলোয় কাউকে দেখা গেল না। দীর্ঘ পদক্ষেপে মুখোশপরা ছায়ামূর্তিটা নিঃশব্দে এসে গাড়ির কাছে দাঁড়াল। জানালা খোলা কিনা পরখ করে দেখল ছায়ামূর্তিটা। জানালা বন্ধ। হ্যাণ্ডেল ধরে টান দিয়ে দেখল, দরজাটাও বন্ধ। পকেট থেকে চাবি বের করল সে। চাবিটা দরজার তালায় ঢুকিয়ে দিয়ে হ্যাণ্ডেল ধরে টেনে দরজা খুলে ফেলল সে। পকেট থেকে কি যেন বের করে সীটটা তুলে তার নিচে রেখে সীটটা যথারীতি নামিয়ে দরজা বন্ধ করে চাবিটা খুলে আবার দীর্ঘ পদক্ষেপে অন্ধকার বাগানের কোণে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মিনিট পনের পরে কামাল ও শহীদ বেরিয়ে এল বাসার ভিতর থেকে। ঘড়ির কাঁটা তখন বারটার ঘর পেরিয়ে গেছে।

কিছুদূর এগোতেই কামাল বলল, 'আমার ঘুম পাচ্ছে।' শহীদ কোন জবাব দিল না। কয়েকবার হাই তুলল কামাল। খাওয়াটা বেশি হয়ে গেছে। ঘুমে দুটো চোখ তার জড়িয়ে আসছে। সীটের কোণে হেলান দিয়ে ঢুলতে লাগল কামাল।

আর আশ্চর্য শহীদেরও কেমন ঘুম পাচ্ছিল। তারও দুটো চোখ যেন আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যেতে চাইছে। গাড়িটা রাস্তার পাশে রেখে একটু ঘুমিয়ে নিতে ইচ্ছে করছে তার। কিন্তু এটা তো আর ঘুমের সময় নয়? একটা সিগারেট ধরালে হত। কিন্তু তার সমস্ত হাত-পা অবসাদগ্রস্ত হয়ে আসছে কেন? হাত দুটো যেন একটু একটু কাঁপছে। চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসছে। অ্যাক্সিডেন্ট করবে নাকি সে। মনের সমস্ত শক্তি দিয়ে সে অবসাদ দূর করার চেষ্টা করল। কিন্তু না, হাত তবুও কাঁপছে। স্টিয়ারিং বাগ মানছে না। হঠাৎ তার চেতনার মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ খেলে গেল। তাই তো, এ সম্ভাবনার কথা তার আগেই ভাবা উচিত ছিল।

উহ্, ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু না, আর সম্ভব নয়, তার পক্ষে গাড়ি চালানো। সমস্ত শক্তি দিয়ে সে স্টিয়ারিংটাকে কন্ট্রোল করে পথের পাশে গাড়িটা রাখল। পিছনের দিকে তাকাল একবার। যমদূত এসে গেছে! কিন্তু শহীদের দেহের সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত। ধীরে ধীরে সীটের উপর ঢুলে পড়ল সে।

কয়েক সেকেণ্ড পরে পিছনে একটা গাড়ি এসে থামল। গাড়ি থেকে নেমে এল সেই ছায়ামূর্তিটা। শহীদের গাড়ির পাশে এসে দাঁড়াল সে। সামনের দরজাটা খুলল সে। তারপর খুলল পিছনেরটা। সামনের আসন থেকে শহীদের অচৈতন্য দেহটা অনায়াসে তুলে পিছনের সীটে নামিয়ে দিল। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ড্রাইভারের

আসনে গিয়ে বসল। মূর্তির মুখে ফুটে উঠল ক্রুর হাসি!

রাত দুটোর দিকে ঘুম ভেঙে গেল গফুরের। খুব গরম পড়েছিল বলে সে রান্নাঘরের বারান্দায় শুয়ে ছিল। ফুরফুরে হাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়েছিল সঙ্গে সঙ্গেই। মশারীর মধ্যে মশা ঢুকেছে। কানের কাছে ভনভন করছে। হাত নেড়ে কানের কাছ থেকে মশা তাড়াবার চেষ্টা করল সে। হঠাৎ তার মনে হল দোতলা থেকে অস্পষ্ট একটা আওয়াজ আসছে। কা'র যেন পায়ের শব্দ। অত্যন্ত ক্ষীণ, অত্যন্ত সাবধানী। চোর-চোর নয়ত? কান খাড়া করে রইল গফুর। সাহেব বাড়ি নেই। জেনে শুনেই হয়ত এসেছে। কিন্তু গফুর তো আছে। দাঁড়াও মজাটা দেখাচ্ছি, আপন মনে বলল সে। কিন্তু চোর কিনা সেটা আগে বুঝতে হবে তো। মশারীর মধ্যে উঠে বসল গফুর। শব্দটা থেমে গেছে।

কিন্তু দোতলার বারান্দার বাতিটা নেভানো কেন? ওটা তো রাতে কখনোই নেভানো থাকে না! কে নেভাল ওটা? ভাবী আর আপা তো নিশ্চয়ই নয়। আব্বা তো সারারাতের মধ্যে একবারও বাইরে বেরোন না।

বালিশের তলায় হাতখানেক লম্বা লোহার একটা ডাণ্ডা নিয়ে শোবার অভ্যাস গফুরের। কখনও দরকার হয়নি। সে আফসোস তার বহুদিনের। আজ কি সেই ডাণ্ডাটা ব্যবহারের সময় এসেছে? পদশব্দটা আবার শোনা যাচ্ছে। খট করে দরজা খোলারও যেন শব্দ হল একটা। আর দেরি করা যায় না। বালিশের তলা থেকে লোহার ডাণ্ডাটা নিয়ে মশারীর বাইরে চলে এল গফুর। পা টিপে টিপে সিঁড়ির দিকে এগোল। নিঃশব্দে শ্বাসরোধ করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। সিঁড়ির উপরেই একটা দরজা। সেটা হাট করে খোলা, অথচ ওটা খোলা থাকবার কথা নয়। বাঁ দিকের ঘরটায় থাকেন দাদামণি ও দিদিমণি। ডান দিকের প্রথম ঘরটায় আব্বা আর পরেরটায় লীনা আপা। শব্দটা সেদিক থেকেই আসছে। দরজা দিয়ে মুখ বাড়াল গফুর। বারান্দায় কেউ নেই। কিন্তু মৃদু আলো আসছে যেন কোথা থেকে। লীনা আপার রুমের ভিতর থেকেই আসছে যেন আলোটা। দরজাটা কি তবে খোলা? তা'র বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল। দেয়ালের সাথে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল গফুর। হ্যাঁ, দরজাটা খোলাই। মুখ বাড়াল সে সন্তর্পণে, দরজা দিয়ে।

আর স্তম্ভিত হয়ে গফুর কামরার নীলাভ ম্লান আলোয় দেখল, লীনা আপার মশারীর একটা দিক তোলা আর বিরাট একটা মূর্তি লীনা আপার মুখের উপর কাপড় চেপে ধরে আছে। লোকটা দাঁড়িয়ে আছে দরজার দিকে পিঠ করে।

গফুরের মাথায় আগুন ধরে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে সে সাবধানী পদক্ষেপে এগিয়ে গেল বিড়ালের মত নিঃশব্দে। লোকটার ঠিক পিছনে দাঁড়িয়েছে সে।

ডাণ্ডাটা তুলল গফুর। আর ঠিক সেই সময় লোকটা ফিরে দাঁড়াল এবং গফুরকে দেখেই মুহূর্তের মধ্যে মাথাটা সরিয়ে ফেলল। গফুর ততক্ষণে প্রচণ্ড শক্তিতে ডাণ্ডা চালনা করেছে। কিন্তু তাল সামলাতে না পেরে সে সামনের দিকে অনেকটা ঝুঁকে পড়ল আর সেই মুহূর্তেই লোকটা তার কানের উপর প্রচণ্ড একটা ঘুসি বসাল। মাথাটা ঘুরে গেল গফুরের। লোহার রডটা পড়ে গেল হাত থেকে। সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল আবার, কিন্তু পর মুহূর্তেই আর একটা ঘুসি এসে পড়ল তার নাক বরাবর। টলতে টলতে সে চিত হয়ে পড়ল মেঝের উপর। মাথাটা গিয়ে ধাক্কা খেল খাটের কোণায়। প্রচণ্ড বেদনায় সে চিৎকার করতে গেল। কিন্তু মুখ দিয়ে শব্দ বেরোল না। নাক দিয়ে তখন তার ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত বেরোচ্ছে।

অনেক কষ্টে গফুর একবার তাকাল। তার চারদিকের পৃথিবীটা তখন দুলছে। সেই লোকটা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার দিকে। এখুনি যেন তাকে খুন করবে। সভয়ে চোখ দুটো বন্ধ করল গফুর।

হঠাৎ তার মনে হল, কে যেন তার চুলের মুঠো ধরে টেনে তুলছে। পরের মুহূর্তে কানের পাশে আর একটা আঘাত এসে পড়ল। আবার মেঝের উপর ছিটকে পড়ল গফুর। সঙ্গে সঙ্গে চেতনা হারাল সে।

সকালে খবর পেয়েই মি. সিম্পসন ছুটে এলেন। মহুয়া তখন কাঁদছিল। ইসলাম সাহেব শোকে বোবা হয়ে গেছেন। তাঁর দু'চোখ বেয়ে দরদর করে অশ্রু ঝরছে। গফুরকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল। শহীদও রাতে বাসায় ফেরেনি, শুনে আরও অবাক হলেন মি. সিম্পসন। প্রাথমিক তদন্ত করে এলেন গোলাম মওলা।

লীনার রুমে টেবিলের উপর পাওয়া গেল একটা চিঠি। গোলাম মওলা খামটা খুলে পড়ে মি. সিম্পসনের হাতে দিলেন। তিনি পড়লেনঃ

"মিসেস খান,

আপনার স্বামী ও তার বন্ধু কামাল আমার হাতে বন্দী। মিস লীনাকেও নিয়ে গেলাম। আগেই আপনার স্বামীকে আমার পিছনে লাগতে নিষেধ করেছিলাম। আমার বারণ সে শোনেনি। সুতরাং তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে। তার বন্ধুকেও। মিস লীনাকে আমার প্রয়োজন।"

চিঠিটা পড়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন মি. সিম্পসন। বাকরোধ হয়ে গেছে তাঁর। তাহলে শেষ পর্যন্ত লীনাকেও সেই হৃৎপিণ্ডলোভী দৈত্যটার শিকারে পরিণত হতে হবে। শিউরে উঠলেন তিনি।

গোলাম মওলা বলল, 'স্যার, এ সেই ভয়ঙ্কর লোকটারই কীর্তি।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'আস্তে। চিঠির কথা ওরা যেন না শোনে।'

লীনার রুম থেকে বেরিয়ে এলেন দু'জন। বারান্দায় একটা চেয়ারে স্তব্ধ হয়ে

বসে আছেন ইসলাম সা.হব। করুণ দুটো চোখ তুলে তিনি তাকালেন মি. সিম্পসনের দিকে।

মি. সিম্পসন বললেন, 'ভয়ের কিছু নেই, চাচাজী। আমরা যেভাবেই হোক, আপনার মেয়েকে ফিরিয়ে এনে দেব। আপনি ভাববেন না।'

এতক্ষণে হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠলেন বৃদ্ধ ইসলাম সাহেব, 'আমার লীনা, আমার শহীদ! কোথায়, কোথায় ওরা? ওরা কি—?' আবেগের প্রাবল্যে তাঁর কণ্ঠ রোধ হয়ে গেল। অনেক কষ্টে তাঁকে শান্ত করলেন মি. সিম্পসন। আর লোকজন না থাকায় তাঁকেই বললেন, 'মিসেস খান বোধহয় খুব কান্নাকাটি করছেন। তাঁকে শান্ত হতে বলুন।'

চোখ মুছতে মুছতে মহুয়া বেরিয়ে এল। ভেজা গলায় বলল, 'মি. সিম্পসন, আপনার গাড়িটা যদি দয়া করে রেখে যান—।'

মি. সিম্পসন একটু অবাক হলেন। কিন্তু ব্যাপারটা অনুধাবন করতে তাঁর দেরি হল না। তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, কিন্তু ড্রাইভার?'

'আমি নিজেই চালিয়ে যাব।'

'কিন্তু আপনার এই মানসিক অবস্থায়—?' মৃদু আপত্তির সুরে বললেন তিনি।

দৃঢ়গলায় জবাব দিল মহুয়া, 'পারব আমি। আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না।'

গোলাম মওলা সাহেব দু'জন কনস্টেবল পাহারায় রাখতে চাইলেন। মহুয়া রাজি হল না। সে বলল, 'দরকার নেই।'

মি. সিম্পসন অফিসে গেলেন। মিসেস খান গাড়ি নিয়ে কার কাছে যাবে তা তিনি জানেন। এই রকম একটা ইচ্ছা তিনিও গোপনে পোষণ করছিলেন। কয়েকদিন ধরেই তিনি ভাবছিলেন, কুয়াশা যদি এই ব্যাপারটায় আগ্রহ দেখাত তাহলে অনেক আগেই হয়ত ঐ হৃৎপিণ্ডলোভী রাক্ষসটাকে খতম করতে পারত সে। কিন্তু কুয়াশা কেন যে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে, সেটাও তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না। তিনি কুয়াশাকে যতখানি চেনেন তাতে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এই ধরনের ভয়ঙ্কর ঘটনাগুলোয় কুয়াশা কখনও নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে না। কেন তবে তার এই অনীহা? এখন অবশ্য বোনের আহ্বানে তাকে সাড়া দিতেই হবে। তার অর্থ হল, ড. তোগলক নামে সেই নর-পিশাচটা এবার আর কোনক্রমেই নিস্তার পাবে না। তবু মি. সিম্পসনের এখন একমাত্র প্রার্থনা, হৃৎপিণ্ডলোভী সেই পশুটা এই মুহূর্তেই ধরা পড়ুক আর না পড়ুক লীনার প্রাণটা যেন রক্ষা পায়। লীনাকে বাঁচানোটাই এখন সবচেয়ে বড় কথা।

এগারটার দিকে একজন কনস্টেবল একটা ভিজিটিং কার্ড নিয়ে ঢুকল। কার্ডটা মি. সিম্পসনের দিকে এগিয়ে দিয়ে নীরবে দাঁড়াল সে।

মি. সিম্পসন কার্ডটা পড়লেনঃ

'ড. মনসুর আলী ডি.এস.,পি.এইচ.ডি.
ডিরেক্টর, হেকমত রিসার্চ ইন্সটিটিউট।
তেজগাঁ, ঢাকা।'

নামটা পড়ে প্রথমটায় চিনতে পারলেন না মি. সিম্পসন। কিন্তু একটু চিন্তা করতেই তার মনে পড়ল, কুয়াশা এসেছে। মনসুর আলী তো তারই নাম। অবাক হলেন না তিনি। যেন এইটাই আশা করছিলেন এতক্ষণ, অথচ তা নিজের কাছেও তিনি স্বীকার করেননি। কিন্তু ও নিজে সশরীরে ক্রিমিন্যাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টের সদর দফতরে আসবে এতটা তিনি আশা করেননি। ভেবেছিলেন শহীদের বাসায় দেখা হতে পারে, ইতস্তত করতে লাগলেন তিনি। অনেকক্ষণ ধরে কার্ডটা হাতে নিয়ে চুপ করে বসে রইলেন। কনস্টেবলটি দাঁড়িয়েই আছে। সে নড়ে উঠল। মি. সিম্পসন মনের সকল দ্বন্দ্ব দূর করে দিয়ে বললেন, 'নিয়ে এস ভদ্রলোককে।'

একটু পরেই মধ্যবয়সী সৌম্যদর্শন অথচ ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক চেহারার যে ভদ্রলোক ঢুকলেন তাঁকে দেখে চিনতে পারলেন না তিনি। নিখুঁত ছদ্মবেশে এসেছে কুয়াশা। চিনতে পারার সাধ্য নেই কারও। উঠে দাঁড়িয়ে মি. সিম্পসন হাত বাড়িয়ে দিলেন। আন্তরিক সম্বর্ধনা জানিয়ে বললেন, 'বসুন, ড. আলী। অনেকদিন পরে দেখা। তাহলে পোসাকী নামটাও আপনি মাঝে মাঝে ব্যবহার করেন?'

কুয়াশা বসল। সে হেসে বলল, 'পিতৃপ্রদত্ত নাম যখন, ব্যবহার করতেই হয় মাঝে মাঝে।'

'তাই বলে একেবারে বাঘের ঘরে এসে ঢুকেছেন। আপনার সাহস তো কম নয়?' হাসতে হাসতে বললেন মি. সিম্পসন।

জবাবে হাসল কুয়াশাও। তার সাহস কতটা, অন্তত মি. সিম্পসনের তা জানা না থাকবার কথা নয়। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'বুঝতেই পারছেন, প্রস্তুত হয়েই ঢুকেছি। তাছাড়া আমি ইদানীং কি ভাবছি, জানেন? ভাবছি, এবার আমি মেষশাবকের মত সৎ ও নিরীহ নাগরিক-জীবন বেছে নেব কিনা। শুধু ভরসা পাচ্ছিনে আপনাদের পুলিস বাহিনীর জন্যে। দুনিয়ার কোন প্রান্তে সামান্য গাঁটকাটা হলেও আমায় দুষবে। দু'বেলা বাড়ি বয়ে জ্বালাতন করবে।'

'কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে মামলাও আছে। আপনার জীবিত বা মৃত মাথার দামও তো লাখ টাকার সমান।'

'ওতে কিছু এসে যায় না। আপনারা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারেননি। যেটুকু প্রমাণ ছিল তাও নষ্ট করে ফেলেছি।' কুয়াশা সিগারেটে টান দিয়ে বলল। 'কিন্তু সর্বক্ষণ জ্বালাতন আমার সইবে না।'

'সে আশঙ্কা আছে অবশ্য,' স্বীকার করলেন মি. সিম্পসন, 'তবে এ ব্যাপারে আমি কিছু করতে পারি কি না দেখব। আপনার সোশ্যাল রিহ্যাবিলিটেশন নিশ্চয়ই গভর্নমেন্ট অপছন্দ করবে না।'

'এ সম্পর্কে পরে বিবেচনা করা যাবে। এখন আসল ব্যাপারটা সম্পর্কে বলুন। লীনা মাস্ট বি সেভ্ড্, বাট আই শ্যাল হ্যাভ টু ফাইট উইথ দ্য টাইম। তবে একথা ঠিক যে শয়তানটা লীনার কোন ক্ষতি করবার সুযোগ পাবে না। দরকার হলে আমি দুনিয়াটা ওলট-পালট করে ফেলব।'

মি. সিম্পসন ধীরে ধীরে গত দশ মাসের ঘটনাবলী বিবৃত করলেন। তাঁদের তদন্তের ধারা সম্পর্কে আলোকপাত করলেন। তাঁদের সিদ্ধান্তের কথা বললেন। কুয়াশাকে জানালেন যে, তাঁদের মতে ড. তোগলকই এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডগুলো করে চলেছে। অথচ তার টিকিটারও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। শহীদ অবশ্য অন্য ধারণা পোষণ করত। কিন্তু তার ধারণাটা প্রকাশ করেনি।

কুয়াশা আরও দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করে বিদায় নিল। বাসায় পৌঁছে ফোন করল মহুয়াকে। তাকে জানাল, 'তুই ভয় পাসনে। আমি মোটামুটি এগিয়ে গেছি। শহীদ, লীনা বা কামাল কারও কোন ক্ষতি হবে না, বিশ্বাস রাখিস তোর এই লক্ষ্মীছাড়া দাদাটার উপরে।

জবাবে মহুয়া শুধু কাঁদল।

ফোন করে দিয়ে ডি. কস্টাকে ডাকল কুয়াশা। ডি. কস্টা এসে স্যালট দিয়ে দাঁড়াল।

কুয়াশা বলল, 'সেই যে মীরপুর রোডে আপনি এক খুনীকে দেখেছিলেন তাকে খুঁজে বের করতে পেরেছেন নিশ্চয়ই, মি. ডি. কস্টা। আপনাকে সাতাশ দিন সময় দিয়েছিলাম। কিন্তু একমাস সাত দিন চলে গেছে।'

অনেকক্ষণ মাথা চুলকে ডি. কস্টা বলল, 'গাড়িগুলো নিয়েই হয়েছে যটো মুশকিল। যে গাড়িটাই ডেখি মনে হয় এইটাই যেন সেই রাটে ডেখেছিলাম।'

'নম্বরগুলো নিশ্চয়ই সযত্নে টুকে রেখেছেন?'

'নিশ্চয়ই, বস্। আমার পকেটেই আছে।' বলতে বলতে দুটো ছোট নোট-বই বের করে কুয়াশার দিকে এগিয়ে দিল।

কুয়াশা একটা নোট-বই খুলে কয়েকটা পাতা উল্টে দেখল। তাতে অসংখ্য গাড়ির নম্বর টোকা। বোধহয় কোন গাড়িই বাদ যায়নি। কার, ট্যাক্সি, জীপ, স্কুটার মাইক্রোবাস সবকিছুরই নম্বর টোকা আছে ডি. কস্টার নোট-বইতে। বোধহয় বাস ও ট্রাক বাদ পড়েছে। দুটো নোট-বই-এর একই দশা। আর সব শ্রেণীর গাড়ির নম্বরই আছে।

'অনেক কাজ করে ফেলেছেন তো!' কুয়াশা বই দুটো ফিরিয়ে দিয়ে বলল।

'কোন গাড়িই বাড ডিইনি, স্যার। আমাডের গাড়ির নম্বরও টুকেছি।' গর্বে স্ফীত হল ডি. কস্টা।

পরশ পাথর খুঁজে বেড়াচ্ছে সে।

'সেডিন টো নিউ মার্কেটের মোড়ে এক লম্বা চুলওয়ালা ছোকরা আমাকে মারটেই এসেছিল।'

'কেন? কেন?'

'ওর গাড়ির নম্বরটা টুকছিলাম। ডাঁট খিঁচিয়ে, ঘুসি বাগিয়ে ছোকরা গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বলল, এই শ্লা, কি করছিস? আমি বললুম, গাড়ির নম্বর টুকছি। ছোকরা নাকের কাছে ঘুসি বাগিয়ে বলল, কেন টুকছিস? আমি টো বুডটিমান কম নই। বললুম, ওটা আমার হবি, স্যার। এই দেখুন না, ডুটো খাটা ভরে ফেলেছি গাড়ির নম্বর টুকে। ছোকরা হ্যাট নামিয়ে হাঁ করে আমার মুখের ডিকে টাকিয়ে রইল। টারপর কি হাসি! ঠা ঠা ঠা ঠা করে হাসতে হাসতে লাফাতে লাগল। আর আমি এক ফাঁকে কেটে পড়লুম।'

কুয়াশাও হাঁ হয়েই শুনছিল ডি. কস্টার কীর্তি-কাহিনী। সে বলল, 'বেশ, এক কাজ করুন। আপনি মান্নান আর কলিমকে ডেকে দিন। আর বাইরে গিয়ে দেখুন, বাড়ির চারদিক থেকে কেউ উঁকি-ঝুঁকি মারছে কিনা।'

'এখুনি যাচ্ছি, স্যার।' মিলিটারি স্যালুট ঠুকে বেরিয়ে গেল ডি. কস্টা।

একটু পরেই মান্নান ও কলিম এসে হাজির হল। নিচু গলায় তাদেরকে কয়েকটা নির্দেশ দিল কুয়াশা। ওরা দু'জন নীরবে শুনে বেরিয়ে যাচ্ছিল। কুয়াশা বলল, 'খুব সাবধান, লোকটা সাপের চাইতে খল। আর শোন, অস্ত্র ছাড়া যাবি না কিন্তু।'

মাথা নেড়ে বেরিয়ে গেল দু'জন। দরজা পেরিয়ে গিয়ে কলিম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'তবু যা হোক এতদিনে একটা কাজ পাওয়া গেল।'

নয়

'আমি অমর হতে চলেছি—আমি লাভ করতে চলেছি অনন্ত জীবন। তিরিশ বছর ধরে যে সাধনা আমি করেছি, আজ রাতে, মাত্র এক ঘন্টা পরে তাতে আমি সিদ্ধি লাভ করব। দুনিয়ার কোন মানুষের সাধ্য নেই আমার সাধনা ব্যর্থ করে দেবে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।' উন্মাদের মত আকাশ ফাটিয়ে হাসতে লাগল মুখোশ-পরা এক বিশাল মূর্তি। কালো মুখোশে, আলখেল্লায় আর ভারি কণ্ঠস্বরে তাকে রহস্যময় লাগছিল।

মাঝারি আকারের একটা রুম। মাঝখানে একটা টেবিল। তার উপরে শায়িত আছে লীনা। তারপর হাত-পা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। চোখ দুটোও বেঁধে দেওয়া হয়েছে। মুখের মধ্যে কাপড় গুঁজে দেওয়া।

কয়েক হাত দূরে ঘরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত কাঁচের পার্টিশন। পার্টিশনের ওপারে দুটো চেয়ারে বসে আছে শহীদ ও কামাল। তাদের দু'জনেরও হাত-পা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। এতটুকু নড়া-চড়া করার ক্ষমতা নেই। মুখটাও বাঁধা। কথা বলা অসম্ভব। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ওরা অসহায়ের মত সামনের দিকে তাকিয়ে আছে।

মুখোশ পরা মূর্তিটা কথা বলছিল পাশে একটা ছোট টেবিলের উপর রাখা মাইক্রোফোনে। অদৃশ্য একটা লাউডস্পীকারে শোনা যাচ্ছিল তার ধাতব কণ্ঠস্বর। মাইক্রোফোনটার পাশেই উজ্জ্বল আলোয় চিকচিক করছে সার্জারীর কতগুলো যন্ত্রপাতি। গোটা-দুই কাঁচের পাত্র। একটা রিভলভার। একটা হুইস্কির বোতল। মুখোশধারী যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার ঠিক পিছনেই রুমটার একমাত্র দরজা এবং সেটা বন্ধ।

মুখোশধারী বোতল খুলে নির্জলা হুইস্কি পান করল। বোতলটা রেখে দিয়ে কামাল ও শহীদের দিকে তাকাল।

তারপব আবার শুরু করল, 'তোমরা তো মারাই যাবে, যদিও আমার সেটা ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আমার পথে বাধা সৃষ্টি করার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে তোমাদেরকে। যা হোক, তোমাদের হয়ত কৌতূহল থাকবে, কেন আমি একের পর এক মানুষ হত্যা করে চলেছি গত এক বছর ধরে। কেনইবা তাদের হৃৎপিণ্ড আমি ভক্ষণ করছি।

'সেই রহস্যটাই বলছিঃ পৃথিবীতে মানুষের কামনা অনেক। ব্যক্তি-জীবনের তুচ্ছ কামনাগুলো ছাড়াও মানুষ চাঁদে যাবার স্বপ্ন দেখেছিল, গ্রহান্তরে যাবার স্বপ্ন দেখে। এই ইচ্ছাগুলো ইতিহাসের গোড়া থেকে মানুষ তার অন্তরে লালন পালন করছে। তেমনি একটা প্রাচীন বাসনা হল, অমর হওয়ার বাসনা। আদি মানবের কাল থেকেই মানুষ তার অন্তরে অন্তরে এই বাসনা লালন পালন করে এসেছে। তার জন্যে অমৃতের সন্ধান করেছে, যদিও বাসবের অমৃত আসবে কোনদিনই মানুষ এতটুকু অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। সমুদ্র মন্থন করে যে অমৃত পাওয়া গিয়েছিল তার জন্যে লড়াই করেছে সুরাসুর। অসুরেরা জিততে পারেনি। দেবতারা অমৃত পান করে অমর হয়েছে। কিন্তু এ-তো মিথোলজীর কথা। এই মরলোকের মানুষের অমর হবার বাসনা কোনদিনই পূর্ণ হয়নি। অথচ ইতিহাসের সর্বযুগে সকল দেশের মানুষই অমর হবার চেষ্টা করেছে কম-বেশি। প্রাচীন মানুষ নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে। অমরত্বের সাধনা

করতে গিয়ে উদ্ভাবিত হয়েছে বিজ্ঞান, আবার তন্ত্রমন্ত্রের উদ্ভবও ঘটেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত মানুষের সেই ইচ্ছে অপূর্ণই রয়ে গেছে। শত কোটি বছরের মানুষের সাধনা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু আমি—আই শ্যাল বি দ্য ওন্‌লি ইম্‌মরট্যাল ম্যান। আমি, একমাত্র আমিই অমর হব—অনন্তকাল ধরে আমি বেঁচে থাকব। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ হয়ত পারমাণবিক বিস্ফোরণে মারা যাবে। সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে—কিন্তু,' নিজের বুকে টোকা দিল মুখোশধারী,'আমি বেঁচে থাকব।'

লাউডস্পীকারে শোনা গেল তার তীক্ষ্ণ পৈশাচিক ধাতব কণ্ঠস্বর। শিউরে উঠল কামাল ও শহীদ। নড়ে উঠল লীনার শায়িত দেহটা।

'ত্রিশ বছর ধরে আমি এই সাধনা করে চলেছি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়িয়েছি। আফ্রিকার দুর্ভেদ্য অরণ্যের বর্বর মানুষের সাথে মিশেছি, ব্রাজিলের রেড ইণ্ডিয়ানদের সাথে বসবাস করেছি, অস্ট্রেলিয়ার অরণ্যবাসীদের সাথে থেকেছি। হিমশীতল মেরু অঞ্চলের এস্কিমোদের সাথে থেকেছি। প্রাচীন পুথি-পত্র পাঠ করেছি। কোথাও কোন কিনারা পাইনি। অবশেষে পথের সন্ধান পেলাম পুরানো এক প্রস্তর ফলকে। মিসরের এক পিরামিডে। শুধু তাই নয়, সুদূর অতীতে অমরত্বের যে সাধনা হয়েছে তার ইতিহাসও পাওয়া গেল সেই শিলালিপিতে। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে গ্রীক চিকিৎসক থেলিসমিণ্ডার জানতে পেরেছিলেন অমরত্ব লাভের গোপন মন্ত্র। তারও অনেক আগে ভারতের তন্ত্রবিদ্যার আচার্য ইন্দ্রকেতু জানতে পেরেছিলেন। তিনি ভারতীয় ইন্দ্রজাল বিদ্যার আদি পিতা। কিন্তু ইন্দ্রকেতু মন্ত্র জানলে কি হবে, তিনি ছিলেন ভীরু। তাই তাঁর জ্ঞান গিয়েছিল বিফলে। পারস্যের গণিত-শাস্ত্রবিদ খারাজও জানতেন অমরত্ব লাভের গোপন রহস্য। সে সম্রাট দরায়ুসের আমলের অনেক আগের কথা। জানতেন মিসরের পুরোহিত কিয়া কিন্তু কেউ সে বিদ্যা কাজে লাগাতে পারেননি। অথচ আশ্চর্য, প্রত্যেকেই অমরত্বের জন্যে একই বিধান দিয়ে গেছেন, "আটাশ দিন পরপর তেরটা মানুষের হৃৎপিণ্ড কাঁচা খেতে হবে," এই হচ্ছে তাঁদের পবিত্র উপদেশ।'

শিউরে উঠল তার বন্দী শ্রোতারা। সেটা চোখ এড়াল না মুখোশধারীর। নিষ্ঠুর হাসি হেসে সে বলল, 'ভয় লাগছে, কিন্তু উপায় কি? বারটা হৃৎপিণ্ড আমি এর আগে খেয়েছি। আর এটা হলেই আমার সাধনা সিদ্ধ হবে। আমি অমর হব…আমি অমর হব…হাঃ হাঃ হাঃ হা।'

আবার কেঁপে উঠল লীনার দেহটা। কামালও কেঁপে উঠল। শহীদ একবার কামালের দিকে মুখটা ফেরাল।

আবার শোনা গেল মুখোশধারীর কণ্ঠস্বর। 'তারপর তোমাদের দু'জনকে শেষ করব। কিন্তু সেকথা যাক, যা বলছিলাম, শুধু মানুষের হৃৎপিণ্ড হলেই চলবে না। আমার দরকার নীরোগ হৃৎপিণ্ড। সুতরাং আমি যে-কোন লোকের হৃৎপিণ্ড তো

খেতে পারি না। এ ব্যাপারেও আমার সুবিধা হয়েছিল কারণ আমি নিজে হার্ট-স্পেশালিস্ট বলে আমার অতীত রোগীদের মধ্যে থেকে শিকার বেছে নিতে পেরেছি সহজেই। হৃৎপিণ্ড ভক্ষণের জন্যে বেছে নিয়েছি অমাবস্যার রাত। যদিও যে কোন আটাশ দিন পরে হৃৎপিণ্ড ভক্ষণ করলেই চলে, অমবস্যার রাতটা বেছে নিয়েছিলাম শুধু রহস্যটাকে ঘোরাল করার জন্যে, আর এটা ভৌতিক ব্যাপার বলে এদেশের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করার জন্যে। তবে যার হৃৎপিণ্ড খেতে হবে তার বয়েসের বাছবিচারের প্রশ্নটা অবশ্যই আছে। তিরিশ বছরের বেশি বয়স হলে তার হৃৎপিণ্ড কোন কাজে আসবে না। অথচ হৃদরোগীদের অধিকাংশেরই বয়স তিরিশের বেশি। খুব কম হলেও পঁচিশ বছরের নিচে বড় একটা হৃদরোগ দেখা দেয় না। সুতরাং আমি পঁচিশ থেকে তিরিশ বছর বয়সের রোগীদের মধ্যে আমার শিকার বেছে নিয়েছিলাম। এ ব্যাপারে সন্দেহ করেছিল বলে ড. মিন্নতকে বিদায় নিতে হল। শহীদ, তুমি সন্দেহ করেছিলে বলে ড. কুদসীর চেম্বারের ফাইলপত্র গায়েব করতে হয়েছিল।'

ঘড়ি দেখল মুখোশধারী। 'আর সময় নেই। রাত একটা বেজে গেছে, এবারে আমি আমার কাজ শুরু করব।' চকচকে সার্জিক্যাল নাইফটা হাতে নিল সে। ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এল লীনার দিকে। মুখের ভিতরে গুঁজে দেওয়া কাপড়টা বের করে ফেলল। চোখের উপর থেকেও কাপড়টা সরিয়ে ফেলল। পরের মুহূর্তেই একটা তীব্র চিৎকার শোনা গেল। আতঙ্কিত কামাল শহীদের দিকে তাকাল। দেখল শহীদের দু'চোখ বেয়ে দরদর করে পানি ঝরছে। মুখের উপরের কাপড়টা ভিজে গেছে।

মুখোশধারী বোধহয় লীনাকে ধমক দিল। আর একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার কানে এল ওদের। মুখোশধারী সার্জিক্যাল ছুরিটা দিয়ে লীনার গলায় একটা খোঁচা দিল। লীনার দেহটা একবার কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল। মুখোশধারী অনেকক্ষণ চেয়ে রইল লীনার মুখের দিকে। কি যেন বলল বলে মনে হল কামালের। লীনার হাতের আর পায়ের বাঁধন খুলে দিল মুখোশধারী। কিন্তু লীনা আর নড়ল না। ওর বুকের উপর থেকে কাপড়টা সরিয়ে দিল মুখোশধারী। ব্লাউজের নিচের দিকের বোতামটা খুলে ফেলল।

ডানহাতে ধরল ধারাল ছুরিটা। চকচক করে উঠল ছুরিটা আলোয়। কামালের বুকের ভিতরটা তখন প্রবল ভাবে আলোড়িত হচ্ছে। একবার চেষ্টা করল নড়াচড়া করার, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। না, আর কোন আশাই নেই।

শহীদের দেহটাও নড়ে উঠল একবার।

ঠিক সেই মুহূর্তে মুখোশধারীর পিছনের দরজাটা খুলে গেল। আর কামাল সবিস্ময়ে দেখল দরজার মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে আছে কুয়াশা।

অর্থহীন একটা চিৎকার ভেসে এল লাউডস্পীকারে। মুখোশধারী সঙ্গে সঙ্গে পিছনে ফিরে তাকাল। এর পরমুহূর্তেই ছুরিটা ছুঁড়ে দিল কুয়াশার দিকে। কুয়াশা সরে যেতেই ছুরিটা দরজা দিয়ে বাইরের অন্ধকারে ছিটকে পড়ল। পরমুহূর্তেই মুখোশধারী রিভলভার তুলে নিতে গেল কিন্তু কুয়াশা ইতিমধ্যেই রিভলভার বের করেছে। সেটা গর্জে উঠল। নির্ভুল তাক কুয়াশার। গুলিটা গিয়ে লেগেছে টেবিলে রাখা মুখোশধারীর রিভলভারের উপর। রিভলভারটা দড়াম করে কাঁচের পার্টিশানের উপরে পড়ল। পর পর দুটো গুলি করল কুয়াশা পার্টিশানের উপর। খানখান হয়ে ভেঙে পড়ল পার্টিশানের কাঁচ প্রায় তিন-চার হাত জুড়ে।

কুয়াশার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'হাত তুলে দাঁড়াও।'

'নো! ইউ বেটার কিল মি ইফ ইউ লাইক!' বলেই হাত ঝাঁকুনি দিল মুখোশধারী। কুয়াশা এর জন্যে প্রস্তুতই ছিল। সে মাথা নোয়াল। তার ঠিক মাথার উপর দিয়ে সাঁ করে চলে গেল একটা থ্রোইং নাইফ।

কুয়াশা দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'নাউ মাই বয়, আর কি অস্ত্র আছে তোমার কাছে?'

কেঁপে উঠল মুখোশধারী। রিভলভারটা বাগিয়ে ধরে রইল কুয়াশা। 'হাত তোল।'

মুখোশধারী ধীরে ধীরে হাত তুলল উপরে।

বাইরে পদশব্দ শোনা গেল। মান্নান ও কালম এসে পড়েছে। ওরা ঢুকল দু'জন।

কুয়াশার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'কুইক, তোরা ওদের বাঁধন খুলে দে। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে শহীদ ও কামালকে দেখিয়ে দিল কুয়াশা। কাঁচের ভাঙা পার্টিশানের ভিতর দিয়ে সাবধানে এসে দাঁড়াল কলিম ও মান্নান শহীদের কাছে। মিনিট দুয়েক পরে দু'জন মুক্ত হতেই শহীদ পার্টিশান পার হয়ে শীনার কাছে এসে দাঁড়াল। শীনা তখনও স্থির হয়ে পড়ে আছে। আস্তে আস্তে ঝাঁকুনি দিল শহীদ শীনার দেহটায়। কুয়াশা বলল, 'ওকে বোধহয় হিপ্নোটাইজ করেছে। অন্তত ঘন্টাখানেক লাগবে ফিট ছাড়াতে।'

কুয়াশার রিভলভারটা মুখোশধারীর দিকে বাগানো থাকলেও তার দৃষ্টিটা ঘরের চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছিল। হঠাৎ সে দেখতে পেল, মুখোশধারী মেঝের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। চমকে উঠল কুয়াশা। তারপর নিচু হয়ে দেখল কিছুক্ষণ।

শহীদ বলল, 'ব্যাপার কি, অমর লোকটা মরে গেল না কি?

কুয়াশা বলল, 'হ্যাঁ, স্টোন ডেড। বোধহয় শেষ মুহূর্তের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন ড. কুদসী।'

'ড. কুদসী?' বিস্ময়ে আর্তনাদ করে উঠল কামাল।

'হ্যাঁ, ড. কুদসী। ড. তোগলক নয়। তিনি এই বাড়িতেই বন্দী ছিলেন। এখন নিচে আমার গাড়িতে বসে আছেন।'

কামাল এগিয়ে এল মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে থাকা মুখোশধারীর কাছে। মাথা নুইয়ে মুখোশটা একটানে খুলে ফেলল কামাল। অপলক দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল লোকটার মুখের দিকে। ড. কুদসীই বটে। কোন সন্দেহ নেই।

কামাল মুখ তুলে বলল, 'কিন্তু মারা গেল কিভাবে?'

কুয়াশা বলল, 'দাঁতের কোন ক্যাভিটিতে বোধহয় মারাত্মক কোন বিষ, সম্ভবত পটাশিয়াম সায়ানাইডের ক্যাপসুল রেখে দিয়েছিল। জরুরি মুহূর্তের জন্যে। সেটা জিভ দিয়ে বের করে ভেঙে ফেলেছে সে।'

অমর হবার বাসনা তাহলে অপূর্ণই রয়ে গেল।'

শহীদ বলল, 'প্রকৃতির নিয়ম কখনও লঙ্ঘন করা যায় না

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan